dogma। আজ আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলুম যে জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক এই মত প্রকাশ করেছেন।

"Je regarde le rationalisme et l'anti-intellectualisme comme deux *vices contraires* egalement pernicieux a la vie de l'esprit."

এ-কথা পড়ে মহা আশ্বস্ত হয়েছি, কারণ ঐ কথাই প্রমাণ যে এই বিপুলা পৃথিবীতে আমার সমানধর্ম্মী সাহিত্যিক আজও আছে।

(৬)

তবে বন্ধুবর একটা কথা ঠিকই ধরেছেন। আমি মনোরাজ্যে modern নই মডারেট। Moderation জিনিষটে যে অতি সেকেলে, তা কে না জানে। ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব ও গ্রীসে আরিষ্টটেল, উভয়েই সামাজিক লোককে মধ্যপথ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। আর কোন কথা পুরোনো হলেই—যে অসত্য হয়ে যায় তা ত নয়। বরং অনেক সময়ে দেখা যায় যে লোকে যাকে নতুন কথা বলে, তা একটু বেশি পুরোনো—অর্থাৎ এত পুরোনো যে লোকে তা ভুলে যাবার যথেষ্ট সময় পেয়েছে। সুতরাং অতি modern রাসেল সাহেবও যে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছেন, তাতে আমি আশ্চর্য্য হই নি, অবশ্য তাঁর ভক্তরা রাগ করতে পারেন। তেলাকুচোর গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলে—কে না রাগ করে। সে গাছের নাম modernismই হোক আর rationalismই হোক্।

এখন Russell তাঁর সদ্য প্রকাশিত পুস্তকে কি লিখেছেন শুনুন।

"The ancients, as everyone knows, regarded moderation as one of the cardinal virtues. The ancients, however, were clearly in the right. In the good life there must be a balance between different activities and no one of them must be carried so as to make the other impossible."

(The Conquest of Happiness p. 165.)

অবশ্য intellectual activities-ও যাকে আমরা বলি activities তারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব চিন্তারাজ্যেও মনের balance রাখবার চেষ্টাটা লজ্জাকর নয়। আর এই প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে moderation।

এতক্ষণ ত বীরবলের বাচালতা শুনলেন। আপনার পত্রে কি এ-রকম বাজে বকুনির স্থান হবে? আর যদি না হয় ত প্রমথ চৌধুরীকে আপনাদের দলে ভর্ত্তি করে নেবেন। বড় কথাকে ছোট করা আমার স্বভাব হবে কিন্তু ভদ্রলোক দেশীবিদেশী সব রকম বড় কথাকে আরও বড় করতে সদাই ব্যগ্র, সদাই প্রস্তুত।

বীরবল

প্রকাশক—শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ড্যালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৩৩৮

পরিচয়

পত্রিকা

শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

কল্যাণীয়েষু—

তোমার ত্রৈমাসিকের আসরে আমার কোনো একটি লেখার উদ্দেশে তোমার আমন্ত্রণ আছে। কোনো সাজসজ্জা না ক'রে এক-ছুটে গেলে যদি মানা না পায় তাহলে এই সুরু হোলো।

প্রথম যখন রামানন্দবাবু প্রদীপ ও পরে প্রবাসী বের ক'রলেন তাঁর কৃতিত্ব ও সাহস দেখে মনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলঙ্কৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলাদেশে চল্‌তে পারে তা বিশ্বাস হয়নি। তা ছাড়া এর আগে বাংলা সাময়িক পত্রে সময়রক্ষা ক'রে চলার বাঁধাবাঁধি ছিল না। সেকালে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ যেমন অপরাহ্ণ বা সায়াহ্নে যাত্রা সুরু ক'রতে লজ্জিত হত না, মাসিকপত্র তেমনি ললাটে মলাটে বৈশাখমাসের তিলক কেটে অগ্রহায়ণ মাসে যখন অসঙ্কোচে আসরে নামত সহিষ্ণু পাঠকের কাছে কোনো কৈফিয়তের দরকার হত না। পাঠকদের ক্ষমাগুণের 'পরে নির্ভর ক'রে এমনতর আট-পৌরে ঢিলেমি করবার সুযোগ প্রবাসী-সম্পাদক স্বীকার করেননি—নিজের মানরক্ষার খাতিরেই সময়রক্ষার স্খলন্ হতে দিলেন না। তিনি প্রমাণ করলেন বাংলা সাময়িক পত্রে এই প্রচুর ভোজ এবং নূতন ভদ্র চাল অচল হবে না। বস্তুত পাঠকদের এমন অভ্যাস জন্মে গেল যে আয়োজনে কম প'ড়লে বা আচরণে শৈথিল্য ঘটলে আর নিজগুণে তারা ত্রুটি মার্জ্জনা ক'রবে না যে, এতে সন্দেহ রইল না।

তা'র পর থেকে চ'ল্‌ল এই ছাঁদেরই মাসিক পত্রের অনুকরণ। নূতনত্বের চেষ্টা কেবল পরিমাণবাহুল্যের দিকে, ফর্ম্মা বৃদ্ধির ঘোড়দৌড়ে। আরো ছবি, আরো গল্প, আরো হাজার রকমের ইত্যাদি।

প্রবাসী-জাতীয় পত্রিকা দেশের একটা প্রয়োজন সিদ্ধি ক'রেচে। জন-সাধারণের চিত্তকে সাহিত্যের নানা উপকরণ দিয়ে তৃপ্ত করা এর ব্রত। এতে মনকে একেবারে জড়তায় জড়াতে দেয় না, নানা দিক থেকে মৃদু

আঘাতে জাগিয়ে রাখে। এদিকে দেশে লেখক বেশি নেই, এবং অধিকাংশ পাঠক গভীর বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট ক'রতে নারাজ। উদ্বোধনের চেয়ে উত্তেজনা তা'রা স্বভাবত বেশি পছন্দ করে। তাই সাহিত্যের মাসিক মজলিশে মদ যদি বা নাও থাকে অন্তত কড়া চুরুটের প্রচুর আমদানী চাই, সাহিত্যিক তাস-পাশার চেয়ে ভারী রকমের আয়োজনে বৈঠকের রসভঙ্গ হয়।

সাধারণের সঙ্গে যদি কারবার ক'রতে হয় তবে সাধারণের দাবী অজস্র পরিমাণেই মেটানো চাই। নইলে কাজ চলেই না। তাই লোক-চিত্তরঞ্জনের ব্যবস্থা জগৎ জুড়েই হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। যারা সেই হাল্‌কা দরের মন ভোলানো মাল যথেষ্ট পরিমাণে ও নিঃসঙ্কোচে জোগাতে পারে তাদের সঙ্গেই আর সকলের প্রতিযোগিতা। হাঁড়ি চলা চাইযে। এ ব্যবসায়ে যারা আছে তাদের মনে উচ্চ সংকল্প থাক্‌লেও নিজের অজ্ঞাতসারে আদর্শ নীচু হ'য়ে আসে। সাধারণের মন-জোগাবার আয়োজন চারিদিকে যতই বিস্তারিত হয় ততই অলস মনের সৌখীন ফরমাস বেড়ে ওঠে। বিপদ এই, তাদেরই বাহবার বাজার দর বেশি। উপযুক্ত লেখকের সংখ্যা কম অথচ লেখার পরিমাণ সীমা মানতে চায় না। অর্থাৎ ভোজে রবাহূত অতিথিসমাগমে পাত পাড়া বেড়েই চলেচে, অথচ দইয়ের হাঁড়ি সে-অনুপাতে টানলে বাড়ে না, তাতে জলের উপর নির্ভর ক'রতেই হয়, আর সে-জলও সকল সময়ে বিশুদ্ধ হতে পারে না। যদি একজন থিয়েটার-ওয়ালা লোভ দেখায় যে দু'টাকার টিকিটে রাত একটা পর্য্যন্ত অভিনয়ের পালা চালাবে, তাহলে তা'র চেয়েও দুঃসাহসিক রাত্রি দুটোর কমে বাতি নেবায় না। তবুও সময় বাড়ালে ভোগ্য বস্তুটাকে ফিকে না করা অসম্ভব—অথচ তাতে নেশার কম্‌তি হলে মঞ্জুর হবে না। এর ফল হয় এই যে, মিতাচারী যে-মানুষ্ রাত এগারোটা পর্য্যন্ত ভালো জিনিষের রস ভোগ ক'রে ভালোমানুষের মতো বাড়ি ফিরতে চায় তা'র আর উপায় নেই। এমন কি, ক্রমে তা'রও অভ্যাস মাটি হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মেন্‌কেন্ একজন নামজাদা মার্কিণ লেখক, অল্পদিন হোলো তিনি একটা লেখায় বল্‌ছিলেন,—হঠাৎ আর্থিক দুর্গতি ঘটায় আমেরিকায় সম্প্রতি পাঠক সংখ্যা ক'মে গেল, তাতে দায়ে প'ড়ে রচনার পরিমাণ ক'মে যাচ্ছে। তাঁর মতে এটাকে বলা যায় শাপে বর। চারদিক থেকে লেখা চাই লেখা চাই রবে উপযুক্ত পরিমাণ সময় নিয়ে লেখবার অবকাশ থাকে না। বইয়ের পাত ও নিজের গাঁঠ ভরাবার প্রলোভন যদি শান্ত হয় তাহলে লেখার উপরে নিষ্কামভাবে ষোলো আনা মন দেওয়া সহজ হবে। নইলে অত্যন্ত পসারগ্রস্ত ডাক্তার যেমন হাঁসপাতালে ঢুকে

তাড়াতাড়ি একধার থেকে নাড়ি টিপে বাঁধা নিয়মে চল্‌তি ওষুধের প্রেস্-ক্রিপ্‌শন লিখে দিয়ে দ্রুত পদে মোটরে চ'ড়ে বসেন,—তেমনি বহু ফরমাসে আক্রান্ত লেখক বাঁধা খদ্দেরদের সাধারণ পছন্দ বাঁচিয়ে হূ হূ ক'রে কলম চালিয়ে যান—ঘন ঘন নগদ-বিদায়ে তাঁদের ব্যবসা চলে। এই নগদ-বিদায়ের বস্তা বস্তা লেখা ক'মে যায় লোভের তাগিদ ক'ম্‌লেই। এর থেকে বোঝা যায়, পাঠক-সাধারণের নিয়ত দাবীর কর্ষুণে সকল দেশেই সস্তা সাহিত্যের প্রচুর ফলন ফলচে, অর্থাৎ খেলো নবাবীর বাহুল্যে কাশ্মীরে বুঁটা শালের উৎপত্তি বিপত্তির মতোই হ'য়ে উঠ্‌ল, যথেষ্ট সময় দিয়ে সেকেলে ভালো শাল রচনা সময়ে ও সামর্থ্যে এখন আর পোষায় না। সে সব বড়ো দরের শিল্প যাবার দাখিল।

আমার বক্তব্য, সাহিত্যেই কি, ব্যবহার-সামগ্রীতেই কি, অধিকাংশের সম্বলের দিকে তাকিয়ে এ-কথা বল্‌তেই হবে যে, সস্তা সামগ্রীর প্রয়োজন বহু পরিমাণে আছে। তাই ব'লে, আদর্শের দাবী, পরিমাণের মাপে যার বিচার করা চলে না, সে যদি স্তরে স্তরে চাপা প'ড়তে থাকে তাহলে তা'র চেয়ে শোকাবহ আর কিছুই হতে পারে না।

আদর্শরক্ষা ক'রতে গেলে প্রয়াসের দরকার, সাধনা না হলে চলেনা। বারোয়ারির আসরে দাঁড়িয়ে সাধনা অসম্ভব। সেই সাধনাপেক্ষী সাহিত্যের জন্য সময়ও চাই বড়ো, ক্ষেত্রও চাই উদার। এ-জায়গায় ভিড় জমাবার আশা নেই, কাজেই গুণজ্ঞের পরিতোষ ছাড়া অন্য পারিতোষিকের আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিতেই হবে। সাধারণের খ্যাতি-নিন্দার চড়া-নামা অনুসারে অর্থের দিকে সাহিত্যবাজারের এক্‌স্‌চেঞ্জ্ রেট্ ওঠে নামে। সেদিকে দুর্য্যোগ ঘ'টলেও মনের শান্তি রক্ষা করা চাই। শান্তি থাকেনা যদি অর্থের প্রয়োজন থাকে। শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ মেনে অর্থকে অনর্থ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্মীর ভ্রূভঙ্গ উপেক্ষা ক'রেও যদি সরস্বতীর ভজনা করবার ভরসা থাকে তবেই বিশুদ্ধভাবে অবিচলিত মনে সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনায় নিবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয়।

একদা আমাদের দেশে ব্রাহ্মণদের উপর দায়িত্ব ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসজাত শ্রেষ্ঠ আদর্শের বিশিষ্টতাকে বিশুদ্ধ রাখবেন তাঁরা। সেই উদ্দেশ্যে, জীবনযাত্রায় আড়ম্বরের বাহুল্য তাঁদের কমাতে হোলো। তাঁদের কাছ থেকে উজ্জ্বল বেশ বা আত্মঘোষণার বিচিত্র সমারোহ কেউ প্রত্যাশাই ক'রত না। তাঁদের সম্মান নির্ভর ক'রত তাঁদের সত্যের উপর, গভীর সংযম ও বাহুল্যবর্জ্জিত সুরুচির উপর। অর্থাৎ পরিমাণ নিয়ে তাঁদের বিচার ছিল না, তাঁদের গৌরব ছিল আন্তরিক পরিপূর্ণতা নিয়ে। জন-সাধারণের সম্মতি মেনে নিয়ে তাঁদের আদর্শ টি'কে ছিল না, তাঁদের

আদর্শকেই জনসাধারণে সবিনয়ে মেনে নিত। তা'র কারণ, সাধনার দ্বারাই তাঁরা সত্যের অধিকার পেয়েছিলেন। ভোগবাহুল্যবর্জ্জিত উপকরণ-বিরল জীবনযাত্রার জন্যে তাঁদের যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল জনসাধারণ সেটা জুগিয়ে দেওয়া দ্বারাই নিজেকে সার্থক ও সম্মানিত জ্ঞান ক'রত,—সে জন্যে কারো মন জুগিয়ে তাঁদের মাথা হেঁট ক'রতে হত না। যখন থেকে ব্রাহ্মণ নিজের দায়িত্বরক্ষার কঠিন সাধনা ছেড়ে দিয়ে কেবল পৈতে দেখিয়ে সম্মান ও অর্থ আদায়ের সহজ পথ অবলম্বন ক'রলেন তখন থেকে কী ঘট্‌ল এ-প্রসঙ্গে সে-আলোচনা অনাবশ্যক।

আমার বলবার কথা এই, সাধারণের মন না রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব কোনো না কোনো জায়গায় থাকা চাই। নইলে দেখতে দেখতে সাহিত্য অন্ত্যজবর্ণের রূপ ধ'রবেই। বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে একটি মাসিক পত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে একদিন মণিলাল আমার কাছে এসেছিল। আমি জানতুম, এটা কঠিন কাজ,—আমার অন্য কর্ত্তব্যের উপর এটা চাপালে বোঝা দুঃসহ ভারী হবে তাই নিজে এ-দায় নিতে রাজি হলুম না। অথচ অত্যন্ত প্রয়োজন আছে একথা অনেকদিন ভেবেচি—তাই সংকল্পটাকে একেবারে নামঞ্জুর ক'রতে পারলুম না। নৌকো ভাসাবার জন্যে প্রথম ধাক্কাটা দিতে এবং কিছুদিনের জন্যে লগি ঠেল্‌তে রাজি হলুম। তখন বয়স এখনকার চেয়ে অল্প এবং সাহস এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। প্রমথকে সম্পাদক ক'রতে পরামর্শ দিয়েছিলুম। কেননা যদিও তিনি পড়াশুনো ক'রেচেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি, তবু সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্ত্তি করা মন তাঁর নয়। ভাবনা-সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনের একটা স্বকীয় প্রবর্ত্তনা ও লেখবার সম্বন্ধে একটা স্বকীয় ছাঁদ আছে। সম্পাদকের এই গুণ থাকলে কাগজটা বেগবান হ'য়ে ওঠে। এই বেগ তাঁর সহযোগী লেখকদের মনকে ঠেলা দিয়ে তাঁদের চিত্তকে সতর্ক ও উদ্যমশীল ক'রে রাখতে পারে।

মণিলালের সঙ্গে প্রথম সর্ত্ত এই হোলো যে, যারা ওজন দরে বা গজের মাপে সাহিত্য-বিচার ক'রে তাদের জন্যে এ-কাগজ হবে না। সব লেখাই পয়লা নম্বরের হওয়া অসম্ভব, দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ভিড় হয় না, অতএব আয়তন ছোটো ক'রতেই হবে। গল্প না দিলে মরণং ধ্রুবং, তবু বাড়াবাড়ি বর্জ্জনীয়, অর্থাৎ গল্প স্বল্প হবে, এক গ্রাসে দুটো চারটে চলবে না। ছবি দেওয়া নিষেধ, বিজ্ঞাপনের বোঝাও পরিত্যাজ্য, তা'র মানে, মুনফার লোভ থেকে দৃষ্টি যথাসম্ভব ফিরিয়ে আনা চাই। লোকসান জিনিষটা কারো পক্ষে প্রার্থনীয় নয়, তা হোক্, ছোটো আয়তনের কাগজে ছোটো আয়তনের লোকসান সাংঘাতিক হবে না এই ভেবে মনটাকে বেপরোয়া এবং কলমটাকে

নিঃসঙ্কোচ রাখাই ভালো। মণিলাল রাজি হলেন, বল্‌লেন, এ-কাগজে ব্যবসার ছোঁয়াচ একটুও লাগবে না। লক্ষ্মী দেবী সকৌতুকে হাস্‌লেন কিন্তু ভ্রূকুটি ক'রলেন না।

বিনয় রক্ষা ক'রে সাবধানে কথা কওয়া শাস্ত্রবিহিত। আমরাই উঁচুদরের লেখার আদর্শ প্রবর্ত্তন করবার জন্যে সংসারে এসেচি এই কথা সর্ব্বদা মনে রেখে লেখকীয় উচ্চ বর্ণের ছুঁৎমার্গ অবলম্বন ক'রে চলার ভঙ্গীটাকে ইংরেজিতে বলে হাই-ব্রাউয়িজ্‌ম্, উঁচ্-কপালেগিরি। এটা ভালো নয়,—তাই ব'লে নত-চক্ষু অতি-নম্র ছদ্ম বিনয়ের আত্মলাঘবভঙ্গীটা মাটির মানুষের লক্ষণ ব'লে সাধারণ্যে প্রশংসিত হ'লেও সেটাকে পরিহার করা চাই। আমাদের মধ্যে শক্তির পরিমাণ কার কত তা নিয়ে নিজের মনে বা পরের কানে কথা তুল্‌তে গেলে অত্যুক্তি এসে প'ড়বে। কিন্তু একথা বল্‌তে দোষ নেই, যে, যার যত শক্তি থাক্ তা'র উপযুক্ত প্রকাশের জন্যে বাইরের দাবীটা একটা মস্ত প্রেরণা। আকাশে আষাঢ়ের সজল মেঘ ফিরে ফিরে আসে অথচ পৃথিবীর হাওয়ায় রসের অভ্যর্থনা নেই—মেঘ অল্প স্বল্প জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে চ'লে যায়, মাটি যথেষ্ট ভেজে না। দানের জল আষাঢ়ের কমণ্ডলুতে পূরো পরিমাণ আছে কিন্তু ধরার অঞ্জলি ঠিক মতো ক'রে তুলে ধরা হয় নি ব'লে ঋতুর দানসত্র ব্যর্থ হ'য়ে গেল এমন ঘটনা বারবার ঘটে। সাহিত্যেও সে-কথা খাটে। আমি মণিলালকে এই কথাটি ব'ললুম, "তুমি যে-কাগজ বের ক'রবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তা'র চেয়েও বড়ো কথা। সে-দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়,—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে-দাবী থাকবে। সে-চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ ক'রে সাবধান করে; লেখার অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সঙ্কুচিত হয়; অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চারিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তা'র তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি ক'রে তুলবে।"

অবশেষে সবুজ পত্র বাহির হোলো। এই পত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোল্‌বার জন্যে কিছুকাল সাধ্যমতো চেষ্টা ক'রেছিলেম সে কথা তোমাদের জানা আছে। আশা ছিল ক্রমে আমার ভার লাঘব হবে এবং একদল নতুন লেখক নিজের শক্তিকে আবিষ্কার ক'রে নতুন উদ্যমে এ'কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দুজনে লগি ঠেলার জায়গায় পাঁচ-সাতজন দাঁড়ি জুটে গেলে তখন হাঁফ ছাড়ব।

এই অধ্যবসায়ে অন্তত একজন ওস্তাদ লেখকের সাড়া পাওয়া গেল। তখন তাঁর নাম ছিল অজানা, আশা করি, এখন তাঁর নাম জানে এমন লোক খুঁজলে মেলে। তিনি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি নিজের চিত্তের জোরে নিজের মতো ক'রেই ভাবেন এবং স্বচ্ছন্দে সেটা স্বচ্ছ ক'রে প্রকাশ ক'রতে পারেন। তিনি নতুন কালের নতুন লেখক তাতে সন্দেহ নেই, সেইজন্যেই তাঁকে বাইরে নূতনত্বের ভেক ধারণ ক'রতে হয় নি, চিন্তাশক্তির অন্তর্নিহিত সহজ নূতনত্ব নিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত।

যাই হোক্ ভার কম্‌ল না। সাময়িক কাগজের বাঁধা ফর্‌মাস জুগিয়ে চলা সেকেলে ট্রামগাড়ির ঘোড়ার মতো দুঃখী জীবের কাজ। মন ছুটি চাইল, ক্লান্ত হ'য়ে শেষকালে জবাব দিলুম। বন্ধ হোলো চিত্রবিহীন ফর্ম্মা-বিরল সবুজ পত্র।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ফর্ম্মা গণনা ক'রে সবুজ পত্রের আয়ু নির্ণয় কোরো না। সবুজ পত্র বাংলা ভাষার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল। এ-জন্যে যে-সাহস যে-কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েচে তা'র সম্পূর্ণ গৌরব একা প্রমথনাথের। এর পূর্ব্বে সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার প্রবেশ একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু সে ছিল খিড়্‌কির রাস্তায় অন্দর মহলে। অবগুণ্ঠন খুলে ফেলে সদরের সভায় এখন সে যে-প্রশস্ত আসন নিয়েচে সেটা আজকাল তক্‌মা-পরা চোপদারেরও চোখে পড়ে না। এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বিবাদ বিদ্রূপ যথেষ্ট হ'য়ে গেছে কিন্তু শুধু যুক্তিতর্কের দ্বারা এ-সব জিনিষের যাথার্থ্য প্রমাণ হয় না। একবার যেম্‌নি এ'কে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেচে। তা'র কারণ, এটা জবর দখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তা'র নিজের স্বভাবের মধ্যেই ; ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে' দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

যথার্থ স্বত্বাধিকারীকে প্রবল পক্ষ অনেকদিন যখন বঞ্চিত ক'রেচে তখন তাকে দখল দেওয়াবার জন্যে যে-মানুষ কোমর বেঁধে সীমানার কাছে এসে দাঁড়ায় তা'র মাথা বাঁচানো শক্ত হয়, কারণ লোকে তাকেই বলে ডাকাত। প্রমথর পিঠে অনেক বাড়ি প'ড়েচে, কিন্তু অহিংস্রনীতি তাঁর নয়। মোটা লাঠির ঘা খেয়েচেন, চালিয়েচেন তীক্ষ্ণ সড়কি। যাই হোক্ বাংলা ভাষার হাওয়া যেই পুব দিকে মুখ ফেরাল অমনি তখন থেকে একটা নব বারিবর্ষণের পালা প'ড়েচে। শুনেচি তরুণেরা বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি অনেক নূতন কীর্ত্তি ক'রেচেন ব'লে গৌরব করেন কিন্তু ভাষায় নূতন পথকে বাধামুক্ত করবার যে-উদ্যোগ প্রমথ ক'রেচেন তা'র চেয়ে

ইদানীং আর কী উদ্ভাবিত আমি জানিনে। এটা জানা আছে প্রমথকে বয়স খতিয়ে তরুণ বলবার জো নেই।

দুঃসাহসে ভর ক'রে তুমি "পরিচয়" ত্রৈমাসিক বের ক'রেচ। এটিকে কী মূর্ত্তি দিলে মন খুসি হবে সেইটি জানাবার জন্যে তোমাকে চিঠি লিখতে ব'সেছিলুম। আমার মতো স্বভাব-কুঁড়ে মানুষ কেজো লোকের চেয়ে অনেক বেশি খেটে মরে, কিন্তু নিজেকে ভোলাবার জন্যে খাটুনিকে কুঁড়েমির মুখোষ পরাতে হয়। তোমাকে যখন লিখ্‌তে বসলুম প্রথমটা মন পিছু-হঠবার চেষ্টা ক'রে ব'ল্‌লে, "বাস্‌রে, আবার কলম ধরো কেন ?" আমি তাকে দিলাশা দিয়ে ব'ললুম, "ভয় নেই, একখানা চিঠিমাত্র।" মন তখন ছুল্‌কি গতিতে ব'কে গেল। তাকে লাগাম পরাতে গেলে দুর্ঘটনা ঘট্‌ত। কিছুকাল থেকে আমার এই দশা। বহুকালের স্বভাবদোষে নানারকমের চিন্তা অন্তরের ক্ষেত্রে চ'রে বেড়ায়। বেঁধে যদি তাদের চালাতে যাই তাহলেই বল্‌গা দাঁতে কাম্‌ড়িয়ে ধ'রে থেমে যাবার চেষ্টা করে। তখন জিন লাগাম ফেলে দিয়ে খালি পিঠে চ'ড়ে পা দোলাতে দোলাতে মাঠে বাটে বনে বাদাড়ে দৌড় করিয়ে নিয়ে আসি—এ'কেই বলে আমার চিঠি। এ হচ্চে নিজের মনকে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খাওয়ানো। এ'কে চিঠি বলাই ভুল। যাকে লিখি সে লক্ষ্য নয়, সে উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু উপ-লক্ষ্যেরও দাম আছে, এরকম চিঠিও সবাইকে লেখা চলে না। ব্যক্তি-বিশেষের অন্দর দরজার ভিতর দিয়ে অবশেষে এ-চিঠিগুলো পৌঁছয় গিয়ে সদরে। তা'র খোলা জানলায় ব'সে সে যদি ডাক দিয়ে না আন্‌তে পারে তাহলে রাস্তা পাওয়া যায় না। রাস্তাটি পরিচিত রাস্তা হওয়া চাই। মানে এ নয় যে অনেক দিনের জানা রাস্তা, কিন্তু তা'র মধ্যে যেন একটি স্বভাবসিদ্ধ পরিচয় আছে, বাধা কম, বন্ধুত্ব থাক্ বা না থাক্, বন্ধুরতা নেই।

বোধ করি আমার কাছে একখানা প্রবন্ধ প্রত্যাশা ক'রেছিলে। আজকাল সেই প্রত্যাশাকে অত্যন্ত ডরাই ব'লে এই পত্র। এর মধ্যে নিজের কথা অনেকখানি আছে কিন্তু সেটাও অবান্তর, সেই প্রসঙ্গে কিছু ব'লেচি যেটা প্রবন্ধে বলা চলত। অর্থাৎ কর্ত্তব্যে অলস মনকে তা'র অজ্ঞাতসারে একটুখানি কর্ত্তব্য করিয়ে নিয়েচি। ইতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রীতি-বিচার

শ্লেষ

(১)

বর্ত্তমান কালের বিদগ্ধ মানুষ তার স্বদেশী ভাষার কাব্য ও সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। একটি দুটি বিদেশী ভাষার সাহিত্যের সাক্ষাৎ অনুশীলনে সে অভ্যস্ত, এবং অনুবাদের মারফৎ আরও অনেক দেশের সাহিত্যের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এর ফলে আধুনিক কাব্য-রসিক ও সাহিত্য-পাঠকদের রসজ্ঞতা ও সাহিত্যিক বোধ সূক্ষ্ম ও উদার হ'য়েছে। রস-সৃষ্টির যে কৌশল ও সাহিত্য-রচনার যে ভঙ্গী ভাষা-বিশেষের বিশেষত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে তাকে খুব বড় দাম দিতে তার মন নারাজ। এবং সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধরা-বাঁধা কোনও নির্দ্দিষ্ট উপায় নেই, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকেরা যে নানা ঋজু ও কুটিল পথে এক-ই গন্তব্যে যেয়ে পৌঁছেন এ প্রত্যয় তার মনে আজ সুদৃঢ়। অর্থাৎ কাব্য ও সাহিত্যের যাকে মোটামুটি বহিরঙ্গ বলা যায়, ভাষার সেই প্রয়োগ-কৌশল থেকে দৃষ্টি স'রে এসে প্রায় একান্তভাবে নিবদ্ধ হ'য়েছে ওদের মর্ম্ম-স্থানে, রস ও বক্তব্যের উপরে। আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সাহিত্য-রসিকদের চিত্তধারা স্বভাবতই বিভিন্ন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় লেখা কাব্য ও সাহিত্যই ছিল তাঁদের চর্চ্চার বিষয়। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত কাব্যাদির সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু ও-সব ভাষা ছিল দৈবী সংস্কার-সম্পন্ন দেব-ভাষা সংস্কৃতের অনুচর মাত্র, তৎভব বা তৎসম (১)। তার সঙ্গে সমান আসনে বসার অধিকারী নয়। সেইজন্য কাব্য ও সাহিত্য বিচারে সংস্কৃত ভাষার কোনও কোনও বিশেষত্বকে তাঁরা সাহিত্য-রচনার অপরিহার্য্য গুণ বা দোষ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন। এ কালের মানুষের বিশেষকে সামান্য ব'লে ভুল করার এ সম্ভাবনা অনেকটা কম। নানা ভাষার সাহিত্যের চর্চ্চা ও তুলনা তাকে সে ভ্রম থেকে রক্ষা করে। কিন্তু একটিমাত্র ভাষায় লেখা সাহিত্যের উপর অখণ্ড মনোযোগের একটা সুফলও ফলেছিল। কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে ঐ ভাষা প্রয়োগের সমস্ত রকম কল-কৌশলের দিকে তাঁদের ঔৎসুক্য ছিল অপরিসীম। এবং মনের সমস্ত বিশ্লেষণ শক্তি দিয়ে রচনা-রীতির গুণদোষের কারণ ও স্বরূপ তাঁরা অনুসন্ধান করেছিলেন। ফলে যা আবিষ্কার করেছিলেন তার বেশীর

(১) সংস্কৃতং নাম দৈবী বাগন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমো দেশীত্যনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥ (দণ্ডী, কাব্যাদর্শ ১।৩৩।)

ভাগ কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার সাহিত্য-রচনা রীতির বিশেষত্ব নয়, সকল ভাষার ও সকল সাহিত্যের রচনা-রীতির সাধারণ দোষগুণ। কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রেই ভাষা প্রয়োগের কতকগুলি মূল কৌশল আছে, যা সকল ভাষাতেই প্রায় এক। বিশ্লেষণের শক্তি যাদের আছে তারা যে কোনও ভাষার শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্য পরীক্ষা ক'রে এ গুলি আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেন। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই করেছিলেন। আমরা আধুনিক লোক অনেক ভাষার কাব্য সাহিত্যের চর্চ্চা ক'রে, এবং অনেক ভাষার কাব্য সাহিত্যের অন্য ভাষার অনুবাদমাত্র প'ড়ে প'ড়ে, প্রায় ভুল্‌তে বসেছি যে ভাষা সাহিত্যের পোষাক নয়, শরীর। এবং দেহহীন আত্মা আর যেখানেই থাক্‌ সাহিত্যে নেই। প্রাচীনকালেও দেখা যায় আমাদের নব্য-আলঙ্কারিকেরা রসকে যখন কাব্যের আত্মা ব'লে দৃঢ়নিশ্চয় হ'লেন তখন কাব্যের রচনা-রীতি সম্বন্ধে তাদের আর অনুসন্ধিৎসা থাক্‌ল না। নব্য-আলঙ্কারিকদের পুঁথিতে রীতি-বিচার দু-এক পৃষ্ঠাতেই শেষ হ'য়েছে, এবং তাঁদের বক্তব্য প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মতের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি মাত্র।

(২)

ইংরেজিতে যাকে 'ষ্টাইল' বলে তার আলঙ্কারিক নাম 'রীতি' বা 'মার্গ'। "বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ" (বামন)। কাব্য ও সাহিত্য রচনায় পদের মনোনয়ন ও তার বিন্যাস-প্রণালীর বিশেষত্বই হচ্ছে 'রীতি'। 'ষ্টাইল'-ও এ ছাড়া আর কিছু নয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন ছবিতে রেখার যে স্থান, কাব্য ও সাহিত্যে রীতি বা ষ্টাইলের সেই স্থান। "রীতিষু রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতং" (বামন)। চিত্র যেমন রেখায় প্রতিষ্ঠিত, কাব্য তেমনি রীতিতে প্রতিষ্ঠিত। ছবিতে রং ফলানো, তার অংশ সংস্থানের পারিপাট্য, তার ভাবের অভিব্যঞ্জনা এ সবের উৎকর্ষ অসম্ভব হয় যদি না মূলে থাকে রেখাঙ্কনের বিশুদ্ধি ও সুকৌশল। পদবিন্যাসের কুশলতাকে আশ্রয় ক'রেই কাব্যের অলঙ্কার, ধ্বনি, রস এ সব ফুটে ওঠে। শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যে পদ-প্রয়োগের নৈপুণ্য, ও তার গ্রন্থন-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব প্রথমেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। আলঙ্কারিকদের মধ্যে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে ;—

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিন্যাস মাত্রেণ যয়া নাপহৃতং মনঃ॥"

সে নারীর রূপ-ই বা কি, আর সে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্বই বা কোথায়,— পদ-বিন্যাসমাত্রেই যারা মনকে না মুগ্ধ করে। অর্থাৎ 'ষ্টাইলের'

চমৎকারিত্ব শ্রেষ্ঠ কাব্য ও সাহিত্যের একটি সুব্যক্ত অব্যভিচারী লক্ষণ।

যদি সমগ্রভাবে দেখা যায় তবে প্রত্যেক যথার্থ কবি ও সাহিত্যিকের 'ষ্টাইল' তাঁর নিজস্ব। কারও রচনা-রীতি ঠিক অন্য কারও মত নয়; যেমন এক মানুষের মুখের গড়ন ঠিক অন্য মানুষের মত নয়। সুতরাং প্রতি কাব্য ও সাহিত্য-স্রষ্টার রীতির তুলনা ও প্রভেদ আলোচনা অসম্ভব। আলঙ্কারিক দণ্ডীর কথায় এ যেন ইক্ষু, ক্ষীর ও গুড়ের স্বাদের তফাৎ। আস্বাদয়িতা মাত্রেই বোঝে এ সব জিনিষের মিষ্টত্বের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু সে প্রভেদ সম্পূর্ণ ক'রে ভাষায় প্রকাশ করতে স্বয়ং সরস্বতীও অক্ষম; কারণ তা অনির্ব্বচনীয় (২)। কাজেই রীতি-বিচার কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ ধ'রে রচনা-রীতির কয়েকটি মুখ্য বিভাগ বা 'টাইপের' গুণদোষের বিচার ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। এমনধারা শ্রেণী-বিভাগেও আলঙ্কারিকেরা দেখেছেন ;—

"অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।" (কাব্যাদর্শ)।

যদি পরস্পরের সব সূক্ষ্মভেদ ধরা যায় তবে তার সংখ্যাও বড় কম হয় না। সুতরাং আলোচনাকে নিষ্ফল বাহুল্য থেকে রক্ষার জন্য প্রায় অলঙ্কারিক-ই দুটি মাত্র রীতির পরস্পর তুলনা ক'রে 'ষ্টাইলের' লক্ষণ ও দোষগুণের বিচার ক'রেছেন। কারণ তাঁদের মতে এ রীতি-দুটি প্রায় বিপরীত ধর্ম্মী, রচনা-পদ্ধতির সুমেরু কুমেরু। আর সব 'ষ্টাইল' এদের মধ্যবর্ত্তী; একটির বা অন্যটির দুটি একটি লক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়াই কারও বিশেষত্ব, উভয় রীতির কতক লক্ষণ কিছু কিছু মিশিয়ে কারও বা সৃষ্টি। এ দুটি রীতির একটির নাম বৈদর্ভী, অন্যটির নাম গৌড়ী।

বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ মোটামুটি প্রাচীন বিদর্ভ। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ নিয়ে ছিল প্রাচীন গৌড়দেশ। বৈদর্ভী আর গৌড়ী এ নাম দুইটি এসেছে অবশ্য ঐ দুই দেশের নাম থেকে। বামন প্রশ্ন করেছেন,—"কিং পুনর্দেশবশাদ্রব্যবদ্‌গুণোৎপত্তিঃ কাব্যনাম্, যেনায়ং দেশাবিশেষব্যপদেশঃ।" দেশের জলমাটির গুণে যেমন উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ দোষ জন্মে, তেমনি দেশভেদে কি কাব্যেরও রকম বদ্‌লায় নাকি যে দেশের নামে কাব্যের রীতির নামকরণ হয়? উত্তর দিয়েছেন, তা অবশ্য নয়; সুধু দেশ কাব্যের কিছু ভালমন্দ জন্মায় না। ঐ ঐ দেশের কবিরা ঐ রচনারীতির স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি ও অনুসরণ করেছেন ব'লেই দেশের নামে

(২) ইক্ষুক্ষীরগুড়াদীনাং মাধুর্য্যস্যান্তরং মহৎ।
তথাপি ন তদাখ্যাতুং সরস্বত্যাপি শক্যতে॥ (কাব্যাদর্শ, ১।১০২।)

রীতির নাম (৩)। বিদর্ভ দেশের কোন কবি সম্প্রদায়, হয়তো বা বৈদর্ভী দময়ন্তীর কাব্য-গাথা গান ক'রে, বৈদর্ভী রীতিকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন তা জানা নেই। গৌড়ের কোন কবি পরম্পরা গৌড়ী রীতিকে বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন সে ইতিহাসও অজ্ঞাত। বামনের অনুমানের মূলে সত্য কতখানি আছে তা-ও ঠিক ক'রে বলা চলে না। কিন্তু এ অজ্ঞতায় কিছু যায় আসে না। বৈদর্ভী রীতি কাকে বলে, আর গৌড়ী রীতিই বা কি আলঙ্কারিকেরা তা পরিষ্কার বলেছেন। এবং তা থেকে দেখা যায় এ দুই রীতির নামের ইতিহাস যা-ই হোক, এ দুটি 'ষ্টাইল' সব দেশের সব কালের সাহিত্যেই রয়েছে। অর্থাৎ ও নাম দুটি পারিভাষিক, এবং নামধেয় রীতি দুটি সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালিক।

(৩)

বৈদর্ভী রীতির পরিচয় দিতে যেয়ে বামন বলেছেন, "সমগ্রগুণা বৈদর্ভী" ;—'ষ্টাইলের' যে গুলি গুণ তার সব যাতে রয়েছে তার নাম বৈদর্ভী রীতি। বলা বাহুল্য এটা সংজ্ঞা নয়, স্তুতি। সুতরাং আলঙ্কারিকেরা কাকে বৈদর্ভী রীতি বলেন তা বোঝার উপায় 'ষ্টাইলের' কোন কোন বিশেষত্বকে তারা গুণ বলেন তার অনুসন্ধান নেওয়া। 'ষ্টাইলের' এই সব গুণদোষের বিচারই আলঙ্কারিকদের রীতি-বিচার।

যে সব গুণের সমাবেশে বৈদর্ভী রীতি 'সমগ্রগুণা', অর্থাৎ আলঙ্কারিকদের মতে যে সব বিশেষত্ব 'ষ্টাইলের' গুণ, তার ফর্দ্দ দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শের' একটা শ্লোকে নিবদ্ধ আছে।

"শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তিসমাধয়ঃ॥" (১।৪১)।

শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য্য, সৌকুমার্য্য, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি। এই দশটি হচ্ছে 'ষ্টাইলের' গুণ, এবং এর সবগুলি যে লেখায় আছে তার ষ্টাইল হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ বৈদর্ভী। বামন তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্রেও' এই দশটি গুণের নাম করেছেন। কিন্তু নাম এক হ'লেও এই দুই আলঙ্কারিকের কাছে তাদের অর্থ সব সময় এক নয়। এঁদের গ্রন্থে এই দশটি নামে যে সব গুণ বোঝায় তা অনেক জায়গায় অল্প বিস্তর ভিন্ন। বিশেষ সন্দেহ নেই যে এই নামগুলি অতি

(৩) তদ্রত্যৈঃ কবিভির্যথাস্বরূপমুপলব্ধত্বাত্তৎসমাখ্যা।
ন পুনর্দেশৈঃ কিংচিদুপক্রিয়তে কাব্যানাম্। (কাব্যালঙ্কার সূত্র ২।১০।)

প্রাচীন, এবং যে সব আলঙ্কারিকদের পুঁথি আমরা পাই তাঁদের সময় এই নামগুলির অর্থ নিয়ে মতভেদ ঘটেছে।

(৪)

দণ্ডীর শ্লোকে 'ষ্টাইলের' প্রথম গুণটির নাম 'শ্লেষ'। শ্লেষ শব্দের অর্থ সংযোগ। যে বাক্যের উচ্চারণে তার অংশগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে উচ্চারণ হয় সেই বাক্যে এই শ্লেষ-গুণ রয়েছে, অর্থাৎ সে বাক্য হচ্ছে 'শ্লিষ্ট'। "শ্লিষ্টমস্পৃষ্টশৈথিল্যম্" (দণ্ডী); শ্লিষ্ট বাক্য হচ্ছে তাই শিথিলতা যাকে স্পর্শ করে নাই। সোজা কথায় 'ষ্টাইলের' প্রথম গুণ হচ্ছে যে পদ-বিন্যাস এমন হবে যে বাক্যগুলির গড়ন হবে আঁটা সাঁটা, ঢিলে ঢলঢলা নয়। এই আঁট্-সাঁট্ রচনাকে আলঙ্কারিকেরা বলেন 'গাঢ়বন্ধ'; যার বিপরীত হচ্ছে 'শিথিলবন্ধ'।

কিন্তু রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা যায় অনেক উপায়ে। অর্থাৎ গাঢ়-বন্ধত্বের রকমভেদ আছে। সংস্কৃত ভাষায় এর একটা সহজ উপায় হচ্ছে দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ দিয়ে বাক্য-রচনা করা; এবং সংস্কৃতের সন্ধির নিয়ম এ উপায়কে খুব সাহায্য করে। নমুনা স্বরূপ ভর্তৃহরির 'বৈরাগ্যশতকের' মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি নেওয়া যেতে পারে।

চূড়োত্তংসিতচন্দ্রচারুকলিকাচঞ্চচ্ছিখাভাস্বরো
লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ শ্রেয়োদশাগ্রে স্ফুরন্।
অন্তঃস্ফূর্জদপারমোহতিমিরপ্রাগ্ভারমুচ্চাটয়ং
শ্চেতঃসদ্মনি যোগিনাং বিজয়তে জ্ঞানপ্রদীপো হরঃ॥

'শিরোভূষণ চন্দ্রের চারুকলার প্রকট শিখাগ্রে যিনি দীপ্তিমান, চঞ্চল কাম-পতঙ্গকে লীলাবশে যিনি অবলীলায় দগ্ধ করেছিলেন, মঙ্গল যাঁর সম্মুখে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, অন্তরের অপার মোহতিমিরের গুরুভার উত্তোলন ক'রে সেই মহাদেব যোগীদের চিত্তগৃহে জ্ঞানের প্রদীপ হ'য়ে বিরাজ করেন।' ভর্তৃহরির এই শ্লোকটি যে গাঢ়বন্ধ তা বলা বাহুল্য। ওর প্রথম ও তৃতীয় চরণ পদগুলির সমাস ও সন্ধিতে জমাট বেঁধে এক হ'য়ে আছে; এবং সমস্ত শ্লোকটির শব্দের গতি প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটানে চ'লে এসেছে, কোথাও আহত হয় নি। তবে ভর্তৃহরি বড় আর্টিষ্ট; দীর্ঘ সমাস দিয়ে তিনি নাক ও কানের দম বন্ধ করেন নি। প্রথম চরণের লম্বা একটানা সমাসের পর, দ্বিতীয় চরণে স্বর ও কানকে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দিয়ে, তবে আবার জমাট তৃতীয় চরণটি এনেছেন; এবং শেষ চরণে দীর্ঘ-সমাস

একবারে বর্জ্জন ক'রে কানকে ক্লান্তি-বিরামের সুখ ও বৈচিত্র্যের চমৎকারিত্ব দিয়ে খুসি করেছেন।

কিন্তু আলঙ্কারিকেরা বলেন বৈদর্ভী-রীতির শ্লেষ এ গাঢ়বন্ধত্ব নয়। সমাস ও সন্ধির চাপে বাক্যের যে জমাটবাঁধা ভাব তার নাম 'ওজঃ'; বাঙ্গলায় আমরা যে ভাবে বলি 'ওজঃস্বিনী ভাষা' কি 'ওজঃস্বিনী বক্তৃতা'। তাঁদের মতে বৈদর্ভী-রীতির কোনও কোন রকম গদ্যে ওটি বেশ লাগসই বটে, কিন্তু পদ্যে অচল। গৌড়ী-রীতির লেখকেরা ঐ রকম দীর্ঘ-সমাসবদ্ধ পদ দিয়েই পদ্যকেও গাঢ়বন্ধ করেন, কিন্তু শ্লেষ তা নয়। (৪)। শ্লেষের গাঢ়ত্ব হচ্ছে পৃথক্ সব পদের গাঢ়বন্ধন। পদগুলি পৃথক্ পৃথক্ থাক্‌বে কিন্তু বিন্যাসের কৌশলে মনে হবে যেন একটি মাত্র পদ। বামন শ্লেষকে বলেছেন মসৃণত্ব। "মসৃণত্বং শ্লেষঃ", এবং ব্যাখ্যা করেছেন, "মসৃণত্বং নাম যস্মিন্ সতি বহূন্যপি পদান্যেকবদ্ ভাসন্তে"। সুতরাং শ্লেষ হচ্ছে সেই গুণ যাতে পদগুলির পৃথকত্ব বজায় থাকে, অথচ রচনা হয় গাঢ়বন্ধ, অর্থাৎ অশিথিল ও মসৃণ। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলার' নান্দী বাক্যটি পরীক্ষা করা যাক্।

যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্।
যামাহুঃ সর্ব্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

এ শ্লোকের পদগুলি লম্বা সমাস দিয়ে বড় বড় খণ্ড ক'রে একত্র গাথা নয়, সুতরাং এর অংশগুলির মধ্যে ফাঁক আছে যথেষ্ট; এমন কি এর সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদগুলিও জমাট বাঁধা একাকার নয়, তাদেরও অংশ-গুলির ব্যক্তিত্ব বজায় আছে। (৫)। কিন্তু তার ফলে শ্লোকটির গড়নে কোথাও শিথিলতা আসে নি, বা তার গতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। পদগুলির পৃথকত্ব বজায় রেখেই এর রচনা চমৎকার গাঢ়বন্ধ, এবং এর

(৪) ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্।
পদ্যেঽপ্যদাক্ষিণাত্যানামিদমেকং পরায়ণম্॥ (কাব্যাদর্শ, ১।৮০)।

দণ্ডী সাধারণভাবে 'গদ্যস্য' বলেছেন বটে, কিন্তু 'কাব্যাদর্শের' টীকায় ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ দেখিয়েছেন যে ওর যথার্থ অর্থ কোনও কোনও রকমের গদ্য প্রবন্ধ। কারণ এমন সব গদ্য ছিল যাতে দীর্ঘ সমাস ব্যবহার হ'তো না। "এতৎ সমাসভূয়স্ত্বরূপমোজঃ, গদ্যস্য গদ্যপ্রবন্ধবিশেষস্য উৎকলিকাপ্রায়স্যেত্যর্থঃ, চূর্ণকাদৌ দীর্ঘসমাসাভাবাৎ"।

(৫) যেমন 'সর্ব্ব-বীজ-প্রকৃতি-রিতি', 'প্রপন্ন-স্তনুভি'-রবতু 'বস্তাভি-রষ্টাভি-রীশঃ'। ভর্তৃহরির শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের 'লীলা-দগ্ধ-বিলোল-কাম-শলভঃ' তুলনা করলেই প্রভেদটি স্পষ্ট বোঝা যায়। 'লীলাদগ্ধবিলোলকামশলভঃ' সমাসবদ্ধ একটি পদ। কিন্তু ওর অন্তর্গত মূল পদগুলির ব্যক্তিত্ব লোপ হ'য়ে যায় নি, যেমন প্রথমও তৃতীয় চরণে হ'য়েছে।

অব্যাহত গতি 'বলের' মত একটানা গ'ড়িয়ে চলা নয়, সুগঠিত দেহের স্বচ্ছন্দ সুঠাম গতি-ভঙ্গী। আলঙ্কারিকেরা একেই বলেন 'শ্লেষ'। রচনায় গাঢ়বন্ধত্ব 'ষ্টাইলের' একটা প্রধান গুণ, কিন্তু বন্ধের এ গাঢ়তা আসবে পদগুলিকে তাল পাকিয়ে একাকার ক'রে নয়, বিচিত্রকে ঐক্যের বন্ধন দিয়ে। অর্থাৎ এ গাঢ়বন্ধত্ব mechanical নয়, organic।

(৫)

যে ভাষায় সন্ধি নেই ও সমাস চলে না সেখানে গাঢ়বন্ধত্ব মাত্রেই এই বৈদর্ভী শ্লেষ, কারণ গৌড়ী ওজঃ তাতে অসম্ভব। সুতরাং সে ভাষায় কেবল শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনাতেই বন্ধের গাঢ়তা দেখা যায়; কারণ সন্ধি-সমাসের মোটা উপায়টা না থাকায় একমাত্র শ্লেষের সূক্ষ্ম কারিকুরি-ই সেখানে লেখায় গাঢ়বন্ধত্ব আনতে পারে। কিন্তু ঠিক সেইজন্যই সে ভাষার রচনা যেখানে গাঢ়বন্ধ, তার ফলও কান ও মনের উপর চমৎকার। যেমন কীট্স্ এর Mermaid Tavern-এর আরম্ভটা ;—

Souls of Poets dead and gone,
What Elysium have ye known,
Happy field or mossy Cavern,
Choicer than the Mermaid Tavern?

বামন 'শ্লেষের' উদাহরণ দিতে যেয়ে 'কুমারসম্ভবের' প্রথম শ্লোকটি তুলেছেন ;—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥

সংস্কৃত ভাষায় যেটুকু সন্ধি সমাস এক রকম অপরিহার্য্য, এবং যা সে ভাষার প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার খাপ খায়, কালিদাস তার সাহায্য পেয়েছেন। অনুস্বার বিসর্গের সুকৌশল প্রয়োগে সংস্কৃত রচনায় যে সংহতি আসে কালিদাস তাও ব্যবহার করেছেন। কীট্স্-এর এ-সব সুবিধা ছিল না। কিন্তু তাঁর কবিতার গাঢ়বন্ধত্ব কালিদাসের শ্লোকের চেয়ে কম নয়; ও কবিতা যেমন অশিথিল, তেমনি মসৃণ। অবশ্য তুলনা করতে হ'লে কালিদাসের কবিতার বিষয়ের গাম্ভীর্য্য, এবং কীট্স্-এর কবিতার বিষয়ের লঘুত্ব তাঁদের ভাষায় যে ভিন্ন ছায়া ফেলেছে তার তফাৎটা মনে রেখে তুলনা করতে হবে। এবং সম্ভব পাঠকের মনে হবে কীট্স্-এর কবিতার

বন্ধগাঢ়তা কালিদাসের শ্লোকের চেয়েও বা মনোরম, কারণ ওর 'শ্লেষের' কৌশল আরও প্রচ্ছন্ন, শিল্প আরও সূক্ষ্মতর।

সন্ধি-সমাসহীন ভাষায় 'শ্লেষ' যে সহজ-লভ্য নয়, তার কারণ সেখানে রচনা সাধারণত হ'য়ে পড়ে হয় শিথিল, নয় অমসৃণ। ভাষা হয় নিজেকে টেনে লতিয়ে চলে, নয় খট্ খট্ ক'রে লাফিয়ে হাঁটে। কীট্স্-এর কবিতাটির সঙ্গে টেনিসনের The May Queen-এর, প্রথম চার লাইন তুলনা করা যাক্ :—

You must wake and call me early, call me early, mother dear ;
To-morrow 'ill be the happiest time of all the glad New-year ;
Of all the glad New-year, mother, the maddest meriest day ;
For I'm to be the Queen O' the May, mother, I'm to be Queen
[O' the May.

কীট্স্-এর তুলনায় এ কবিতায় বন্ধের গাঢ়তা নেই বললেই চলে। তার কারণ এ নয় যে কীট্স্-এর কবিতা অল্পমাত্রিক হ্রস্ব-ছন্দের কবিতা, আর টেনিসনের কবিতার হচ্ছে বহুমাত্রিক দীর্ঘ ছন্দ। শিল্পীর হাতে প'ড়লে দীর্ঘ-ছন্দের কবিতাও সমান গাঢ়বন্ধ হ'য়ে ওঠে।

Where are the songs of spring? Ay, where are they?
Think not of them, thou hast thy music too,—
While barred clouds bloom the soft-dying day,
And touch the stubble-plains with rosy hue ;

কীট্স্-এর এ দীর্ঘ ছন্দের কবিতাও চমৎকার গাঢ়বন্ধ। আবার ছন্দ হ্রস্ব হ'লেই গাঢ়বন্ধত্ব আসে না। যেমন টেনিসনের—

Go not, happy day,
From the shining fields,
Go not, happy day,
Till the maiden yields.
Rosy is the West,
Rosy is the South,
Roses are the cheeks,
And a rose her mouth.

'Maud'-এর এ কবিতার ছন্দ খুবই হ্রস্ব, এবং বিষয়ও কবিত্বের, কিন্তু তবুও কবিতাটি গাঢ়বন্ধ হ'য়ে উঠল না। কারণ শিথিলতা থেকে মুক্ত হ'লেও মসৃণতা ওতে আসে নি। লতিয়ে চলা যদি বা এড়ান যায়, অমনি এসে পড়ে লাফিয়ে হাঁটা।

আলঙ্কারিকেরা বলেছেন 'শ্লেষের' গাঢ়বন্ধত্বের মূল হচ্ছে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের বিন্যাসের সুকৌশল। স্বরবর্ণ, বর্গের অযুগ্মবর্ণ অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, এবং য, র, ল, ব এই কয়টি হচ্ছে অল্পপ্রাণ বর্ণ কারণ, অল্প আয়াসেই এদের উচ্চারণ করা যায়। বাকী বর্ণগুলি

মহাপ্রাণ, যাদের উচ্চারণ কিঞ্চিৎ যত্নসাধ্য। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে-রচনায় 'শ্লেষ'-গুণ আছে দেখা যায় তাতে অল্পপ্রাণ বর্ণের প্রয়োগ বেশী, দণ্ডীর কথায় সে রচনা "অল্পপ্রাণাক্ষরোত্তরম্" ; কিন্তু তার মাঝে মাঝে এমন কৌশলে মহাপ্রাণ বর্ণের বিন্যাস থাকে যাতে রচনা একসঙ্গে গাঢ় ও মসৃণ হ'য়ে ওঠে। ক্রমদীশ্বর ভ্রমরের গুঞ্জনের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন :—

"অল্পপ্রাণেষু বর্ণেষু বিন্যাসোঽপ্যন্তরান্তরা।
মহাপ্রণস্য চ শ্লেষো যথায়ং ভ্রমরধ্বনিঃ॥"

আলঙ্কারিকদের এ 'থিওরি' পরীক্ষার ভার পণ্ডিতদের উপর দেওয়া গেল। পাঠকদের মধ্যে যদি কেউ কুতূহলী থাকেন তবে Mermaid Tavern ও 'কুমারসম্ভব' থেকে যে দুটি শ্লোক তোলা গেছে তাতে এ 'থিওরি' প্রয়োগ ক'রে দেখ্‌তে পারেন। আলঙ্কারিকদের কথা নেহাৎ মিথ্যা মনে হবে না।

(৬)

কবির ক্ষমতা যতই কম হোক্, পদ্য রচনায় কিছু না কিছু গাঢ়তা এসেই যায়। তার কারণ কবিতার ছন্দ। ছন্দের ছকে আস্‌লেই ভাষা কতকটা গাঢ়বন্ধ না হ'য়ে পারে না। কিন্তু গদ্যরচনায়, যেখানে ছন্দের সাহায্য নেই, সেখানে 'শ্লেষ'-কে আয়ত্ব করা কঠিনতর কাজ। বামন গদ্যকে বলেছেন 'দুর্ব্বন্ধ', কারণ ওকে গাঢ়বন্ধ করার বাঁধাধরা কোনও নিয়ম নেই; এবং পূর্ব্বাচার্য্যদের একটি বচন তুলেছেন, "গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি" (১৩৷২১), গদ্যরচনা হচ্ছে সাহিত্যিকদের ক্ষমতার কষ্টিপাথর। আর কোনও ক্ষমতার কষ্টিপাথর হোক্ না হোক্ রচনাকে গাঢ়বন্ধ করার ক্ষমতার যে কষ্টিপাথর তাতে সন্দেহ নেই। অথচ গাঢ়বন্ধত্বের প্রয়োজন পদ্যের চেয়ে গদ্যেই বেশী। কবিতার আর পাঁচটা উপকরণ আছে যা দিয়ে তার বন্ধগাঢ়তার ত্রুটি ঢাকা পড়ে। ওর ছন্দের সুর ও তাল, অনুপ্রাসের কৌশল, অলঙ্কারের দীপ্তি—এ-সব-ই কবিতার সহায়। এগুলির প্রসার পদ্যের তুলনায় গদ্যে অতি সামান্য। সেইজন্য গদ্যরচনার গাঢ়বন্ধত্বের অভাব আর কিছু দিয়ে পূরণ হওয়া কঠিন। নারীর দেহে রেখার সুষমা ও গড়নের বৈচিত্র্য আছে; নানা অলঙ্কারে তাকে অলঙ্কৃত করা চলে। দৃঢ়বন্ধত্বের অভাব হ'লে পুরুষের দেহ হ'য়ে পড়ে নিতান্ত কুশ্রী।

সংস্কৃতের গদ্যরচনা প্রায়ই হচ্ছে দীর্ঘসমাসবহুল। তাই লক্ষ্য ক'রেই দণ্ডী বলেছেন যে দীর্ঘসমাস হ'লো গদ্যের প্রাণ,—"গদ্যস্য জীবিতম্"।

যে দুখানি গদ্য-কাব্য সংস্কৃতে অতি প্রসিদ্ধ, এবং যা থেকে আলঙ্কারিকেরা নানা উদাহরণ তুলেছেন, সেই 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ দিয়েই লেখা। তবে বাণভট্ট হচ্ছেন প্রথম শ্রেণীর লেখক। তাঁর লেখার গুণে দীর্ঘসমাসের অনবরত ব্যবহারেও তার রচনা কোথাও শ্রুতিকটু নয়, কোথাও তার প্রসাদ-গুণ নষ্ট হয় নি। এবং সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির অশেষ মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বাণভট্ট আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

"আসীদশেষনরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ পাকশাসন ইবাপরঃ, চতুরুদধি-মালা মেখলয়া ভুবো ভর্ত্তা, প্রতাপানুরাগাবনতসমস্তসামন্তচক্রঃ—।"

দীর্ঘসমাসশূন্য যে গদ্য সংস্কৃতে চল্‌তি ছিল আলঙ্কারিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'চূর্ণক' বা 'চূর্ণ'। লম্বা সমাস না থাকায় বাক্যের অংশগুলি ছোট ছোট টুক্‌রোয় ভাঙ্গা বা চূর্ণ ব'লেই সম্ভব এর নাম 'চূর্ণক'। বামন এর যে উদাহরণ দিয়েছেন,—"অভ্যাসো হি কর্ম্মাণাং কৌশলমাবহতি। নহি সকৃন্নিপাতমাত্রেণোদবিন্দুরপি গ্রাবণি নিম্নতামাদধাতি।" (৬)—তা থেকেই বোঝা যায় এ গদ্য নিতান্তই কাজের কথার গদ্য, হিতোপদেশের ভাষা। কাব্যের গদ্য এ নয়। এবং লেখায় যাঁরা কিঞ্চিৎ মাত্রও সাহিত্য-রস আন্‌তে চেয়েছেন তাঁরাই ও গদ্য ত্যাগ ক'রে দীর্ঘসমাসের আশ্রয় নিয়েছেন। এর প্রধান কারণ দীর্ঘসমাসশূন্য অথচ গাঢ়বন্ধ এমন গদ্য সংস্কৃত ভাষায় গ'ড়ে ওঠে নাই। অর্থাৎ সংস্কৃত-গদ্যের গাঢ়বন্ধত্ব মাত্রেই গৌড়ী ওজঃ, বৈদর্ভী শ্লেষ ও ভাষার গদ্যে নেই। সংস্কৃত পদ্য-সাহিত্যের তুলনায় ওর গদ্য-সাহিত্য যে নিতান্ত হীনপ্রভ তার মূল এইখানে। যাকে বলা যায় 'সাহিত্যিক' গদ্য লম্বা সমাসবদ্ধ চেহারা ছাড়া তার অন্য কোনও রূপ ছিল না; এবং সে গদ্য একমাত্র কাব্যেই অতি কষ্টে চলে, তা-ও মহা-শক্তিশালী লেখকের হাতে। এর ফলে যে গদ্য-প্রবন্ধ কাব্য নয় তা লিখ্‌তে গিয়ে সংস্কৃত-লেখকেরা তার সাহিত্যিক গড়নের দিকে কিছুমাত্র নজর দেওয়া দরকার মনে করেন নি; কারণ যখন কাব্য নয় তখন অর্থ প্রকাশ হ'লেই হ'ল। টীকাকার ও ভাষ্য-লেখকেরাও যে লম্বা লম্বা সমাস দিয়ে লিখেছেন তার উদ্দেশ্য নয় রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা, এবং অতিদীর্ঘসমাস সত্ত্বেও তাঁদের লেখা মোটেই গাঢ়বন্ধ নয়;—তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যেমন ক'রে হোক্ খুব কম কথায় খুব বেশী কথা বলা। ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায়, যেমন শঙ্করাচার্য্যের লেখায় ;—

"যথাহি পশ্বাদয়ঃ শব্দাদিভিঃ শ্রোত্রাদীনাং সংবন্ধে সতি শব্দাদি বিজ্ঞানে প্রতিকূলে জাতে ততোনিবর্ত্তন্তে, অনুকূলে চ প্রবর্ত্তন্তে, যথা দণ্ডোদ্যতকরং পুরুষমভিমুখমুপলভ্য মাং

(৬) কাব্যালঙ্কার সূত্র ; ১৷৩৷২৪।

৩

হস্তময়মিচ্ছতীতি পলায়িতুমারভন্তে, হরিত-তৃণপূর্ণপাণিমুপলভ্য তং প্রত্যভিমুখীভবন্তীতি, এবং পুরুষা অপি ব্যুৎপন্নচিত্তাঃ ক্রূরদৃষ্টীনাক্রোশতঃ খড়্গোদ্যতকরান্ বলবত উপলভ্য ততোনিবর্ত্তন্তে তদ্বিপরীতান্ প্রতি অভিমুখী ভবন্তি। অতঃ সমানঃ পশ্চাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয় ব্যবহারঃ।"

এ লেখা দেখে বোঝা যায় যে সংস্কৃত গদ্যেও বৈদর্ভী শ্লেষ গ'ড়ে উঠ্‌তে পার্‌ত। কিন্তু এ রকম গদ্য শঙ্করাচার্য্যও খুব বেশী লেখেন নি; অন্য লেখকদের ত কথাই নেই।

(৭)

বাঙ্গলা ভাষায় সন্ধি নেই বল্‌লেই হয়, এবং সমাস যেটুকু চলে সংস্কৃতের তুলনায় তা কিছুই নয়। যে সমাস সংস্কৃতে মোটেই দীর্ঘসমাস নয়, এবং যা সে ভাষার চূর্ণকে বা শ্লেষে চমৎকার চলে, বাঙ্গলার ক্ষীণ শরীরে তা গুরুভার। সে রকম সমাস দিয়ে যদি বাঙ্গলা রচনাকে গাঢ়বন্ধ করা যায় তবে তা হয় ওজঃ, শ্লেষ নয়। এবং ওজঃ বাঙ্গলা ভাষার ধাতে মোটেই সহ্য হয় না। ঠিক এই জন্যই বৈদর্ভী রীতির লেখকেরা গদ্য রচনাকে দীর্ঘসমাস দিয়ে গাঢ়বন্ধ ক'র্‌লেও, কবিতায় ও প্রথা বর্জ্জন ক'রে-ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে কবিতার প্রকৃতির সঙ্গে ওজঃ খাপ্ খায় না।

দীর্ঘসমাসবদ্ধ রচনার মূল কথা হচ্ছে খুব বড় বড় টুক্‌রো দিয়ে বাক্যকে গাঁথা। কিন্তু বড়-ছোটর কোনও বাঁধা মাপকাঠি নেই। সংস্কৃতের আয়ত শরীরে যা ছোট, বাঙ্গলার স্বল্পদেহে তাই বড়। সেই জন্য কেবল লম্বাসমাসযুক্ত পদ নয়, খুব বড় মহাপ্রাণ পদ, অর্থাৎ গালভরা শব্দও বাঙ্গলা-বাক্যের বড় টুক্‌রো। এ রকম পদ বেশী দিয়ে লিখ্‌লে বাঙ্গলা রচনা ঠিক তা-ই হয়, দীর্ঘসমাসবহুল পদ দিয়ে সংস্কৃতে বাক্য-রচনা কর্‌লে যা হয়। দীর্ঘসমাসের চাপে সংস্কৃত গদ্য মাথা তুল্‌তে পারে নি; সমাস ও মহাপ্রাণ শব্দের ভারে বাঙ্গলা গদ্য একেবারে পিষে যায়।

গত একশ বছর ধ'রে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের 'ষ্টাইল' যে বদ্‌লে আস্‌ছে তার গতি হচ্ছে দীর্ঘসমাস ও দীর্ঘশব্দ, আলঙ্কারিকেরা যাকে বলেন 'উদ্ধত পদ',—তার গাঢ়বন্ধত্বের মায়া ছেড়ে, ছোট ছোট টুক্‌রো দিয়ে বাক্যকে গাঢ় ক'রে গ'ড়ে তোলার দিকে। অর্থাৎ গৌড়ী ওজঃ ছেড়ে বাঙ্গলা গদ্য বৈদর্ভী শ্লেষের পথ ধরেছে, যে পথ সংস্কৃত গদ্য কখনও খুঁজে পায় নি।

(৮)

ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজের পণ্ডিতমহাশয়েরা সাধু বোধে যে বাঙ্গলা গদ্য লিখেছেন তা সংস্কৃত গদ্য-কাব্যের গড়নের দিকে চেয়ে, এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের বাক্য স্মরণ ক'রে যে ওজঃ বা সমাসবাহুল্যই হচ্ছে গদ্যের প্রাণ।

"ভাবনার এ বড় অদ্ভুত শক্তি যে অসিদ্ধ বস্তুও সিদ্ধবৎ প্রতীত হয়; অতএব শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থসকল যে ভাবনাতে সিদ্ধ হবে তাহা কি কহিব? আজ অবধি এইরূপ ভাবনা শাস্ত্রেতে কর, তবে তোমার ঝটিতি শাস্ত্রার্থ সাক্ষাৎকার হবে। —এইরূপে ধনুর্বিদ্যাজিজ্ঞাসুর হস্তজড়তা দূরীকরণ পুরঃসর শীঘ্রহস্ততা সম্পাদনার্থ কর্ণপর্য্যন্ত করাকর্ষণ-ভ্যাসপ্রায় মহিষীভাবনাভ্যাসবশতঃ অনবস্থিতচিত্ততা নিরাকরণ পূর্ব্বক অনন্যমনতা সম্পাদন করাইয়া শিষ্যকে শাস্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন।"

এ সমাস বাঙ্গালা গদ্যের প্রাণ না ফাঁসি ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার সে কথা ভাবা দরকার মনে করেন নি। সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ যে এ রচনার কাছেও আসেনি, এবং আস্‌তে পারে না, সে দিকেও দৃষ্টি দেন নি। দীর্ঘসমাসে সংস্কৃত গদ্য গাঢ়বন্ধ হয়, সুতরাং দীর্ঘসমাস দিয়ে বাঙ্গলা গদ্য লিখে গেছেন। কিন্তু বাঙ্গলা গদ্যের প্রাণ যে কোথায় তার খোঁজ ও-লেখাটার প্রথম দিকে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় নিজেই দিয়েছেন, কারণ সেটা গুরুর মুখের কথা, লেখকের হাতের লেখা নয়।

সংস্কৃত গদ্যের যথার্থ অনুরূপ বাঙ্গলা গদ্য বাঙ্গলা সাহিত্যে আনেন বিদ্যাসাগর। যে মাত্রাজ্ঞান মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বিন্দুমাত্র ছিল না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তা ছিল পূরোমাত্রায়। বিদ্যাসাগর জান্‌তেন যে সংস্কৃত গদ্যের দীর্ঘসমাস বাঙ্গলা গদ্যে আন্‌লে সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ বাঙ্গলা গদ্যে আসে না, সে হ'য়ে পড়ে কিম্ভূত কিম্বাকার একটা গড়নশূন্য জিনিষ। সংস্কৃত গদ্যের ওজঃ বাঙ্গলায় আস্‌তে পারে সংস্কৃতের তুলনায় অনেক ছোট ও অনুদ্ধত পদের সুকৌশল প্রয়োগে।

"রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লব শোভার আবির্ভাব; বাহু-যুগল কোমল বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে; আর নব যৌবন বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।"

এ গদ্য মধুর, মসৃণ এবং অনেকটা গাঢ়বন্ধ। কিন্তু এ হচ্ছে রাজ-সভার ভাষা,—প্রসন্ন-গম্ভীর, কিন্তু প্রাণের লীলা-বৈচিত্র্য এর মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায় না। সভা থেকে বের ক'রে মুক্ত আকাশের তলে খোলা মাটির উপর একে দাঁড় করান যায় না।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ হতেই বঙ্কিমচন্দ্র যে বাঙ্গালীর মন লুঠ ক'রে নিলেন সে তাঁর বাঙ্গলা গদ্যের 'ষ্টাইলের' গুণে নয়, তাঁর প্রতিভার নূতন সৃষ্টির ক্ষমতায়, নূতন রসের উদ্ভাবনে।

"নগেন্দ্রসঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অবশ্য তৎপরিদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চন বর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ; অলকস্পর্শীভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণ-তারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতি বিশিষ্ট।"

এ গদ্য বিদ্যাসাগরের গদ্যের চেয়ে মধুরও নয়, মসৃণও নয়, গাঢ়বন্ধও নয়। এবং সংস্কৃতের অনুকরণে লম্বা সমাসগুলি বাঙ্গলা গদ্যের ভার-কেন্দ্রকে ছাড়িয়ে গেছে। ওর সমাসবদ্ধ পদের দীর্ঘ, স্ফীত দেহের মন্দগতি সূর্য্যমুখীর চোখের সমস্ত রূপটা পাঠকের চোখের সাম্‌নে একসঙ্গে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে না। যদি সংস্কৃতে লেখা যেতো, 'অলকস্পর্শীভ্রূযুগসমাশ্রিতং কমনীয়বঙ্কিম পল্লবরেখামধ্যস্থং স্থূলকৃষ্ণতারা-সনাথম্'—তবে হ্রস্বদীর্ঘ ও গুরুলঘুর যথাযথ উচ্চারণে, এবং অনুস্বারের মৃদঙ্গধ্বনিতে ওর মধ্যে যে সংহতি ও গাম্ভীর্য্য আস্‌তো বাঙ্গালায় তা সম্ভব নয়। বাঙ্গলা গদ্যে দীর্ঘ, স্ফীত সমাসের প্রাণ থাকে না, সুধু ভারটা অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে সংস্কৃত গদ্যের নকল ছেড়ে সমাসহীন ও অনুদ্ধত পদ দিয়ে বাঙ্গলা লিখেছেন, তখন তাঁর গদ্যের রূপ হ'য়েছে সম্পূর্ণ আলাদা।

"সে রাত্রি প্রভাত না হইতেই ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিল। লেখাপড়া গোবিন্দলাল শিখাইয়াছিলেন, কিন্তু ভ্রমর লেখাপড়ায় তত মজবুত হইয়া উঠে নাই; ফুলটি পুতুলটি পাখীটি স্বামীটীতে ভ্রমরের মন; লেখাপড়া বা গৃহকর্ম্মে তত নহে। কাগজ লইয়া লিখিতে বসিলে, একবার মুছিত, একবার কাটিত, একবার কাগজ বদ্‌লাইয়া আবার মুছিত, আবার কাটিত। শেষ ফেলিয়া রাখিত। দুই তিন দিনে একখানা পত্র শেষ হইত না, কিন্তু আজ সে সকল কিছু হইল না। তেড়া বাঁকা ছাঁদে যাহা লেখনীর অগ্রে বাহির হইল, আজ তাহাই ভ্রমরের মঞ্জুর।"

সূর্য্যমুখীর রূপবর্ণনার চেয়ে ভ্রমরের এ পত্র লেখার বর্ণনা অনেক বেশী মসৃণ ও গাঢ়বন্ধ। তার কারণ এর গাঢ়তা সমাস কি বড় বড় শব্দের চাপে নয়, ছোট ছোট কথার শব্দ-সামঞ্জস্যে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য এখানে ওজঃ ছেড়ে শ্লেষকে আশ্রয় করেছে। 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' যুগেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল যে রস যেখানে

হাল্‌কা, কি গভীর কথাও একটু কৌতুকের ছাঁদে বল্‌তে হবে সেখানেই এ গদ্যের স্থান। 'গভীর কথা, গভীর সুরে শুনিয়ে দিতে' হ'লে ওজঃকেই আশ্রয় কর্‌তে হয়। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র যে এ মত বদ্‌লেছিলেন তা সকলেই জানেন।

(৯)

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী বাঙ্গালার গদ্য-রচনায় 'সাধু বনাম চল্‌তি ভাষার' যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সে যুদ্ধে কোনও পক্ষের হার হয় নি, কারণ যুদ্ধটা তর্কযুদ্ধ এবং হার কেউ স্বীকার করেনি। কিন্তু যুদ্ধের পর শান্তির মজ্‌লিসে প্রমথ বাবু সম্পূর্ণ জিতেছেন। বাঙ্গলা গদ্যের চেহারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বদল হয়েছে। প্রমথ বাবুর রচনা-রীতি যে-লেখকেরা ষোল-আনা মানেন নি, তাঁরাও বার-আনা গ্রাহ্য ক'রেছেন। এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই রীতিকে তাঁর বাঙ্গলা গদ্যের বাহন ক'রে এর শক্তি ও বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী পাঠককে নিত্য বিস্মিত কর্‌ছেন।

প্রমথ বাবুর গদ্য-রীতির একটা প্রধান কথা হচ্ছে বাঙ্গলা গদ্যকে সম্পূর্ণ বৈদর্ভী শ্লেষ দিয়ে গাঢ়বন্ধ করা, গৌড়ী ওজঃ-এর সঙ্গে কোনও আপোষ না রেখে। সমস্ত রকম দীর্ঘ-সমাস ও শব্দাড়ম্বর বর্জ্জন ক'র্‌তে হবে, অথচ রচনা হবে যেমন আঁট-সাঁট, তেমনি মসৃণ। সকলেই জানেন বাঙ্গলার ক্রিয়াপদ নিয়ে লড়াই-টাই ছিল ও যুদ্ধের একটা প্রধান পর্ব্ব। এর কারণ খুব স্পষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় থেকে বাঙ্গলার সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির যে রূপ চ'লে আস্‌ছিল তা যেমন লতানো, তেমনি শিথিল। 'হইয়া', 'করিয়া', 'যাইয়া' 'হইতেছিল', 'করিতেছিলাম', 'যাইতেছিলেন'—এ-সব ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে আন্‌লে তাকে গাঢ়বন্ধ করা হয় একরকম অসম্ভব কাজ। সুতরাং বাঙ্গলা গদ্য হ'য়ে পড়ে নিতান্ত শিথিল। এই শিথিলতা থেকে মুক্তির জন্য লেখকেরা অনেক সময় ক্রিয়াপদ প্রায় বর্জ্জন ক'রে বাক্যের পর বাক্য লিখে চল্‌তেন, কিন্তু তাতে প্রায়-ই আন্‌তে হ'তো দীর্ঘ-সমাস। অর্থাৎ ক্রিয়াপদগুলির ঠিক ও-রূপ বজায় রেখে বাঙ্গলা গদ্যে শ্লেষ আনা যায় না, এবং শ্লেষ ছিল প্রমথ বাবুর লক্ষ্য। সুতরাং তিনি কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের কথার অনুরূপে ক্রিয়াপদগুলিকে কেটে ছোট কর্‌লেন। বাঙ্গলার ক্রিয়াপদগুলি ওর দুর্ব্বলতার জায়গা। এই উপায়ে সে দুর্ব্বলতা প্রমথবাবু অনেকটা দূর করেছেন, কিন্তু ও-দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ ঘুচবার নয়। ক্রিয়াপদগুলি ছোট হ'য়ে গাঢ়বন্ধত্বের সহায় হ'য়েছে, কিন্তু স্বল্প-ক্ষম লেখকের হাতে প'ড়লেই

মস্থণত্বের পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে। এ দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণ গোপন ক'রে, বাঙ্গলা গদ্যকে বৈদর্ভী শ্লেষের পূর্ণ গড়ন দিতে পারে, শুধু প্রমথবাবুর মত যাঁরা ওস্তাদ আর্টিষ্ট।

প্রমথবাবুর গদ্য বাঙ্গলা গদ্যে বৈদর্ভী শ্লেষের শ্রেষ্ঠ নমুনা। ওর মেদশূন্য শরীর যেমন দৃঢ়সংনদ্ধ, ওর গতি তেমনি অবাধ ও জড়তাহীন।

"যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেন নি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভিভাষণ এতই জলের মত হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণ গন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।" ('নানা-কথা'। সাহিত্য-সম্মিলন।)

এটা প্রমথবাবুর লেখার অত্যন্ত একটা সাধারণ নমুনা। এই লেখাকেই যদি অনতিপূর্ব্ববর্ত্তি যুগের যে কোনও বাঙ্গলা গদ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় তবে এর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝ্‌তে মুহূর্ত্ত লাগে না।

বাঙ্গলা গদ্যে যে প্রমথ বাবুর রীতি ভাষাকে কত বেশী জোরালো ও ধারালো করে তা রবীন্দ্রনাথের সম-শ্রেণীর একটি পুরনো লেখা ও একটি আধুনিক লেখা পর পর পড়্‌লেই বোঝা যায়।

"এ কন্‌ফারেন্স্ দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্য সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী! আমরা ইংরাজি শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি—আপামর-সাধারণকে আমাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা দুর্ভেদ্য পার্থক্য তৈরী করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমস্ত আলাপ-আলোচনার বাহিরে খাড়া করিয়া রাখিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের হৃদয় হরণের জন্য ছল-বল-কৌশল-সাজসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্যও যে বহুতর সাধনার আবশ্যক, এ কথা আমরা মনেও করি নাই।" ('স্বদেশী সমাজ'।)

"যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে থাকি তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত তখন, দেশের যারা মাটির মানুষ তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাস্‌চে, আর মাথার

উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বল্‌চে, "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান আর দেশের সর্ব্ব-সাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েছে, অভিমানিনী যেমন করে বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বল্‌চে "কালো মেঘ আর হেরব না গো দূতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চল্‌ছে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে কিন্তু লীলা বদল হয় নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম 'চাই' আজ তেমনি জোরেই বলচি 'চাইনে'।

('রায়তের কথা'র ভূমিকা।)

প্রমথ বাবুর গদ্য-রীতির একটা বিশেষ গুণ এই যে ওর ক্রিয়াপদ ও অব্যয় প্রভৃতি অন্যান্য কলকব্জাগুলো হাল্কা হওয়াতে সংস্কৃত ভাষার অনেক বিচিত্র সুরের ও বিচিত্র বর্ণের বিশেষ্য-বিশেষণ এ ভাষা অনায়াসে নিজের শরীরে বহন কর্‌তে পারে, ভারে নুয়ে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের শেষের লেখাটি তার প্রমাণ। নৌকা চল্‌ছে ইলেক্‌ট্রিক মোটরে, মাঝি মাল্লা, রসা রশির ভার কম; ওতে মাল ভর্ত্তি করা যায় অনেক।

প্রমথ বাবুর লেখা থেকেই একটা নমুনা তোলা যাক্।

"সে দেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদন-সখা বসন্ত যে ভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোন এক সুপ্রভাতে, ঘুম ভেঙ্গে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল পরে দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে—অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমন বার্ত্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট, এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন,—পশু-পক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।"

('বীরবলের হালখাতা'; ফাল্গুন।)

'সাধু'-গদ্যে এ কথা লিখ্‌তে গেলে অবিচ্ছিন্ন বড় বড় কথার চাপে ভাষায় এমন জড়ত্ব এসে যেতো যে বিলিতী ঋতুরঙ্গের বসন্ত-লীলাটি তার মধ্যে কিছুতেই ফুটিয়ে তোলা যেতো না।

একখানি 'বীরবলের হালখাতা' ও একখানি 'নানা-কথা' হাতের কাছে রয়েছে। যেখানেই খুলছি ইচ্ছা হয় এই গাঢ়বন্ধ বৈদর্ভী গদ্যের নমুনা তুলি। কিন্তু পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, সে লোভ দমন কর্‌তে হ'লো। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' থেকে একটা জায়গা তুলেই শেষ কর্‌বো। বঙ্কিমচন্দ্রের সন্দেহ ছিল 'সাধু'-গদ্য ছাড়া অন্য গদ্য বাঙ্গলায় কাব্যের ভাষা হ'তে পারে কি না। রবীন্দ্রনাথের মুখে তার উত্তর শোনা যাক্।

"এখানকার পাহাড় পর্ব্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোন রাগিনীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, শম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিষ ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না।...........

তাই ও যখন ভাব্‌চে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুসি, এমন সময়ে আষাঢ় এলো পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েচে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরি-নির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূল ছাড়া কর্‌বে। স্থির কর্‌লে, এই সময়টাতে কিছু দিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাক বাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুল্‌বে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।"

টিপ্পনী ক'রে এর মোহ নষ্ট কর্‌বো না।

শ্লেষের কথা শেষ হ'লো। পাঠকদের মন জানার উপায় নেই। সম্পাদক-সঙ্ঘ যদি অভয় দেন রীতি-বিচারের বাকী কথা ক্রমশঃ বলা যাবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ

এদেশে যাহাকে আমরা 'অদ্বৈতবাদ' বলি, পাশ্চাত্যদর্শনে তাহার নাম Idealism। অধ্যাপক ডয়সন Idealism-এর এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন :—

The Atman is the sole reality; with the knowledge of it, all is known; there is no plurality and no change. Nature, which presents the appearance of plurality and change, is an illusion.

অর্থাৎ আত্মা বা ব্রহ্মই পরমার্থ-সত্য—উপনিষদের ভাষায়, তিনিই 'সত্যস্য সত্যম্'। তাঁহাকে বিদিত হইলে সমস্তই বিদিত হয়—আত্মনি খলু অরে বিদিতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্। কারণ, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—নানা, বিবিধ, বিচিত্র, দ্বৈত বলিয়া কোন কিছু নাই। এই যে বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা প্রতীতি, মায়া মাত্র। কারণ, সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। তিনিই পূর্ব্বে, তিনিই পশ্চিমে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই ঊর্দ্ধে, তিনিই অধে—এই বিশ্ব তিনি বই নহে।

ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং, পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম, পশ্চাদ্ ব্রহ্ম, দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ, অধশ্চোর্দ্ধং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্—মুণ্ডক, ২।২।১১

অর্থাৎ (দার্শনিকের ভাষায়)

"God alone and nothing besides Him is real. The universe as regards its extension in space and bodily consistence is in truth not real; it is mere illusion, as used to be said, mere appearance as we say to-day."

আর জীব?—যাহাকে পাশ্চাত্য দর্শনকার Individual soul বলেন। 'The Individual soul like the external world has no reality'—যেমন জগৎ, তেমনই জীব—জীবেরও কোন বাস্তব সত্তা নাই—জীবও সত্য নহে, বস্তু নহে,—প্রতিভাস মাত্র।

'The Individual soul is an apparition, as the external world is an appearance. It is all Avidya—illusion.'

ব্রহ্মসূত্রের ভাষায়, মায়ামাত্রংতু কার্ৎস্নেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ। ফলতঃ দার্শনিক বিচারের বিষয়ীভূত এই যে তত্ত্বত্রয়—ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব—অদ্বৈত মতে এ ত্রিতয়ের (triad-এর) মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ—অপর দুইটি—অর্থাৎ জগৎ ও জীব, অবিদ্যার বিজৃম্ভণ—অসৎ। এবং এই জীবাত্মা তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন—জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ। সেই জন্য চারি বেদের চারি মহাবাক্য বা চরম উপদেশই এই—সোঽহং, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ও অহং ব্রহ্মাস্মি।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্ ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ —কৈবল্য, ১৭

পুনশ্চ এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম, তিনি অজ্ঞেয়—তিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। সেই জন্য তিনি (তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষায়) 'অদৃশ্য অনাত্ম্য অনিরুক্ত অনিলয়ন'—Unseeable, Unutterable, Unfathomable, Unrealisable। অতএব তাঁহার একমাত্র লক্ষণ বা নির্দ্দেশন 'নেতি, নেতি'—যেহেতু, তিনি সমস্ত ধর্ম্ম ও গুণ (attributes ও qualities) হইতে বিভিন্ন—অন্যত্রধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—অতএব স এষ নেতি নেতি আত্মা।

অধিকন্তু, এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ—'He is the knowing Subject within us'—তিনিই একমাত্র বিষয়ী—একমাত্র দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা,—নান্যৎ অতোস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোস্তি শ্রোতৃ। এই দ্রষ্টা কিন্তু কখনও দৃশ্য হন না, হইতে পারেন না—এই বিষয়ী (subject) কিন্তু কখনও বিষয় (object) হন না, হইতে পারেন না। 'The knowing subject is itself unknown'—ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ। সেই জন্য তিনি—অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ—তিনি দ্রষ্টা কিন্তু দ্রষ্টব্য নন, শ্রোতা কিন্তু শ্রোতব্য নন, মন্তা কিন্তু মন্তব্য নন, জ্ঞাতা কিন্তু জ্ঞাতব্য নন।

অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র

উপরে আমরা উপনিষদুক্ত অদ্বৈতবাদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে তিনটি সূত্র বিস্পষ্ট হইল ঃ—

(ক) ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র বস্তু—তিনিই পরমার্থ-সত্তা (Sole Reality)—জীব ও জগৎ প্রতিভাস, ছায়া বা মায়া মাত্র—Apparition, Appearance, Illusion ভিন্ন অন্য কিছু নহে ;

(খ) জীব ও ব্রহ্ম—জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন—সোঽহং, তত্ত্বমসি ;

(গ) আত্মাই বিষয়ী (Knowing Subject within us) কিন্তু তিনি অবিষয়—object—নহেন—তিনি জ্ঞাতা কিন্তু কখনও জ্ঞেয় হন না। তাঁহার পরিচয়—নেতি নেতি মাত্র।

যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক-উপনিষদের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে এই সকল সূত্র কিরূপ অকুণ্ঠ ও অমোঘভাবে বিবৃত ও বিস্তৃত করিয়া অদ্বৈতবাদের স্থাপনা করিয়াছেন, অতঃপর আমরা তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব কালে সমস্ত দার্শনিক চিন্তার লক্ষ্য— ঐক্য-সাধন, —খণ্ডের মধ্যে অখণ্ড, বিভক্তের মধ্যে সমগ্র, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি, বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য, বিশিষ্টের মধ্যে সামান্য,—এক কথায়, বহুর মধ্যে একের প্রতিষ্ঠা।*

পাশ্চাত্য দেশে ইহার সংজ্ঞা 'Monism'। Monism বলিলে কি বুঝায় ?

'It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and inter-dependence of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.'

অর্থাৎ দৈশিক দূরান্তিকত্ব, কালিক পূর্ব্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্য্য-কারণত্ব এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটী'-রূপী নানাত্ব পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদ্বিতীয় অদ্বয় বস্তুই সৎ।

ঐ অদ্বয়-তত্ত্ব বা Principle of Unity-কে প্রাচীন গ্রীকেরা বলিতেন Ens। প্রাচীন ভারতে ইহার নাম ছিল 'পুরুষ'।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।১

জগতের এই অজস্র বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এক 'পুরুষ' Cosmic Principle রূপে অধিষ্ঠিত। বিশ্বের মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা—

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্—ঋগ্বেদ, ১০।৯০।২

তিনি অখণ্ড (পরিচ্ছেদহীন)—সেই জন্য ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে তাঁহাকে 'অদিতি' বলা হইয়াছে ঃ

অদিতির্দ্যৌ রদিতিঃ অন্তরিক্ষং
অদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চ জনাঃ
অদিতির্জাতম্ অদিতির্জনিত্বম্ ॥—ঋগ্বেদ, ১।৮৯।১০

সেই এক (অদ্বিতীয়)—যিনি ব্যতিরিক্ত অপর কিছু নাই—সেই অ-দিতি

আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ হান্যৎ ন পরঃ কিঞ্চনাস—ঋগ্বেদ, ১০।১২৯।২

—ব্যাপকভাবে ইনিই 'ব্রহ্ম'—ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্।

---

* And universal Nature, thro' her vast
And crowded whole, an infinite paroquet,
Repeats One Note.—Emerson.

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ
স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদং সর্ব্বম্—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

'তিনিই অধে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে—এ সমস্তই তিনি।' যাজ্ঞবল্ক্য ইহার উপর এক গ্রাম চড়াইয়া বলিলেন—নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥—বৃহ, ৪।৪।১৯

'মনের দ্বারা ইহাই দৃষ্টি করা চাই—এখানে 'নানা' (বহু) কোন কিছু নাই। যে এখানে মোহবশে 'নানা' দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা বিধা

যত্র হি দ্বৈতম্ ইব ভবতি, তদ্ ইতর ইতরং জিঘ্রতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরম্ অভিবদতি তদিতর ইতরং মনুতে তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎতৎ কেন কং জিঘ্রেত্তৎ কেন কং পশ্যেত্তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ কেন কং অভিবদেত্তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ২।৪।১৪, ৪।৫।১৫

'যেখানে দ্বৈত, দ্বিতীয় যেন থাকে, সেখানেই একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যখন সমুদায়ই আত্মা হইয়া গেল, তখন কাহাকে কিরূপে আঘ্রাণ করিবে? কাহাকে কিরূপে দর্শন করিবে? কাহাকে কিরূপে শ্রবণ করিবে? কাহাকে কিরূপে বচন করিবে? কাহাকে কিরূপে মনন করিবে? কাহাকে কিরূপে বিজ্ঞান করিবে?'

যাজ্ঞবল্ক্য অন্যত্র ইহার অন্বয় করিয়া বলিতেছেন—

যত্র বা অন্যদ্ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যেখানে অন্য কিছু যেন থাকে, সেখানেই একে অপরকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, বচন করে, শ্রবণ করে, মনন করে, স্পর্শন করে, বিজ্ঞান করে।' এখানে ঐ 'ইব' শব্দ লক্ষ্য করিবার বিষয়—অর্থাৎ জগৎ যেন আছে, নানা যেন আছে, দ্বিতীয় যেন আছে, দ্বৈত যেন আছে; বস্তুতঃ নাই—তাহার ভাণ হয় মাত্র। আছেন কেবল তিনি—তিনিই পরমার্থ-সৎ

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তিনিই একমাত্র সৎ—তিনি শুধু এক নহেন, তিনি অ-দ্বিতীয়—কেবল 'Unity' নহেন, 'Uniquity'।

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা—বৃহ ২।৪।৬, ৪।৫।৭

'এ সমস্তই সেই পরমাত্মা।' তিনি ভিন্ন দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই।

নান্যঃ অতোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যঃ অতোঽস্তি শ্রোতা,
নান্যঃ অতোঽস্তি মন্তা, নান্যঃ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতা—বৃহ, ৩।৭।২৩
নান্যৎ অতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি শ্রোতৃ,
নান্যৎ অতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যৎ অতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

কারণ, এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ—ইহা তাঁহার নিশ্বাস মাত্র—'The Universe is drawn out of Him'—যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—

এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ * * অস্যৈব এতানি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

সেই জন্য বৃহদারণ্যক অন্যত্র বলিয়াছেন :—

অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—২।১।২০

তদ্ যথা রথনাভৌ চ রথনেমৌ চ অরাঃ সর্ব্বে সমর্পিতাঃ
এবমেব অস্মিন্ আত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি সর্ব্বে দেবাঃ
সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্ব এতে আত্মনঃ সমর্পিতাঃ—২।৫।১৫

অর্থাৎ সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত, সমস্ত দেব, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত আত্মা সেই পরমাত্মায় সমর্পিত। অতএব যাজ্ঞবল্ক্যের সিদ্ধান্ত এই—যেষাং নঃ অয়মাত্মা অয়ং লোকঃ—বৃহ, ৪।৪।২২—(Whose Soul this Universe is)—এই বিশ্ব তাঁহার বহিঃপ্রকাশ মাত্র—বৈষ্ণব কবির ভাষায় 'হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'। বলা বাহুল্য—ইহা নিপট Idealism (অদ্বৈতবাদ),—ভূমা-বাদ বা Pantheism নহে। যেহেতু, (পাশ্চাত্য-দর্শনের ভাষায়)।—

Idealism regards everything besides the Atman as unreal, whereas Pantheism identifies the universe with the Atman.

কারণ, যাজ্ঞবল্ক্যের দৃষ্টিতে এই বিবিধ বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার মাত্র—তাঁহারই modes of manifestation।

ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা
ইমানি ভূতানি ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা—বৃহ, ২।৪।৬

'এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত, এই সমস্ত জগৎ সেই আত্মা।'

স যথা দুন্দুভে র্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।—স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায় বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ। —বৃহ, ২।৪।৭-৯

'যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও এইরূপ।' অর্থাৎ ব্রহ্মই Sole Reality—সত্যস্য সত্যম্ * এবং এই বিবিধ বিশ্ব যখন পরমাত্মারই বিভাব (mode), তখন তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত জানা হয়। তাই যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন:—

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্ব্বং বিদিতম্—বৃহ, ২।৪।৫

'আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, ধ্যান করিবে। কারণ, আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন বিজ্ঞান দ্বারা ইদং সর্ব্বং—এ সমস্তই বিদিত হয়।'

ইহার প্রতিধ্বনি আমরা ছান্দোগ্য-উপনিষদে শুনিতে পাই। সেখানে দেখি, শ্বেতকেতু, ঋষি-পিতা অরুণিকে প্রশ্ন করিতেছেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ ইতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি?

—'হে ভগবান্ সেই আঁদেশ (রহস্য-উপদেশ) কি, যদ্দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়?' অরুণি দৃষ্টান্ত (analogy) প্রয়োগ করিয়া উত্তর দিলেন:—

যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্। যথা সোম্য একেন নখনিকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্ এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।—ছা, ৬।১।৪-৬

'হে সোম্য! যেমন একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম

* বৃহ, ২।১।২০

মাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্বর্ণকে জানিলে সমস্ত স্বর্ণময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা স্বর্ণেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্বর্ণ ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড লৌহকে জানিলে সমস্ত লৌহময় বস্তু জানা যায়, কারণ, তাহারা লৌহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লৌহই সত্য; হে সোম্য! এ আদেশও সেইরূপ।' অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত মাত্র। ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র।*

'বাচারম্ভণং বিকারঃ'—ইহা সেই প্রাচীন উপদেশ—একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋগ্বেদ, ১।১২৪।৪৬)

'যিনি সৎ, তিনি এক—তাঁহার দ্বৈত নাই—কারণ, দ্বৈত 'বাচারম্ভণ' মাত্র—mere matter of words।

জীব-ব্রহ্ম—তত্ত্বমসি

জগতের মধ্যে যেমন Cosmic Principle (অধিভূত তত্ত্ব) ব্রহ্ম, জীবের মধ্যে সেইরূপ Psychic Principle (অধ্যাত্ম তত্ত্ব) আত্মা। জীব বিচিত্র ও বহু—ব্যাপারে বৃত্তিতে ভোগে লক্ষ্যে শক্তিতে সম্ভাবনায় ভিন্ন ভিন্ন; কিন্তু অন্তরতম নিগূঢ়তম আধ্যাত্মিকতায় এক ও অভিন্ন। অধিকন্তু আত্মা-ব্রহ্ম—'Brahman is the knowing subject in us'। যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায়—এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ —'সেই অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম, যিনি অন্তর্য্যামী—তিনিই তোমার আত্মা।' অন্তর্যামী তিনি—যিনি অন্তরে যমন করেন, যিনি নিগূঢ়ভাবে অন্তরতম ভাবে জগৎকে ও জীবকে প্রেরণা করেন। (অধ্যাপক বার্গসঁ Creative Evolution এর পশ্চাতে যে 'Elan Vital'-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন—যাহা 'has carried life by more and more complex forms to higher and higher destinies * * which feels and strives and achieves'—তাহা এই অন্তর্য্যামী অমৃতেরই প্রতিধ্বনি।) তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে আমরা 'এষ তে আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ'—এই formula ('আদেশ') যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে—একবার নয়, দুইবার নয়—একুশ বার শুনিতে পাই। তাহার কয়েকটি বচন নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

* অভিজ্ঞ পাঠকের এই প্রসঙ্গে চৈনিক আচার্য্য কনফুসিয়ের শিক্ষা স্মরণে আসিবে।

The system of cosmology, as taught by Confucius starts out with an impersonal cosmic energy and principle, which produced the *yin* and the *yang*, the negative and the positive principles. These, by their interaction, produced Heaven and Earth and all beings.—Encyclopedia Britannica.

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥

যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্য আপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥

য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ ॥

যং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতাণি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যামামৃতঃ। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যঃ প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যামামৃতঃ। যো মনসি তিষ্ঠন্ মনসোঽন্তরো যং মনো ন বেদ যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরো যময়ত্যেষ তে আত্মান্তর্যামামৃতঃ ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া পৃথিবীর অন্তর, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি অগ্নিতে থাকিয়া অগ্নির অন্তর, অগ্নি যাঁহাকে জানে না, অগ্নি যাঁহার শরীর, যিনি অগ্নিকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি বায়ুতে থাকিয়া বায়ুর অন্তর, বায়ু যাঁহাকে জানে না, বায়ু যাঁহার শরীর, যিনি বায়ুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা, অমৃত অন্তর্যামী।

যিনি আদিত্যে থাকিয়া আদিত্যের অন্তর, আদিত্য যাঁহাকে জানে না, আদিত্য যাঁহার শরীর, যিনি আদিত্যকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি সর্ব্বভূতে থাকিয়া সর্ব্বভূতের অন্তর, সর্ব্বভূত যাঁহাকে জানে না, সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর, যিনি সর্ব্বভূতকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি প্রাণে থাকিয়া প্রাণের অন্তর, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণ যাঁহার শরীর, যিনি প্রাণকে অন্তরে যমন করেন, সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্য্যামী।

যিনি চক্ষুতে থাকিয়া চক্ষুর অন্তর, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।

যিনি মনে থাকিয়া মনের অন্তর, মন যাঁহাকে জানে না, মন যাঁহার শরীর,—যিনি মনকে অন্তরে যমন করেন—সেই তোমার আত্মা অমৃত অন্তর্যামী।' অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপার, সমস্ত জৈবিক ব্যাপার, সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারের পশ্চাতে অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্মবস্তু বিদ্যমান,—তাঁহারই প্রাণনে তাহারা ক্রিয়াবান্, তাঁহারই সংযমনে তাহারা ব্যাপারবান্।

আত্মা সর্ব্বান্তর ও সর্ব্বানুভূ

কেবল তাহাই নহে—ঐ আত্মা সর্ব্বান্তর—

এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ —বৃহ, ৩।৪।১-২

তিনি সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত, সর্ব্বব্যাপী—all-pervading। সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

তস্য প্রাচী দিক্ প্রাঞ্চঃ প্রাণাঃ, দক্ষিণা দিক্ দক্ষিণে প্রাণাঃ, প্রতীচী দিক্ প্রত্যঞ্চঃ প্রাণাঃ, উদীচী দিক্ উদঞ্চঃ প্রাণাঃ, ঊর্দ্ধা দিক্ ঊর্দ্ধাঃ প্রাণাঃ, অবাচী দিক্ অবাঞ্চঃ প্রাণাঃ, সর্ব্বা দিশঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ —বৃহ, ৪।২।৪।

'পূর্ব্বদিক্ তাঁহার পূর্ব্ব প্রাণ, দক্ষিণদিক্ দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমদিক্ পশ্চিম প্রাণ, উত্তরদিক্ উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিক্ ঊর্দ্ধ প্রাণ, অধোদিক্ অধঃ প্রাণ, সর্ব্বদিক্ সর্ব্ব প্রাণ।' এই 'Eternal Omnipresent' আত্মার সন্ধান পাইয়া কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থ একদিন অমর ভাষায় বলিয়াছিলেন :—

I have felt
A presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts: a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and the mind of man,
A motion and a spirit that impels
All thinking things, all objects of thought
And rolls through all things.

সেই উপনিষদের প্রাচীন কথা :—

যো দেবঃ অগ্নৌ য অপ্সু
যঃ অখিলং ভুবনম্ আবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

'সেই দেবতাকে নমস্কার—যে দেব অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি অখিল ভুবনের অন্তস্তলে, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে—তাঁহাকে নমঃ নমঃ।'

এই পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রশ্নকারিণী গার্গীকে বলিতেছেন—

যদ্ ঊর্দ্ধং গার্গি! দিবো, যদ্ অবাক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা দ্যাবা পৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবৎ চ ভবিষ্যৎ চ ইত্যাচক্ষতে আকাশে তৎ ওতং চ প্রোতং চ—৩।৮।৪

'যাহা দ্যুলোকেরও ঊর্দ্ধে, পৃথিবীর অধে, যাহা দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরে, যাহা একাধারে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান (অর্থাৎ Eternal Now)—সেই আকাশে সমুদায় ওত ও প্রোত।' (বলা বাহুল্য এখানে আকাশ ব্রহ্মেরই নামান্তর—আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২২)

যাজ্ঞবল্ক্য ইহার সঙ্কলন করিয়া অন্যত্র বলিয়াছেন :—

যদৈতমনুপশ্যতি আত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে ॥

যস্মাদ্ অর্বাক্ সংবৎসরো অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেঽমৃতম্

—বৃহ, ৪।৪।১৫-১৬

'যখন ভূত ভবিষ্যতের ঈশান পরমাত্ম-দেবের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তখন মানব ভয়ের অতীত হয়। যাঁহার পশ্চাতে সংবৎসর (অর্থাৎ কাল Time) দিবসের সহিত আবর্ত্তিত হইতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ আয়ুঃস্বরূপ অমৃতরূপ দেবতাকে দেবগণও উপাসনা করেন।'

এই 'আকাশ'—যাহাতে সমুদায় ওতপ্রোত রহিয়াছে, (যাজ্ঞবল্ক্য বলেন) ব্রহ্মজ্ঞেরা ইহার সংজ্ঞা দিয়াছেন—'অক্ষর'। অক্ষরের অর্থ Immutable। এতদ্বৈ তদ্ অক্ষরম্ গার্গি ! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি।

এই অক্ষরের ঈশিত্ব ও বিধাতৃত্বের (Providence) পরিচয় দিতে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন ঃ—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি ! দ্যাবা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণি অর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যা পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যা যাং যাং চ দিশমনু। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি যজমানং দেবা দর্বীং পিতরোঽন্বায়ত্তাঃ —বৃহ,৩।৮।৯।

'হে গার্গি ! ইঁহারই প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে স্বর্গ মর্ত্ত্য বিধৃত রহিয়াছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত্ত অহোরাত্র অর্দ্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি ! এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে পূর্ব্ব দিগ্বাহী নদীচয় শ্বেত পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হইতেছে, পশ্চিম দিগ্বাহী নদীচয় অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে ; এই অক্ষর পুরুষের প্রশাসনে দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ—মনুষ্যগণ, দেবগণ ও পিতৃগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইতেছে।'

তৈত্তিরীয় উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্র ইহারই প্রতিধ্বনি—

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদ্ অগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয়, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

ব্রহ্মের এই ভৈরব ভাবকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—মহৎ ভয়ং বজ্রম্ উদ্যতম্ (কঠ, ২।৩।২)

যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনা একটু ভিন্ন ধরণের। তিনি বলেন—

অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ। স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ তং ত্বা ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—বৃহ, ৩।৯।২৬।

'সেই ঔপনিষদ (উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য) পুরুষ তিনি, যিনি সমস্ত দেবকে সমস্ত পুরুষকে নিরোধ করিয়া, প্রণোদ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়াছেন।'*

বলা বাহুল্য, এ সকল কথা আত্যন্তিক অদ্বৈতবাদের প্রতিকূল, কারণ, সে মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়—দ্বৈত, বিবিধ, নানাত্বের একান্ত নিষেধ। ঐ মতে Before, around and in us we see only the one omnipresent Supreme Soul। সংস্কৃত দর্শনের পরিভাষায় ইহাকে "প্রৌঢ়িবাদ" বলে—অর্থাৎ ব্যবহারাজীবের ভাষায় assuming but not admitting—as a concession to the empirical consciousness। মানব চিত্ত অদ্বৈতের উত্তুঙ্গ ভূমিতে সুস্থিত থাকিতে পারে না। এই জন্য ঋষি-উপদেষ্টারা সময় সময় উচ্চ ব্যোম ছাড়িয়া দ্বৈতের নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন।

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম যাজ্ঞবল্ক্যের উপদিষ্ট পরমাত্মা অন্তর্যামী ও সর্ব্বান্তর। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদে (পঞ্চম অধ্যায়ের ১১ হইতে ১৮ কাণ্ড দ্রষ্টব্য) এই আত্মাকে 'বৈশ্বানর আত্মা' বলা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য ইহার অর্থ করিয়াছেন—বৈশ্বানরো বিশ্বো নর এব বা সর্ব্বাত্মত্বাৎ (the Universal Man, the All-Self)—কারণ, তিনি কেবল আমার মধ্যেই বিপশ্চিৎ † (knowing subject) রূপে বিরাজিত নহেন—তিনি উপনিষদের ভাষায় 'সর্ব্বাহংমানী' (synthesis of all the knowing subjects)।

সেই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ (বৃহ, ২।৫।১৯) অর্থাৎ all-perceiving। এই যে ঐক্য-যুতি (equation) আত্মা-ব্রহ্ম—ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত—সমস্ত উপনিষদ্ ইহার ঝঙ্কারে মুখরিত। কিন্তু ইহার মূল উৎস বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য হইতে।

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ খণ্ডে দেখি উষস্ত যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতেছেন—'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ তং মে ব্যাচক্ষ,—যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা—তাঁহার ব্যাখ্যান কর।' যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—এষ তে আত্মা সর্ব্বান্তরঃ—এই তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। সেই যে সর্ব্বান্তর আত্মা—ইনিই ব্রহ্ম—অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্।

* 'Who impelling asunder these spirits and driving them back, steps over and beyond them,' i. e., who spurs them on to their work, recalls them from it and is pre-eminent over them.—Deussen.

† ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ—কঠ, ২।১৮ ; তিনি দ্রষ্টা, তিনি সাক্ষী—একমেবাস্য পরিদ্রষ্টৃ ;
** সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেত, ৬।১১

ব্রহ্ম অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত

এই যে আত্মা বা ব্রহ্ম—যদিও ইনি সর্ব্বান্তর, যদিও ইনি অন্তর্যামী, যদিও ইনি—তদ্ অন্তঃ অস্য সর্ব্বস্য ; যদিও ইনি দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে (closer then our hand and feet),—তথাপি তিনি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে এ কথা বারম্বার বলিয়াছেন—

ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যের্ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়ার্ন মতের্মন্তারং মন্বীথা ন বিজ্ঞাতের্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।

"দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দেখা যায় না, শ্রুতির শ্রোতাকে শোনা যায় না, মতির মন্তাকে মনন করা যায় না, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে বিদিত হওয়া যায় না।" এই জন্য তিনি অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অমত মন্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা।

অদৃষ্টঃ দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা অমতঃ মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা—বৃহ, ৩।৭।২৩।
অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ—বৃহ, ৩।৮।১১

অতএব নিষেধ মুখে ভিন্ন তাঁহার নির্দ্দেশ সম্ভবপর নয়—It can only be known negatively। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন—

তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবায়ু অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনো অতেজস্কম্ অপ্রাণম্ অমুখম্ অমাত্রম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্।—বৃহ ৩।৮।৮

'হে গার্গি! সেই অক্ষর (ব্রহ্মকে) ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বর্ণন করেন। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তিনি লোহিত নহেন, স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন ; তিনি রস নহেন, শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, তমঃ নহেন, তেজ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।' অতএব তাঁহার 'আদেশ' নেতি নেতি মাত্র, ইহা নয় ইহা নয়—অথাত আদেশঃ নেতি নেতি (বৃহ, ২।৩।৭)। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে চারি বার এই 'আদেশ' উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার সম্প্রসারণ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—

স এব নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে অসঙ্গো ন হি সজ্জতে অসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। —বৃহ ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫।

ফলতঃ তাঁহার মুখে ইহা একটি formula বা সূত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। সে সূত্রের অর্থ এই যে, 'এই আত্মা ন ইতি ন ইতি।

ইনি অগৃহ্য ইহাকে গ্রহণ করা যায় না, ইনি অশীর্য্য শীর্ণ হন না, ইনি অসঙ্গ কিছুতে সক্ত হন না, ইনি অবদ্ধ কিছুতে ব্যথা পান না, ইনি হিংসিত হন না।'

উপনিষদের সর্ব্বত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশস্থলে এই নঞ্ ও নকারের ছড়াছড়ি, কিন্তু সকল বচনেরই মূলে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ উপদেশ।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ।—কঠ, ৩।১৫।

'ব্রহ্ম শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, রসহীন, গন্ধহীন, ব্যয়হীন বস্তু।'

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি-পাদম্।—মুণ্ডক ১।১।৬

'যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ ; যাঁহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই, পদ নাই।'

নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যম্—মাণ্ডূক্য, ৭

'যাঁহার প্রজ্ঞা বহির্ম্মুখও নহে, অন্তর্ম্মুখও নহে, উভয়মুখও নহে ; যিনি প্রজ্ঞান-ঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন ; যিনি দর্শনের অতীত, ব্যবহারের অতীত, গ্রহণের অতীত, লক্ষণের অতীত, চিন্তার অতীত, নির্দ্দেশের অতীত।

'কেন'-উপনিষদ্ ইহার সার সঙ্কলন করিয়া বলিয়াছেন :—

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি—কেন, ১।৩

অর্থাৎ তিনি বিদিত অবিদিত, কোন কোঠাতেই পড়েন না।

ব্রহ্ম কেন অজ্ঞেয় ?

ব্রহ্ম বা আত্মা কেন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ? যাজ্ঞবল্ক্য এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহাই চরম উত্তর।

যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ, বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ —বৃহ, ৪।৫।১৫।

অর্থাৎ যিনি বিষয়ী (knowing subject), তিনি বিষয় (known object) হইবেন কিরূপে ? যিনি বিজ্ঞাতা, তিনি কোন দিন বিজ্ঞাত হইতে পারেন কি ?

কোন কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় কিরূপে ? উপাধির দ্বারা। এই উপাধি ত্রিবিধ—দেশ, কাল ও নিমিত্ত। পাশ্চাত্য দর্শনে ইহাদিগের নাম Categories—(the three categories of Space, Time and Causality)। (Space = দেশ, Time = কাল এবং

Causality = নিমিত্ত বা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ)। ব্রহ্ম যখন নিরুপাধি—দেশাতীত, কালাতীত ও নিমিত্তাতীত, তখন তিনি জ্ঞানের বিষয় হইবেন কিরূপে ? যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনায় ব্রহ্ম অনন্তম্ অপারম্ (বৃহ, ২।৪।১২)—তিনি অনন্তরমবাহ্যম্—অর্থাৎ তিনি দেশাতীত। তিনি অপূর্ব্বম্-অনপরম্। তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে কিছু নাই—অর্থাৎ তিনি কালাতীত। অধিকন্তু তিনি অক্ষর, অর্থাৎ হ্রাস বৃদ্ধি, অপচয় উপচয়হীন—তদেতৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি (বৃহ, ৩।৮।৯)। তিনি ধ্রুব—ক্ষয় ব্যয়হীন) অর্থাৎ নিমিত্তের অতীত।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যং এতদ্ অপ্রমেয়ং ধ্রুবং।
বিরজঃ পর আকাশাদ্ অজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥ —বৃহ, ৪।৪।২০

'ব্রহ্ম অপ্রমেয় ও ধ্রুব। তাঁহাকে এক বলিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি রজোহীন, আকাশের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তিনি অজ, মহান্, ধ্রুব।'

পুনশ্চ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষায়, ব্রহ্ম ভূমা। ভূমা কি ?

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যদ্ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং।
—ছান্দোগ্য, ৭।২৪।১

'যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয় না, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয় না, অন্য বস্তুর মনন হয় না, তিনি ভূমা ; আর যেখানে অন্য বস্তুর দর্শন হয়, অন্য বস্তুর শ্রবণ হয়, অন্য বস্তুর মনন হয় ; তাহা অল্প, তাহা মর্ত্ত্য।' ব্রহ্ম যখন ভূমা, তখন তাঁহাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের একাকার ভাব। তিনি দ্বৈত-রহিত, অদ্বৈত, ত্রিপুটীর অতীত। এক কথায়,

একমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছা, ৬।২।১

নানাত্বের, ভেদের, দ্বৈতের তাঁহাতে কোন অবকাশই নাই। অতএব তিনি কিরূপে জ্ঞেয় হইবেন ? এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য অতি মনোজ্ঞ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি তদিতর ইতরং অভিবদতি তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ তৎ কেন কং অভিবদেৎ তৎ কেন কং মন্বীত তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ।—বৃহ, ২।৪।১১।

অর্থাৎ, 'যেখানে দ্বৈতের ভাণ হয়, সেখানেই অপর অপরকে আঘ্রাণ করে, অপর অপরকে শ্রবণ করে, অপর অপরকে বচন করে, অপর অপরকে মনন করে, অপর অপরকে বিজ্ঞান করে; কিন্তু যখন সমস্তই আত্মা (ব্রহ্ম) হইয়া যায়, তখন কে কাহার দর্শন করিবে, কে কাহার শ্রবণ করিবে কে কাহার বচন করিবে, কে কাহার মনন করিবে, কে কাহার বিজ্ঞান করিবে ?' অতএব ব্রহ্ম যখন অদ্বৈত, একাকার, ভূমা—তখন তিনি জ্ঞেয় হইতে পারেন না।

ব্রহ্মের ঐকদেশিক প্রতীক-প্রত্যাখ্যান

ব্রহ্ম যখন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—যখন তাঁহাকে কোন বিশেষণেই বিশেষিত করা যায় না, কোন চিহ্নেই চিহ্নিত করা যায় না, কোন লক্ষণেই লক্ষিত করা যায় না—যখন তিনি বচনের মননের নিরূপণের অতীত—তখন তাঁহার নির্ব্বচন ও বিবর্ণন করিতে যাওয়া পণ্ড শ্রম নহে কি ? জনক-সভায় বিদগ্ধ শাকল্য ঐরূপ ব্যর্থ প্রয়াস করিলে যাজ্ঞবল্ক্য 'আহল্লিক'* (ষণ্ড) বলিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। শাকল্য একে একে বলিলেন—শরীরে যে শারীর পুরুষ, কামে যে কামময় পুরুষ, আদিত্যে যে আদিত্যস্থ পুরুষ, আকাশে যে প্রাতিশ্রুৎক পুরুষ, তমে যে ছায়াময় পুরুষ, রূপে যে আদর্শস্থ পুরুষ, জলে যে সলিলস্থ পুরুষ, রেতে যে পুত্রময় পুরুষ—তিনিই সর্ব্বস্য আত্মনঃ পরায়ণম্ (সমস্ত আত্মার পরায়ণ বা climax)। যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেক নির্দ্দেশনার তুচ্ছত্ব ও ঐকদেশিকত্ব (inadequacy) প্রদর্শন করিয়া বলিলেন 'উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পুরুষ (ব্রহ্ম) কিন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট পুরুষ নহেন। তিনি কে ? স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্য অত্যক্রামৎ।' (বৃহ, ৩।৯ ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য)। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বালাকিঅজাতশত্রু-সংবাদ ইহারই অনুরূপ। পণ্ডিত-মানী দৃপ্ত বালাকি অজাত শত্রুকে বলিলেন 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি'। অজাত শত্রু বলিলেন 'বেশ'। তখন বালাকি একে একে আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, সলিলে, আদর্শে, শব্দে, দিকে, ছায়াতে এবং আত্মাতে ব্রহ্মের সত্তা তিনি যতদূর জানিতেন, যথাক্রমে বিবৃত করিলেন। প্রত্যেক বিবরণের পর অজাতশত্রু বলিলেন "ইহ বাহ্য কহ পরে আর"। স হ তুষ্ণীম্ আস গার্গ্যঃ (বৃহ, ২।১।১৩)—তখন দৃপ্ত বালাকি নীরব হইলেন। অজাতশত্রু বলিলেন এই পর্য্যন্ত ? বালাকি বলিলেন "হাঁ, এতাবৎ—এই পর্য্যন্ত।" অজাতশত্রু বলিলেন 'নৈতাবতা বিদিতং ভবতি' এবং পরে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই অবস্থা-ত্রয়ের পরিচয় দিয়া জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করিলেন।

বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে যে যাজ্ঞবল্ক্য-জনক-সংবাদ বিবৃত আছে, তাহাতে দেখা যায় যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন 'যৎ তে কশ্চিদ্ অব্রবীৎ তৎ শৃণবাম—অন্য কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন শুনিতে ইচ্ছা করি।' জনক তখন অন্যান্য বেদাচার্য্যগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিলেন—বাক্ বৈ ব্রহ্ম, প্রাণোবৈ ব্রহ্ম, চক্ষুর্বৈ ব্রহ্ম, শ্রোত্রং বৈ ব্রহ্ম, মনো বৈ

* অহল্লিক = ষণ্ড। ইহা রঙ্গরামানুজের অর্থ। আনন্দ গিরি বলেন অহল্লিকের অর্থ প্রেত।

ব্রহ্ম, হৃদয়ং বৈ ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন উপাসনার প্রতীক (symbol) রূপে, এই সকল ব্যবহৃত হইতে পারে* কিন্তু ব্রহ্মের নির্দ্দেশরূপে নহে। কারণ, ইহারা এক পাদ মাত্র (partial)—একপাদ্ বা এতৎ। স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে (বৃহ, ৪।২।৪)। †

ব্রহ্ম বিশ্বের অন্তরে ছন্ন-শক্তি

ব্রহ্ম অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিয়া উপনিষদে তাঁহার সম্বন্ধে 'নিগূঢ়', 'প্রচ্ছন্ন' প্রভৃতি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে বসতি বিজ্ঞানম্।

'দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ন্যায় সমস্ত ভূতের মধ্যে ব্রহ্ম নিগূঢ় রহিয়াছেন।' ধ্যানরসিক ওমর খৈয়াম এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন :—

Whose secret presence, thro' creation's veins
Running quick-silver like, eludes your pains.

এ সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশ এই—

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমেবানুবিলীয়েত ন হাস্যোদ্গ্রহণায়েব স্যাৎ।
—বৃহ, ২।৪।১২

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলেই বিলীন হয়, তাহার আর পৃথক্ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।' এই মর্ম্মে ছান্দোগ্য উপনিষৎও ঐ লবণের উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—লবণমেতদ্ উদকে অবধায় × × অত্র বাব কিল সৎ সোম্য ন নিভালয়সে অত্রৈব কিলেতি—ছা, ৬।১৩।১-২

অন্যত্র বৃহদারণ্যক বলিতেছেন—

স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। অনাখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে অবহিতঃ স্যাৎ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভর-কুলায়ে। তং ন পশ্যন্তি।—১।৪।৭

'যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, যেমন অগ্নি অরণির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি সেই আত্মা এখানে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট আছেন। কিন্তু তাঁহাকে,

* প্রজ্ঞা ইত্যেনৎ উপাসীত, প্রিয়ম্ ইত্যেনৎ উপাসীত, সত্যম্ ইত্যেনৎ উপাসীত, অনন্ত ইত্যেনৎ উপাসীত, আনন্দ ইত্যেনৎ উপাসীত, স্থিতিঃ ইত্যেনৎ উপাসীত—বৃহ, ৪।১।২-৭

† 'খং ব্রহ্ম' 'আকাশো ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৪।১০।৫, ৩।১৮।১)—এ উপদেশ সম্বন্ধেও যাজ্ঞবল্ক্যের বক্তব্য ঐ। তিনি বলেন—আকাশ সর্ব্বগত হইলেও কখন ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতীক হইতে পারে না; কারণ বিরজঃ পর আকাশাৎ (বৃহ, ৪।৪।২০)—ব্রহ্ম আকাশ হইতে পরতর। সেই জন্য গার্গীর প্রশ্নে উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—অস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গি! আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ (বৃহ, ৩।৮।১১)—সেই অ-দৃষ্ট, অ-শ্রুত, অ-মত অবিজ্ঞাত অক্ষর ব্রহ্মেই আকাশ ওত ও প্রোত।

কেহ দেখিতে পায় না।' ঋগ্বেদের ঋষি তাই ইঁহাকে 'প্রথমচ্ছদ' বলিয়াছিলেন, ১০।৮৩।১। সেইজন্য ছান্দোগ্যে তাঁহার নাম অণিমা—স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা—৬।১৩।৩

সেই জন্যই বোধ হয় অধ্যাপক এডিংটন (Eddington) বলিয়াছেন—"Something unknown is doing we know not what". প্রথম দৃষ্টিতে এই বাণী অভাবাত্মকই মনে হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে তিনটি ভাবাত্মক বাক্য নিহিত রহিয়াছে। প্রথম বিশ্বব্যাপক শক্তি, দ্বিতীয় বিশ্বব্যাপী ব্যাপার, এবং তৃতীয় বিশ্বায়ত অভিসন্ধি। *

এই বিশ্বশক্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য এই—

The power which manifests throughout the universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness—(Herbert Spenser's Ecclesiastical Institutions. Page 829).

ব্রহ্ম বিজ্ঞানম্ ও আনন্দম্

যাজ্ঞবল্ক্য এই বিশ্বশক্তি বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেন যে তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম—বৃহ, ৩।৯।২৮। অর্থাৎ ঐ বিশ্বশক্তি জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের অন্ধ জড়শক্তি (blind force) নহে, তিনি বিজ্ঞান (intelligence)। জগৎ ব্যাপারে তাঁহার এক নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে এবং কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া ঐ অভিসন্ধির প্রপূর্ত্তি হইতেছে—

মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি
যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি।

Yet I doubt not through the ages one increasing purpose runs.

এই অভিসন্ধি আপূর্য্যমান—কোন না কোনদিন ইহার চরিতার্থতা হইবেই। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর জেম্স জিন্সের (Sir James Jeans) কয়েকটি উক্তি প্রণিধান-যোগ্য—

The universe begins to look more like a great thought than like a great machine. * * * We discover that the universe shews evidence of a designing, of a controlling power, that has something in common with our individual minds.

এ প্রসঙ্গে আর একজন বৈজ্ঞানিক মনীষীর বাক্য অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে।

* The above statement, sounding negative, actually states three positives—a universal power, a universal process and a universal purpose.—Dr. Cousins.

There is evidence of mind at work, beneficent and contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding, an adaptation to conditions.—Making of Man by Sir Oliver Lodge.

কিন্তু ব্রহ্ম শুধু বিজ্ঞান নহেন—যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন তিনি বিজ্ঞানং আনন্দম্—অর্থাৎ, পাশ্চাত্য কবির ভাষায়, the heart of being is eternal bliss। সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের নাম ভূমানন্দ। সে আনন্দ বচনাতীত, মননাতীত—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—ব্রহ্মের যে ভূমানন্দ, জীব তাহার কণিকামাত্র লাভ করে। তাহাই তাহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩২

বিষয়ে জীব যে, আনন্দ অনুভব করে, তাহার কারণ এই যে, বিষয়ের মধ্যে সেই রস-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব সেই রসের আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদের উক্তি এই—

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি—তৈত্তরীয়, ২।৭

'তিনিই রস। রস আস্বাদন করিয়াই জীব আনন্দী হয়। যদি আনন্দস্বরূপ আকাশ (ব্রহ্ম) না থাকিতেন, তবে কে প্রাণন করিতে পারিত? তিনিই আনন্দিত করেন।' সেইজন্যই কবি ব্রাউনিং (Browning) বলিয়াছেন—

Where enjoyment is, there is He.

মানুষ সুখান্বেষী—আনন্দেন খলু জাতানি জীবন্তি। যেখানেই আনন্দের উৎস, সেখানেই মানুষের প্রেম। উপনিষদ্ বলিলেন—অন্য বস্তুতে বা ব্যক্তিতে আমাদের যে আনন্দানুভব হয়, তাহার কারণ এই, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সেখানে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের অপেক্ষা আর প্রেমাস্পদ কে? তিনি—

প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ—বৃহ, ১।৪।৮

'ব্রহ্ম পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয় অন্য সমস্তের অপেক্ষা প্রিয়।'

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট এই তত্ত্বই অতি চমৎকার ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন:—

স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃপ্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। × × × ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। —বৃহ, ২।৪।৫

'পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পতি প্রিয় হয়। জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় জায়া প্রিয় হয়। পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় পুত্র প্রিয় হয়। বিত্তের কামনায় বিত্ত প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় বিত্ত প্রিয় হয়। দেবের কামনায় দেব প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় দেব প্রিয় হয়। কাহারও কামনায় কেহ প্রিয় হয় না, আত্মারই কামনায় সকলে প্রিয় হয়।'

সেইজন্য উপনিষদে ব্রহ্মের একটি 'ছদ্মনাম' (mystery-name) 'তদ্বন'। ব্রহ্মের সমান 'বনিত' আর কি আছে? অতএব (যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন) এই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য-প্রতিষ্ঠাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা।

এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সংপদ্‌এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২।

'ইনিই পরমা গতি, ইনিই পরম সম্পদ্, ইনিই পরম লোক, ইনিই পরমানন্দ।'

আমরা এখানে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। বারান্তরে তাঁহার জীববাদ ও মোক্ষবাদের প্রসঙ্গ করিব—কারণ, ঐ দুই প্রসঙ্গের অবধারণ না করিলে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদ অসম্পূর্ণ রহিবে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

নীললোহিতের স্বয়ম্বর

আদিপর্ব্ব

সেদিন রূপেন্দ্র আমাদের নবতর-জীবন সমিতিতে মহাবক্তৃতা করছিলেন, এই কথা সকলকে বোঝাবার জন্য যে, আমাদের দেশের মামুলি বিবাহপ্রথার বদলে স্বয়ম্বর-প্রথা না চালালে আমরা জাতি-গঠন কিছুতেই করতে পারব না।

রূপেন্দ্রের এ বিষয়ে এত উৎসাহ হবার কারণ—প্রথমতঃ তাঁর বাপ মা তাঁর জন্য মেয়ে খুঁজছিলেন, দ্বিতীয়তঃ তিনি হু'দিন আগে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গ পড়েছিলেন, আর তৃতীয়তঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি যথার্থই রূপেন্দ্র, অর্থাৎ অসাধারণ সুপুরুষ। আর আমরা যে ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর বক্তৃতা একমনে শুনছিলুম, তার কারণ আমরা সকলেই ছিলুম অবিবাহিত অথচ বিবাহযোগ্য। কাজেই এ আলোচনায় আমরা সকলেই মনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম, চুপ করে ছিলেন সুধু নীললোহিত। তাই রসিকলাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, তুমি কোন কথা কইছ না কেন? রূপেন্দ্রের প্রস্তাবে তোমার মৌনতা কি সম্মতির লক্ষণ নাকি?" নীললোহিত কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বললেন, "যা হয় তা হওয়া উচিত, এরকম nonsensical কথার উপর আর কি বলব?" এ কথা শুনে আমরা সকলেই কান খাড়া করলুম, কেননা বুঝলুম এইবার নীললোহিতের কেচ্ছা সুরু হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"বাঙলার মেয়েরা আজও স্বয়ম্বরা হয় নাকি?" নীললোহিত বললেন, "আলবৎ।" আমি আবার প্রশ্ন করলুম, "তুমি কি করে জানলে?" নীললোহিত বললেন, "জানলুম কি করে? বই কি কাগজ পড়ে নয় শুঁড়ির দোকান কিম্বা গুলির আড্ডাতে পরের মুখে শুনেও নয়—নিজের চোখে দেখে?"

—চোখে দেখে?

—হাঁ, চোখে দেখে। আমি একটি জাঁকালো স্বয়ম্বর-সভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলুম, আর আমার চোখ বলে যে একটা জিনিষ আছে, তা ত তোমরা সকলেই জানো।

ব্যাপারটা কি হয়েছিল শোনবার জন্য আমরা বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে, নীললোহিত তাঁর বর্ণনা সুরু করলেন।

আমি একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই একখানি চিঠি পাই, অক্ষরের ছাঁদ দেখে মনে হল মেয়ের লেখা। তার প্রতি অক্ষরটি যেন ছাপার অক্ষর,

আর সেগুলি সাজানো হয়েছে সব সরল রেখায়। লেখা দেখে মনে হল পূর্ব্বপরিচিত, কিন্তু কোথায় এ-লেখা দেখেছি, তা মনে করতে পারলুম না। শেষটা চিঠিখানি খুলে যা পড়লুম, তাতে অবাক হয়ে গেলুম। চিঠিখানি এই :—

"আপনি জানেন যে বাবা হচ্ছেন সেই জাতীয় লোক, আপনারা যাকে বলেন idealist। একটা idea তাঁর মাথায় ঢুকলে, সেটিকে কার্য্যে পরিণত না করে তিনি থামেন না। আর অপর কেউ তাঁকে থামাতে পারে না, কারণ তাঁর পয়সা আছে, আর সে পয়সা তিনি অকাতরে অপব্যয় করেন। বড়মানুষের খোশ-খেয়ালও ত একরকম idealism।

বাবা যেদিন থেকে পৈতে নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়েছেন, সেদিন থেকেই তিনি যথাসাধ্য শাস্ত্রানুমোদিত ক্ষাত্রধর্ম্মের চর্চ্চা করছেন। অতঃপর তিনি মনস্থির করেছেন যে, আমাকে এবার স্বয়ম্বরা হতে হবে। আমাদের বাড়ীতে আগামী মাঘী পূর্ণিমায় স্বয়ম্বর-সভা বসবে। আপনি যদি সে সভায় উপস্থিত হন, অবশ্য নিমন্ত্রিত হিসেবে নয়, দর্শক হিসেবে—ত খুসী হই। এরকম অপূর্ব্ব নাটক আপনি কলকাতার কোন থিয়েটারেও দেখ্‌তে পাবেন না। অবশ্য আপনাকে ছদ্মবেশে আস্‌তে হবে। কি করে কি করতে হবে সে সব মেজদা আপনাকে জানাবেন। ইতি—

মালা।'

চিঠি পড়েই বুঝলুম যে এ মালশ্রীর চিঠি।

আমাদের ভিতর কে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "মহিলাটি কে, মাদ্রাজী না মারাঠী?" নীললোহিত উত্তর করলেন, "চিঠি শুনে কি মনে হল যে, ও চিঠি কোনও কাছা-কোঁচা-দেওয়া মেয়ের হাত থেকে বেরতে পারে? হু'পাতা ইংরেজী পড়ে মাতৃভাষাও ভুলে গিয়েছ নাকি?

—না, তা ভুলিনি। কিন্তু কোনও বাঙালী মেয়ের মালশ্রী নাম কখনও শুনিনি। এমন কি হাল-ফেশানের নভেল-নাটকেও পড়িনি।

—সে নিজের নাম নিজে রাখেনি, রেখেছে তার বাপ মা।

—মেয়েটি কার মেয়ে?

—রাজা ঋষভরঞ্জন রায়ের একমাত্র সন্তান।

বাপের নাম শুনে আমরা অনেকেই আর হাসি রাখ্‌তে পারলুম না। আমাদের হাসি দেখে ও শুনে নীললোহিত মহা চটে বললেন—"বীরবলী ভাষা পড়ে পড়ে যদি সাধুভাষা ভুলে না যেতে, তাহলে আর অমন করে হাসতে না। এ ঋষভ সঙ্গীতের ঋষভ, বাঙলায় যাকে বলে রেখাব। সুরনগরের রাজ-পরিবারে ছেলেমেয়েদের নামকরণ করা হয় সঙ্গীতাচার্য্যদের উপদেশমত। মালশ্রীর পিসিদের নাম হচ্ছে জয়জয়ন্তী ও পটমঞ্জরী, আর তার পিসতুতো মেজদাদার নাম হচ্ছে নটনারায়ণ, আর বড় দাদার নাম ছিল দীপক। গান বাজনার যদি ক, খ, জানতে, তাহলে

এগুলি যে সব বড় বড় রাগরাগিণীর নাম, তা আর আমাকে তোমাদের বলে দিতে হত না। বনেদি পরিবারের ছেলের নাম কি হবে পাঁচু আর মেয়ের নাম পাঁচি ?"

নীললোহিতের এ বক্তৃতা শুনে রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে এ পরিবারে সঙ্গীতের যথেষ্ট চর্চ্চা আছে ?" নীললোহিত বললেন—"রাজা ঋষভরঞ্জন পয়লা নম্বরের ধ্রুপদী। তাঁর তুল্য বাজখাঁই গলা কোনও গাঁজাখোর ওস্তাদেরও নেই"। রসিকলাল উত্তর করলেন—"আমরা গান বাজনার ক, খ, না জানি—এটা জানি যে ঋষভের গলা বাজখাঁইই হয়ে থাকে।" এ কথা শুনে আমরা কোনমত প্রকারে হাসি চেপে রাখলুম, এই ভয়ে যে নীললোহিত আমাদের হাসি দ্বিতীয়বার আর সহ্য করতে পারবেন না। নীললোহিত বললেন—"কথায় কথায় যদি বস্তাপচা রসিকতা করো, তাহলে আমি আর কথা কইব না।"

অনেক সাধ্য-সাধনার পর নীললোহিত মালশ্রীর স্বয়ম্বরের গল্প বলতে রাজী হলেন, on condition আমরা কেউ টুঁশব্দ করব না। নীললোহিত আরম্ভ করলেন,—তোমাদের দেখছি আসল ঘটনার চাইতে তার সব উপসর্গ সম্বন্ধেই কৌতূহল বেশী। এ হচ্ছে বিলেতী নভেল পড়ার ফল। গল্প যাক্ চুলোয়, তার আশ-পাশের বর্ণনাই হল মূল। ছবি বাদ দিয়ে তার ফ্রেমের রূপই তোমরা দেখতে চাও। সে যাই হোক্, এখন আমার গল্প শোনো।

মালশ্রীর মেজদাদা অর্থাৎ রাজাবাহাদুরের ভাগ্নে আমার একজন বাল্যবন্ধু। রূপেন্দ্রের বিশ্বাস তিনি বড় সুপুরুষ। একবার নটনারায়ণকে গিয়ে দেখে আসুন চেহারা কাকে বলে;—তার উপর সে আশ্চর্য্য গুণী। নাচে গানে তার তুল্য গুণী, amateur-দের ভিতর আর দ্বিতীয় নেই। আর তার কথাবার্ত্তা শুনলে রসিকলাল বুঝতেন যথার্থ সুরসিক কাকে বলে।

রাজাবাহাদুর যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন নটনারায়ণের সুপারিসে আমি মালশ্রীর প্রাইভেট টিউটার হই। ইংরেজী সে আমার কাছেই শিখেছে। তেরো থেকে ষোলো, এই তিন বৎসর সে আমার কাছে পড়ে যেরকম ইংরেজী শিখেছে, সে ইংরেজী তোমরা কেউই জানোনা। আর তাকে এত যত্ন করে পড়িয়েছিলুম কেন জানো ? মেয়েটি সত্যিই ডানাকাটা পরী, তার উপর আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী। তারপর রাজাবাহাদুর আজ দু-বৎসর হল দেশে চলে গিয়েছেন,—আমলাদের অত্যাচারে প্রজাবিদ্রোহ হয়েছিল বলে। ইতিমধ্যে তাঁদের আর কোন খবরই পাইনি, হঠাৎ ঐ

চিঠি এসে উপস্থিত। সকালে চিঠি পেলুম, বিকেলেই মেজদার সঙ্গে দেখা করলুম। মালশ্রী নটনারায়ণকেও চিঠি লিখেছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম :

—মেজদা, ব্যাপার কি ?

—রাজামামার খেয়াল।

—এ খেয়ালের ফল দাঁড়াবে কি ?

—প্রকাণ্ড তামাসা।

—সে তামাসা আমিও দেখ্তে চাই।

—সেখানে গেলেই দেখ্তে পাবে।

—সেখানে যাই কি করে ?

—নামরূপ ভাঁড়িয়ে।

—কি সেজে ?

—বর সেজে নয়।

তারপর সে পরামর্শ দিলে যে, আমি দরওয়ান সেজে ও-সভায় যেতে পারি। রাজাবাহাদুরের পুরোনো জমাদার রামটহল সিং জনকতক নতুন ভোজপুরি দরওয়ান সংগ্রহ করবার জন্য কলকাতায় এসেছে; তাদের দলেই আমি ঢুকে যেতে পারি।

উদ্যোগপর্ব্ব

তারপর দিন সকালে আমি মেজদার ওখানে হাজির হলুম। আমার নাম হল নীললাল সিং, আর নটনারায়ণ আমাকে এ দলের সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলে। সবরকম ভোজপুরি দেহাতী বুলি আমি বাঙলার চাইতেও অনর্গল বলতে পারি। আর "করঁলবড়া"র জায়গায় ভুলেও আমার মুখ থেকে "করলবাণী" বেরোয় না, কাজেই রামদুলাল সিং, রাম অবতার সিং, রামখেলাওয়ান সিং, রামদিন সিং, রামযশ সিং, রামরূপ সিংহ, রামভূপ সিং, রামদৎ সিং, রামগোলাম সিং, রামগোপাল সিং প্রভৃতি ভোজপুরি ছত্রীর দল আমাকে আর বাঙালী বলে চিন্‌তে পারলে না। আমি জমাদার হয়েই দু-বেটা মূর্ত্তিমান পাপকে স্রেফ বিদেয় করলুম। কারণ ওঙ্কারনাথ ব্রাহ্মণ ও বৈজনাথ ব্রাহ্মণকে দেখেই বুঝলুম যে দু-বেটাই মৃজাপুরি গুণ্ডা, দু-বেটাই খুনে। দু-পয়সার লোভে কাকে কখন ছোরা-ছোরা মেরে দেবে, তার ঠিক নেই। আর ফলে আমার বদনাম হবে।

এই রামসিংদের সঙ্গে আমার দু'দণ্ডেই ভাব হয়ে গেল, আর তাদের এমন প্রিয়পাত্র হয়ে পড়্‌লুম যে, সেই রাত্তিরে ট্রেণে রামগোলাম সিং ও রামগোপাল সিং তাদের মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলে।

আমি দু'জনকেই কথা দিলুম যে, প্রথমে মুনিবের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক্—তারপর আমার বিয়ের কথা ঠিক করা যাবে। তারা বললে—"ই বাৎ ঠিক হ্যায়"। Loyalty কাকে বলে দেখ্‌তে চাও ত এদের দেখো। সেই একদিনের আলাপ, কিন্তু আজও যদি খবর দিই ত তারা সূতোপটী, ময়দাপটী, পাথুরেঘাটা, দরমাহাটা, যে যেখানে আছে সে সেখান থেকে হাতের গোড়ায় যে হাতিয়ার পায়, তাই নিয়ে ছুটে আস্‌বে। আজও বড়বাজারের গদিতে গদিতে ও পাথুরেঘাটার দেউড়িতে দেউড়িতে এক প্রচার যে, বাঙলামে কোই মরদ হ্যায় ত হ্যায় লীললাল ব্রাহ্মণ। আমি যে ছত্রী নই, সে-কথা তারা পরে জানতে পেরেছে, আর তার পর থেকেই আমার সঙ্গে দেখা হলেই তারা বলে, "গোড় লাগি মহারাজ"।

আমি সদলবল বিকেলে ট্রেণে উঠ্‌লুম থার্ড ক্লাসে, আর ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠলেন আর একদল, কে তা চিনিনে। ভোর হতে না হতেই পীরপুর ষ্টেশনে পৌছলুম। রাত্তিরে অবশ্য গাড়ীতে ঘুম হয়নি। আমাদের মুখে যেমন সিগারেট, রামসিংদের মুখে তেমনি গাঁজার কলকে, মধ্যেমধ্যেই ধোঁয়া ছাড়ছে। তার উপর আবার গান। কেউ ধরছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারকবাদী, কেউ বা আবার লাউনি। ভজনই এরা গায় ভাল, কারণ ভজনে তান নেই, আছে শুধু টান। তাদের মুখে ভজনগুলোই আমার লাগছিল ভাল। "প্রভু অগুণে চিতে না ধরো" ভজনটা শুনে আমার মন ভক্তিরসে তেমন স্যাৎসেঁ'তে হয়ে ওঠেনি, যেমন হয়েছিল "সাহেব আল্লা করিম রহিম" এই ইসলামী ভজন শুনে। হিন্দু-মুসলমানের মনের গর্ভ-মন্দিরে যে একই দেবতা বিরাজ করছেন, এই সব গানের প্রসাদে সে-সত্য আমরা আবিষ্কার করি। মোবারকবাদী কাকে বলে জানো ?—শুভকর্ম্মের শুভলগ্নে গান। ভক্তিরস অবশ্য বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, তাই ওদের মধ্যে সব চেয়ে ফুর্ত্তিওয়ালা ছোকরা রামরঙ্গিলা সিং যখন এই বিয়ের গান ধরলে—

"হাস হাসকে ঘুঁঘট খোলে লালবনা।
আম্মা মেরে টীকা দেখলে ভয়া লালবনা॥"

তখন ঘরসুদ্ধ হাসির গর্‌রা পড়ে গেল। "বর আমার ঘোমটা খুলে কপালে রুলির ফোঁটা দেখে নিয়েছে"—এ কথায় হাসবার যে কি আছে তা জানিনে, কিন্তু ঐ সূত্রে যে-সব দেহাতি রসিকতা শুনলুম, তা তোমাদের না শোনাই ভাল। সে যাই হোক, ঘুম নাহলেও রাতটা কেটেছিল ভাল। ব্যাপার হয়েছিল একদম Musical Soiree।

এতক্ষণ সকলে চুপ করে ছিল। অবশেষে আমাদের মধ্যে প্রধান গাইয়ে, বিশ্বনাথ ওস্তাদের সাগ্‌রিদ শ্রীকণ্ঠ বলে উঠলেন—"নীললোহিত, তুমি দেখছি গানবাজনাতেও expert হয়ে উঠেছ। ভজনের সঙ্গে খেয়ালের তফাৎ কি, তাও তুমি জানো।"

তিনি উত্তর করলেন—তিন বৎসর ত আর কানে তুলো দিয়ে মালাকে পড়াইনি। ও-বাড়ীতে যে দিবারাত্র ওস্তাদী গান হয়। গানের expert গলা সাধলে হয় না, তার জন্য চাই কান সাধা।

—মানলুম তাই। আর দরওয়ানরাও সব ওস্তাদি গান গায় ?—অবাক্ করলে !

—ভাল ! দরওয়ানের সঙ্গে ওস্তাদের তফাৎটা কি ? দু'জনেই ডালরুটি ও গাঁজা খায়, দু'জনেই মুগুর ও সুর ভাঁজে। কেন, তুমি কখনও কোন পালোয়ানকে মৃদঙ্গের সঙ্গে তাল ঠুকে কুস্তি করতে দেখো নি ? ওরা সব আজ ওস্তাদ কাল দরওয়ান, আজ দরওয়ান কাল ওস্তাদ,—যখন যার যেমন পরবস্তি হয়।

তারপর তিনি আমাদের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—যা বল্লুম তার থেকে মনে ভেবো না যে, ওদের বিরুদ্ধে আমার কোনরূপ prejudice আছে কি ছিল। নিরক্ষর ও নিঃস্ব হলেও, মানুষের অন্তরে যে প্রেম ও ভক্তি আর দেহে জোর ও হিম্মত থাকতে পারে, এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাক্‌লে তোমরাও তা' দেখ্‌তে পেতে। তোমরা ত 'হিষ্টরি' পড়েছ। সন সাঁতাওনকে গদড় কারা করেছিল ? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষরা, না এদের বাপ-ঠাকুরদারা ? তোমরা এদের ছাতুখোর বলে অবজ্ঞা করো, তার কারণ তোমরা জানো না ছাতুর ভিতর কি মাল আছে। কালিদাস কি খেয়ে মেঘদূত লিখেছিলেন, ভাত না ছাতু ?

আমি বললুম—হয়েছে, এখন গল্প বলো।

নীললোহিত উত্তর করলেন—"আমি ত তাই বলতে চাই, কিন্তু তোমরা বলতে দেও কৈ ? গল্প শুনতে তোমরা শেখোনি, শিখবেও না, কারণ তোমরা চাও নিজের নিজের বিদ্যে দেখাতে,—কেউ সঙ্গীতের, কেউ সাহিত্যের। এত সমালোচকের পাল্লায় পড়লে আমি ত আমি, Shakespeare-ও তাঁর গল্প বল্‌তে পারতেন না। কেউ না কেউ Caliban-এর anthropology নিয়ে ঘোর তর্ক সুরু করত। যদি সত্যিই শুনতে চাও ত এখন শোনো ;—বিদ্যে গোলদীঘিতে গিয়ে জাহির করো।

পীরপুর ষ্টেশন থেকে সুরনগর দশ মাইল রাস্তা। আমি গাড়ী থেকে নেমেই, আমাদের দলবলকে একবার drill করালুম, এবং তারপর সকলকে

shoulder arms করে quick march করতে হুকুম দিলুম। আর একখানি লরিতে ভাবী জামাইবাবুরা রওনা হলেন; অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা ট্রেনে ফার্ষ্টক্লাসে এসেছিলেন। হাজার হাজার নাকে বেসরপরা চাষার মেয়ে ছু-পাশে কাতার দিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা দেখতে লাগল। তারা বলাবলি করতে আরম্ভ করলে—"এ কিরকম হল, বরের দল চলেছে হেঁটে—আর তাদের তল্পীদাররা চেপেছে মোটর গাড়ীতে,—বোধহয় মালপত্র হেপাজং করে নিয়ে যাবার জন্যে?" এ ভুল যে তাদের হয়েছিল, তার কারণ আমার দলবলরাই ছিল দেখতে রাজপুত্তুরের মত,—আর যারা লরিতে ছিল তারা দেখতে তোমরা যেমন।

আমরা ছু'দলই রাজবাড়ীতে একসঙ্গে পৌঁছলুম। পাড়াগেঁয়ে কাঁচা রাস্তা, সে রাস্তায় আমাদের পায়ের সঙ্গে মোটর পাল্লা দিতে পারবে কেন? সেখানে গিয়েই জামাইবাবুরা রাজাবাহাছুরের Guest House-এ চলে গেলেন, আর আমাদের বাসা হল দেউড়ির ডান পাশের ভোজপুরি ব্যারাকে।

বাঁ পাশের ঘরগুলোতে আস্তানা করেছিল—বাঙালী লাঠিয়ালরা। গিয়ে দেখি তারা সব সিঙ্গার-পটার করছে। কেউ ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁতন করছে, কেউ বাবরি চুল আঁচড়াচ্ছে ত আঁচড়াচ্ছেই, কেউ আবার একমনে দাঁতে মিশি দিচ্ছে। সকলেরই পরনে মিহি শান্তিপুরে ধুতি, কোমরে গোট, বাজুতে দাওয়া আর দোয়া-ভরা কবচ ও মাছুলি, আর কাঁধে লাল ডুরেদার গামছা। বেটারা যেন সব নবাবপুত্তুর—কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এরা পৃথিবীতে এসেছে যেন পান দোখতা খেতে আর কাজিয়ার সময় লোকের পেটে সড়কি বসিয়ে দিতে। তার পরেই নিরুদ্দেশ। বেটাদের বাড়ী হচ্ছে হয় নটীবাড়ী নয় শ্রীঘর—আর যেখানেই তারা যায় সেখানেই ত এ ছুই ঘরবাড়ী আছে। এই সব লাল-খাঁ কালো-খাঁদের বাঁয়ে রেখে, আমরা নিজের আড্ডায় গিয়ে ঢুকলুম।

দিনটে কেটে গেল—হাতিয়ার শানাতে। কারণ, রাজবাড়ী থেকে যে সব ঢাল-তলওয়ার আমাদের দেওয়া হয়েছিল—সে সব ছু'শ বৎসরের মরচেধরা। তাদের মরচে ছাড়াতেই প্রায় দিন কাবার হয়ে গেল। সেদিন আমাদের আর রান্নাবাড়া হল না, যদিচ রাজবাড়ী থেকে প্রকাণ্ড সিধে এসেছিল। আমরা সকলে জলের ছিটে দিয়ে ছাতু তাল পাকিয়ে নিয়ে গণ্ডা গণ্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তা গলাধঃকরণ করলুম। সন্ধ্যে হয় হয়, এমন সময় আমাদের ডাক পড়্‌ল—স্বয়ম্বরসভা পাহারা দেবার জন্য। ভোজপুরিদের সঙ্গে লাঠিয়ালদের তফাৎ এই যে, লেঠেলরা খেতে না পেলে ডাকাত হয়, আর ভোজপুরিরা পাহারাওয়ালা।

সভাপর্ব্ব

বিয়ের সভা বসেছিল ঠাকুরবাড়ীতে, কারণ তার নাটমন্দিরে শ-পাঁচেক লোক হেলায় বসতে পারে। ঠাকুরবাড়ীতে ঢোকবার আগে বাইরের উঠানে দেখি লাঠিয়ালরা সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এ এক নতুন মূর্ত্তি। এবার তারা সব কাপড় পরেছে, উত্তর বঙ্গের চাষার মেয়েদের মত বুক থেকে ঝুলিয়ে, আর সে কাপড়ের ঝুল হাঁটু পর্য্যন্ত। সকলেরই ডান হাতে পাঁচ হাত লম্বা লাঠি, কারও কারও হাতে আবার পুঁটিমাছধরা ছিপের মত সরু সরু লম্বা সড়কি, তার মুখে ইস্পাতের ফলাগুলো জিভের মত বেরিয়ে আছে। সে ত মানুষের জিভ নয়, সাপের দাঁত। আর সকলেরই বাঁ হাতে থাবাপ্রমাণ বেতের ঢাল। প্রথমে এদের দেখে চিনতেই পারিনি। মাথার চুল এখন আর তাদের কাঁধের উপর ঝুলছে না, ছাতার মত মাথা ঘিরে রয়েছে। শুনলুম, মাথার চুল দিনভর ময়দা দিয়ে ঘসে ঘসে ফুলিয়েছে। এই নাকি তাদের যুদ্ধের বেশ।

ঠাকুরবাড়ীতে ঢুকে দেখি নাটমন্দির লোকে লোকারণ্য। আর সুমুখের ঠাকুরদালান খালি, শুধু ছু'ধারে ছু'সার চেয়ারে বরবাবুরা বসে আছেন। একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড় বড় শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে 'কর্ম্মবীর', অন্যধারে একই ধাঁচে 'জ্ঞানবীর'। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্ম্মবীর, ইংরেজীতে যাকে বলে sportsman;—তাদের কারও হাতে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, কারও হাতে tennis racket, কারও হাতে boxing gloves, কারও হাতে hockey stick, কারও হাতে foot-ball। শুধু একজনের হাতে রয়েছে দেখলুম এক হাত লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তার পরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর,—শুধু কারও D-র পিছনে আছে L, কারও L. T. কারও S. C। কে কোন্ দলের লোক, তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। ছু-দলেরই রূপ এক। ব্যাং আর কড়িং এ-দলেও ছিল, ও-দলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন।

রাজাবাহাছুর নাটমন্দিরে ঢুক্‌তেই একটি উচ্চাসনে অর্থাৎ High-court-এর জজের চেয়ারে বসেছিলেন। তাঁর এক পাশে ছিল নটনারায়ণ, আর এক পাশে দেওয়ানজী। চণ্ডীমণ্ডপ ও নাটমন্দিরের মধ্যে যে গলিটা

ছিল, আমি আমার দলবল নিয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সকলের মাথায় লাল পাগড়ি, গায়ে সাদা চাপকান, কোমরে তলওয়ার আর পায়ে নাগরা জুতো ; সুধু আমার মাথার পাগড়ি ছিল ডাইনে নীল বাঁয়ে লাল, আর একমাত্র আমার তলওয়ারে ছিল হাতির দাঁতের বাঁট। আমরা প্রবেশ করে গিয়েই সব single file-এ দাঁড়িয়ে salute করলুম। তারপর এই বলে অভিবাদন করলুম, "জিয়ে মহারাজ, জিয়ে মোতিওয়ালা, দোস্ত বাহাল, দুষ্‌মণ পয়মাল"। শুনে রাজাবাহাদুর খুব খুসী হলেন। তারপরে নটনারায়ণ হুকুম দিলেন "জমাদার লীললাল সিং, পাহারাকো বন্দোবস্ত করো।" আমি "জো হুকুম" বলে, ঠাকুরবাড়ীর উত্তর দুয়ারে ছ-জন, দক্ষিণ দুয়ারে ছ-জন, পশ্চিম দুয়ারে ছ-জনকে মোতায়েন করে দিলুম। আর আমি দাঁড়ালুম চণ্ডীমণ্ডপের নীচে, যেখানে মাথার উপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে লেখা ছিল "None but the brave deserve the fair"। আর রামরঙ্গিলা সিংকে রাজাবাহাদুরের সুমুখে খাড়া করে দিলুম। আর কারণ সে ছোকরা ছিল বহুৎ খবসুরৎ।

মিনিট পাঁচেক পরে নটনারায়ণের হুকুমে একটা বাবরিচুলো ছোকরা-ভাণ্ডারী মহা শঙ্খধ্বনি করলে, আর তৎক্ষণাৎ অন্দরমহলের দুয়ার দিয়ে মালশ্রী চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলেন, বিয়ের কনে সেজে। দেখলুম তার বিশেষ কিছু বদল হয়নি, সুধু লম্বায় একটু বেড়েছে, আর গায়ের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। সঙ্গে আছেন একটি মহিলা, যেমন বেঁটে তেমনি রোগা, যেমন কালো তেমনি ফ্যাকাসে,—এক কথায় শ্রীমতী মূর্ত্তিমতী dyspepsia। তার হাতে একখানা সোনার থালার উপরে একটি বেল ফুলের গোড়েমালা। পরে শুনেছি ইনি হচ্ছেন মিস্ বিশ্বাস জাত খৃষ্টান, পাস M. A., মালার নতুন মাষ্টারণী। মালা এসে প্রথমে এক নজরে সভাটি দেখে নিলে, তারপর মিস্ বিশ্বাসকে কি ইঙ্গিত করলে। আর মিস্ বিশ্বাস একমুখ হেসে অগ্রসর হ'তে সুরু করলেন।

প্রথমেই তিনি ব্যাটধারীর সুমুখে দাঁড়িয়ে মালশ্রীকে সম্বোধন করে বললেন—

এই বীর যুবকদের কুলশীলের পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। রাজাবাহাদুর যে সমান ঘর থেকে সমান বরের আমদানী করেছেন, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এদের রূপ তুমি নিজের চোখ দিয়ে দেখ, আর গুণ আমার মুখে শোনো। ইনি হচ্ছেন স্বনামধন্য বাট

লোকে ওঁকে দ্বিতীয় রঞ্জি। ঐ যে হাতে ব্যাট দেখছ, ওর স্পর্শে বল্ অসীমে চলে যায়। তুমি যদি ওঁকে বরণ করো ত উনি তার পরদিনই নববধূ কোলে করে বিলেত চলে যাবেন,—Lord's Cricket Ground-এ ম্যাচ খেলতে। আর উনি যখন Century-র পর Century করবেন, তখন স্বয়ং রাজা ওঁর handshake করবেন, ও রাণী তোমার।

এ সব শুনে মালশ্রী বললে—Advance। মিস্ বিশ্বাস অমনি দ্বিতীয় বীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—

ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য Goal-keeper ভূ-ভারতে নেই। ইনি বল ঠেকান সুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল ঊর্দ্ধশ্বাসে মরি-বাঁচি করে ছোটে, তখন এঁর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হ'য়ে যায়—অন্যের হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। তুমি যদি এঁকে বরণ করো ত ইনি তোমাকে ঐ অপূর্ব্ব ও অমূল্য মাথায় করে রাখ্‌বেন।

মালা আবার বললে—Advance।

মিস্ বিশ্বাস তৃতীয় বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে সুরু করলেন—ইনি হচ্ছেন ঘুসি ঘোষ। ঐ যে ওঁর দু'হাত জোড়া দুটো পাঁওরুটি রয়েছে, ও bread নয়—stone। ও-রুটি যার মুখে পড়ে, তার একসঙ্গে দাঁত ভাঙ্গে আর দাঁতকপাটি লাগে। তুমি যদি এঁকে বরণ করো তাহলে ঐ রুটির অন্তরে যে রক্তমাংসের হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তোমার পাণি গ্রহণ করবেন।

আবার শোনা গেল—Advance। মিস্ বিশ্বাস চতুর্থ বীরের সুমুখে দাঁড়িয়ে বললেন—উনি হচ্ছেন নগা নাগ, the world-famous hockey champion, আর তার লক্ষণ সব ওঁর দেহেই রয়েছে। ওঁর শরীর যে কাঠ হয়ে গিয়েছে সে শুধু দৌড়ে দৌড়ে, আর ওঁর বর্ণ যে মলিন শ্যাম, সে কতকটা, রোদে পুড়ে আর অনেকটা রাঁচির কোল-জাতীয় হকি-খেলোয়াড়দের ছোঁয়াচ লেগে। মহাবীরের রূপ এইরকমই হয়। তাদের দেহের গুণ রূপকে ছাপিয়ে ওঠে।

জোর গলায় হুকুম এল—Advance.

মিস্ বিশ্বাস পঞ্চম বীরের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—এঁর নাম খঞ্জন মিত্তির। Tennis ground-এ ইনি খঞ্জনের মত লাফিয়ে বেড়ান বলে, লোকে এঁর পিতৃদত্ত নাম রঞ্জন দশে খঞ্জন করেছে। এঁর চেহারাটা যে একটু মেয়েলিগোছের, তার কারণ টেনিস খেলায় ভীমের মত বলের দরকার নেই, কৃষ্ণের মত ছলই যথেষ্ট। এ খেলায় muscle চাইনে, চাই শুধু nerve।

মালা বললে—Advance। অতঃপর মিস্ বিশ্বাস লিপিবীরের সুমুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—

ইনি হচ্ছেন বীর নৃসিংহ ভঞ্জ, প্রসিদ্ধ "তেজপত্রে"র সম্পাদক। প্রথমে ইনি ছিলেন গত সবুজপত্রের সহকারী সম্পাদক, যে কাগজে বীরবলের ব্যঙ্গের ভয়ে ইনি মন খুলে হাত ঝেড়ে লিখতে পারেন নি। পরে সে পত্র যখন শুকিয়ে ঝরে গেল, তখন ইনি তেজপত্র প্রকাশিত করলেন। সে পত্র যে কতদূর তেজপূর্ণ, তা ত তুমি জানো, কারণ তুমি তা পড়েছ। তার দু' ছত্র পড়লেই পাঠকের শিরায় উপশিরায় ধমনীতে উপধমনীতে রক্তের স্রোত উজান বইতে বইতে তার মাথায় চড়ে যায়। তখন পাঠকের অন্তরে আর ধৈর্য্য থাকে না, উথলে ওঠে সুধু বীর্য্য। The pen is mightier than the sword, এ কথা যে সত্য—তা হাতে কলমে প্রমাণ করেছে ওঁর হাতের ঐ কলমটী।

মালা হুকুম করলে—Forward।

মিস্ বিশ্বাস হাতে সোনার থালা ও ফুলের মালা নিয়ে শেষ কর্ম্মবীর ও প্রথম জ্ঞানবীরের মধ্যে যে হাত দশেক ব্যবধান ছিল ধীরে ধীরে তা অতিক্রম করতে লাগলেন, এদিকে মালশ্রী দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে নিজের গলার মুক্তোর হার খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। তারপর আমার বাঁ পাশে এসে আমার বাঁ হাত ধরে দাঁড়ালে। আর আমি আমার অসি খাপমুক্ত করতে বাধ্য হলুম। এ ব্যাপার দেখে সভা সুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হয়ে গেল। কারও মুখে টুঁ শব্দটি নেই। তারপর হঠাৎ রামরঙ্গিলা ছোকরা চীৎকার করে তার ভাই ব্রদ্রীকে জানালে, 'মালা হামলোককা মিল গিয়া, আর এইসা তেইসা মালা নেই—একদম মোতিকো মালা'। অমনি রাম সিংদের দল সমস্বরে চীৎকার করে উঠল "জয় লীললাল সিংকো জয়"!

রাজাবাহাদুর এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। আমার দলবলের এই ক্ষত্রিয়োচিত জয়জয়কার শুনে তিনি বললেন—

"ই বাৎ হো নেই সেক্তা"।

রামরঙ্গিলা অমনি বললে—

"অগর হো নেই সেক্তা তো হুয়া কৈসে ?"

আমি তখন তার দিকে তাকিয়ে বললুম "তোম্ চুপ রহো"। আর রাজাসাহেবকে সম্বোধন করে বললুম—"হুজুর, ইনকো লেড়কপন্কা চঞ্চলতা মাপ কিজিয়ে"। অমনি আবার সব চুপ হয়ে গেল।

তখন রাজাবাহাদুর বীরের দলকে সম্বোধন করে বললেন :—

"হে বীরগণ, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য করো। এই দরওয়ান বেটার হাত থেকে মালাকে ছিনিয়ে নেও।"

এ কথা শুনে কর্ম্মবীররা চুপ করে রইলেন, কিন্তু জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন উঠে বললেন—

"মহাশয়, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নেই। আপনার মেয়ে ত আমাদের প্রত্যাখ্যান করেনি, করেছে কর্ম্মবীরদের, ওঁরাই এখন যথা কর্ত্তব্য করুন।"

কর্ম্মবীররাও নড়বার চড়বার কোনও লক্ষণ দেখালেন না। সুধু লিপিবীর বাঁ হাত দিয়ে মিস্ বিশ্বাসের অঞ্চল ধরে পাশের বীরকে ঠেলতে লাগলেন। লিপিবীরের ঠেলাতে অস্থির হয়ে খঞ্জন মিস্তির উঠে বললেন—

"রাজাবাহাদুর, এত playground নয়—battlefield। আমরা নিরস্ত্র, ওরা সশস্ত্র ; আমাদের হাতে আছে শুধু ব্যাটবল, আর ওদের হাতে আছে তলওয়ার। এ অবস্থায় আমরা যুদ্ধং দেহী বলতে পারি নে। এই দু'মিনিট আগে শুনলুম—Pen is mightier than the sword ;—তা যদি হয় ত তেজপত্রের সম্পাদক কলম হাতে নিয়ে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।"

ঐ প্রস্তাবে লিপিবীর মিস্ বিশ্বাসের পিছনে আশ্রয় নিলে।

এই সব ব্যাপার দেখেশুনে মালা আমার কানে কানে বললে—"দেখলে বাবার ফরমায়েসী বীরের দল ?"

তারপর রাজাবাহাদুর বললেন, "দেখছি তোমাদের দ্বারা কিছু হবে না, আমার মেয়ে আমিই উদ্ধার করব।" এর পর তিনি নটনারায়ণের কানে কানে কি বললেন। সে অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর মিনিট খানেকের মধ্যে লেঠেলের সর্দ্দারকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রাজাবাহাদুর বললেন, "যাও সরিতুল্লা, যাও। তোমরা গিয়ে ডাক ছাড়ো, তারপর যেমন যেমন দরকার হবে তেমনি হুকুম দেব।" সরিতুল্লা "হুজুর মালিক" বলে রাজাবাহাদুরের পায়ের ধূলো জিভে ঠেকিয়ে চলে গেল। সে বেরিয়ে যাবা মাত্র লেঠেলরা সকলে গলা মিলিয়ে "লা আল্লা ইল আল্লা মহম্মদ রসুল-উ-উ-উ-উ-ল" বলে ভীষণ জিগির ছাড়লে,—যেন মনে হল এইবার সভায় ডাকাত পড়বে। আর তাই শুনে রামসিংদের দল "সীতাপতি রামচন্দ্রজিকো জয়" বলে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। মনে হল, এইবার দুইদলে বুঝি যুদ্ধ বাধে।

জ্ঞানবীরদের মধ্যে একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে রাজাবাহাদুরকে বললেন—"মহাশয় করছেন কি, একটা হিন্দু

মুসলমানের riot বাধাবেন না কি? এমন জান্‌লে ত এখানে কখনো আসতুম না, এখন বেরতে পারলে বাঁচি। যা করতে হয় করুন, কিন্তু non-violent উপায়ে।" রাজাবাহাদুর উত্তর করলেন—"শান্ত উপায় অবলম্বন করতে আমি সদাই প্রস্তুত, অবশ্য তা যদি ক্ষাত্রধর্ম্মের অবিরোধী হয়।" আমি দেখলুম আর বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা কিছু নয়। অমনি আমার দলবলকে হুকুম দিলুম বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে। যেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, অমনি আমি আমার মাথার পাগড়ি ও কোমরের বেল্ট খুলে ফেললুম। রাজাবাহাদুর আমার দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—"কে, নীললোহিত নাকি?" আমি বললুম "আজ্ঞে আমি নীললোহিত শর্ম্মা।" আমার পরিচয় পেয়েই বাসু বোস, ঘুসি ঘোষ, নেড়া দত্ত, নগা নাগ ও খঞ্জন মিত্র সমস্বরে চীৎকার করে উঠল,—"Three cheers for the conquering hero", তারপর হুরে হুরে শব্দে সভাগৃহ কেঁপে উঠল। দেখলুম এরা সত্যসত্যই sportsmen বটে। এদের মধ্যে একমাত্র লিপিবীর ক্রোধকম্পান্বিতকলেবর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন—"এ মূর্খের দলে আমার ঢোকাই ভুল হয়েছিল। রাজা-বাহাদুরের মত বাঙালীদের আজও এ জ্ঞান হয়নি যে, গোঁয়ার ও বীর এক জিনিষ নয়। যাই একবার কলকাতায় ফিরে, এ বিষয়ে একটি চুটিয়ে আর্টিকেল লিখব"। তিনি মনের আক্ষেপ এই ক'টি কথায় প্রকাশ করে, দ্রুতপদে জ্ঞানবীরদের কাছে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে তাদের কানে কি মন্ত্র দিতে লাগলেন।

একটু পরে রাজাবাহাদুর অতি ধীর গম্ভীর বুনিয়াদী গলায় বললেন—

"আমার মেয়ে যখন স্বেচ্ছায় স্বয়ং তোমাকে বরণ করেছে, তখন এ বিবাহে আমার কোন ন্যায্য আপত্তি থাকতে পারে না। আমি শুধু ভাবছি, তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান আর মালশ্রী ক্ষত্রিয়-কন্যা; সুতরাং এ বিবাহ কি শাস্ত্রসঙ্গত হবে?"

আমি বললুম—

পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়॥
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ, তথা তথা এই রঙ্গ॥

একথা শুনে জ্ঞানবীরদের দলের একজন দোজবরে D. L. দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—

"এ বিয়ে দিতে চান দিন, তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এইটুকু সুধু জেনে রাখবেন যে তা সম্পূর্ণ illegal হবে। মনুর মতেও তাই, মিতাক্ষরা মতেও তাই। উদ্বাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র authority নন, কারণ বিদ্যাসুন্দরকে কোনমতেই ধর্ম্মশাস্ত্র বলা যায় না। যদি এ বিষয়ে শেষ কথা আর সার কথা জানতে চান ত Sir Gurudas-এর Marriage & Stridhan পড়ুন। আর ও বই পড়া আপনার নিতান্ত দরকার, কারণ এ ক্ষেত্রে শুধু marriage নয়, স্ত্রীধনের কথা রয়েছে।"

আমি জবাব দিলুম, "শাস্ত্রফাস্ত্র জানিও নে, মানিও নে। কারণ

আমি যে হুই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে মালা ছাড়িবার নই॥
মোর মালা মোরে দেহ, মোর মালা মোরে দেহ,
জাতি লয়ে থাক তুমি, আমি যাই গেহ॥"

রাজাবাহাদুর আমার কথা শুনে থ হয়ে রইলেন। এর পর প্রমাণ পেলুম যে পটলডাঙ্গার পণ্ডিতরা ঘোর পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু গড়ের মাঠের খেলোয়াড়রা ঘোর মূর্খ নয়। শাস্ত্রজ্ঞান উভয়েরই প্রায় তুল্যমূল্য, আর শাস্ত্রের প্যাঁচ কাটাতে জানে কর্ম্মবীররা, আর জানে না জ্ঞানবীররা।

রাজাবাহাদুর উভয়সঙ্কটে পড়েছেন দেখে খঞ্জন মিত্তির চেঁচিয়ে বললেন—

"অনুলোম বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত। সুতরাং এ বিবাহ দিলে আপনার পণও রক্ষা হবে, জাতও রক্ষা হবে।"

রাজাবাহাদুর এই সুসংবাদ শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। D. L-টি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আইনের আর এক ফেঁকড়া তুললেন। তিনি বললেন—

"যদিচ ওরকম বিবাহ লোকাচারবিরুদ্ধ, তবুও তা শাস্ত্রসঙ্গত হতে পারে, যদি ওঁর পূর্ব্ববিবাহিত স্ত্রী ব্রাহ্মণী হন"।

রাজাবাহাদুর অমনি আমার দিকে চাইলেন। আমি বললুম, "আজ্ঞে আমার প্রথম স্ত্রী ত আমি স্বয়ম্বর সভা থেকে সংগ্রহ করিনি। সে সুধু ব্রাহ্মণী নয়, উপরন্তু কুলীন-কন্যা, লক্ষ্মীপাশার মেয়ে সুতরাং সপত্নীতে আপত্তি নেই।" যেই এ কথা বলা, অমনি মালশ্রী আমার হাত ছেড়ে দিয়ে বিদ্যুৎবেগে বাপের কাছে ছুটে গিয়ে বল্‌লে—

"এ বিবাহ আমি কিছুতেই করব না, প্রাণ গেলেও নয়। স্বামী নিয়ে partnership business!"

আমি বললুন—"মালশ্রী, আমি বিপদে পড়ে মিথ্যে কথা বলেছি। আমি যে কার্ত্তিক ছিলুন, সেই কার্ত্তিকই আছি"। মালশ্রী উত্তর করলে—

"তাহলে সেই কার্ত্তিকই থাকো। মিথ্যাবাদীকে আমি কিছুতেই বিবাহ করব না। প্রাণ গেলেও নয়"।

আমি বললুম—"তাই সই, আমি চিরকুমারই থাক্‌ব। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর।"

মালশ্রী ইতিমধ্যে দেখি রণচণ্ডী হয়ে উঠেছে। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চীৎকার করে বললে—"আমিও চিরকুমারী হয়ে থাকব। এরপর আমি পুরুষ-বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে নারী-আন্দোলনে যোগ দেব।"

এই কথা বলেই সে ডুক্‌রে কেঁদে উঠল।

এরপর আমি সটান ষ্টেশনে চলে গেলুম, একেলা হেঁটে নয়, মোটর গাড়ীতে নটনারায়ণের সঙ্গে।

রূপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "মালার কি হল?" নীললোহিত উত্তর করলেন—"সে খোঁজ তুমি করোগে। আমি ঘটক নই।" এর পর রসিকলাল জিজ্ঞাসা করলেন—"আর মোতির মালাটা?" নীললোহিত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—

"সেটি তোমার চাই নাকি? তুমি দেখছি রাম-রঙ্গিলার মাসতুতো ভাই। মালা গেল তাতে দুঃখ নেই, মোতির মালা হারাল এইটেই হচ্ছে জবর ট্রাজেডি। বাঙালী জাতটে হাড়ে ছিবলে। কোনও serious জিনিষ তোমরা ভাবতেও পারো না, বুঝতেও পারো না। তোমাদের উপযুক্ত সাহিত্য হচ্ছে প্রহসন। যাও সকলে মিলে পড়ো গিয়ে 'বিবাহ বিভ্রাট'।"

এই শেষ কথা বলে নীললোহিত কপালে হাত দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, মাথার ঘাম কি চোখের জল মুছতে মুছতে, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমরা সকলে হো হো করে হেসে উঠলুম। কারণ নীললোহিতের ধমক সত্বেও ব্যাপারটাকে ট্রাজেডি বলে আমরা বুঝতে পারলুম না, আমাদের মনে হল, ওটি একটি roaring farce।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ফরাসী জীবন

ইংরাজের আদবকায়দা আমরা যে বহু পরিমাণে অঙ্গীকার করে নিয়েছি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাঁদের সুসংস্কারগুলি মজ্জায় পেয়ে থাকি আর না থাকি তাঁদের কুসংস্কারের ভূত আমাদের ঘাড়ে পুরো মাত্রায় চেপে বসেছে—তাই অনেক স্থলেই আমরা আজও অন্য জাতির চরিত্র বিচার করতে গিয়ে ইংরাজের চোখেই করে থাকি। ফলে নিজেদেরই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। সেই জন্যই আমাদের অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিতদেরও বলতে বাধে না—"London is London"। অর্থাৎ লণ্ডনের মত স্থান দুনিয়ায় নেই—আর সেখানে যে শিক্ষালাভ করা যায় সে শিক্ষা নাকি কোথাও মেলে না।

ফরাসী জাতি-সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা হ'য়ে গেছে—তাঁদের দেশ নাকি শুধু স্ফূর্ত্তি করবার স্থান—শিক্ষার স্থান নয়—তাই আমাদের দেশের ছেলেরা সেখানে গেলেই নাকি বয়ে যায়। এ ধারণাও আমরা ইংরাজের কাছ থেকে পেয়েছি। ইংরাজ যখন ফরাসীদেশে পৌছায় তখন সে তা'র অভ্যস্ত রীতিগুলি না দেখ্‌তে পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়। কারণ ফরাসীদেশে গাড়ী ঘোড়া রাস্তার বাঁয়ে না গিয়ে ডাইনে যায়,—বাড়ীর জানালাগুলি ভিতরে না খুলে বাইরে খোলে আর সব জানালাতেই শার্সি থাকে। প্যারিসের মত বড় শহরেও বাড়ীগুলি বেশির ভাগ চক্‌-মিলানো—আর তা'র মাঝখানে উঠান। বাড়ীর নীচুতলায় দোকান, উপরে নানা পরিবারের বাস। আর সমস্ত বাড়ীটার উপর নজর রাখবার জন্য দরজার নিকট ঘর নিয়ে থাকে Concierge। ফরাসীরা কেউ সকালে breakfast খায় না—দুপুরে lunch খেতে সবাই ঘরে ফিরে আসে। যখন তা'রা গল্প করতে চায় তখন "কাফে"-তে একটা drink নিয়ে দু'ঘন্টা বসে কাটিয়ে দেয়। নিজের দেশের বিপরীত এই সব রীতি ইংরাজের ভাল লাগে না—আর প্যারিসের হোটেলে সকালে যখন সে পুরা পেট breakfast পায় না তখন তা'র মন আরও চটে যায়। অথচ ইংলণ্ড ও হল্যাণ্ড ছাড়া ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই সব রীতির চল্‌তি।

ফরাসীদের সম্বন্ধে ইংরাজের কুসংস্কার দূর করবার জন্য সম্প্রতি এক ইংরাজই কলম ধরেছেন। এঁর নাম ফিলিপ কার।* বিশ বৎসরের উপর ফরাসীদেশের শহরে ও গ্রামে বাস করে তিনি ফরাসী-চরিত্রের একটা যথাযথ ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। দু'শ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বইয়ে তিনি ফরাসী জাতির চরিত্র নানাদিক থেকে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে ফরাসী-চরিত্র-সম্বন্ধে ইংরাজের যে-সব কুসংস্কার,

* Philip Carr—*The French at Home;* Methuen & Co., London, 1930.

তা'র মূলে রয়েছে তা'র নিজের অহমিকা ও অন্য জাতির চরিত্রবোধের অক্ষমতা। অবশ্য ফরাসী জাতির চরিত্র যে নির্দ্দোষ তা'ও তিনি বলেন না—তবে সে-সব দোষ সার্ব্বজনীন।

ফরাসীর সম্বন্ধে ইংরাজ মনে করে যে, সে স্ফূর্ত্তিপ্রিয়, চরিত্রহীন, কুঁড়ে, জোচ্চোর ও নোংরা। এ-সব দোষ যে-কোন জাতির চরিত্রেই মারাত্মক এবং ইংরাজের এই অভিযোগ মেনে নিলে ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে নিরাশ হ'তে হয়—আর তা'র বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসও দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এ জাতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্‌লে দেখা যায় যে ইংরাজের ও-সব অভিযোগের একটীও সত্য নয়। ফরাসী জাতি স্ফূর্ত্তিপ্রিয় বটে—কিন্তু তা'র স্ফূর্ত্তির ভিতর যে স্বচ্ছন্দতা ও সহজভাব আছে তা' অন্যত্র দুর্লভ। এই স্বচ্ছন্দভাবই তা'র চরিত্রের বিশেষ গুণ। কিন্তু স্ফূর্ত্তিপ্রিয় বলেই সে চপল-স্বভাব এ কথা বলা চলে না। সে যে ধীরভাবে কষ্টসাধ্য কাজ করতে সক্ষম তা'র বহু প্রমাণ ফরাসী শিল্প, কলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই রয়েছে। এ-সব বিষয়ে তা'র মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সারা জগতই মেনে নিয়েছে। ফরাসী জাতির নৈতিক চরিত্র-সম্বন্ধেও ইংরাজের যা' ধারণা তা'র মূলেও রয়েছে অহমিকা। ইংরাজ তা'র নিজের দেশের আবর্জ্জনাকে যেমন ধামাচাপা দিয়ে রাখতে চায় ফরাসী তা' পারে না। বড় শহরের যে-সব আবর্জ্জনাকে কেউ কখনো দূর করতে পারে নি, সেগুলিকে বরং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে লোককে সাবধান করে দেওয়াই সে পছন্দ করে। তাই প্যারিসের যে-সব নাট্যশালা সুরুচি-সম্মত নয় সেখানে সত্যকার ফরাসীদের বড় একটা দেখা যায় না—সেগুলি রুচিবাগীশ ইংরাজ ও আমেরিকানদের কলধ্বনিতেই মুখরিত। তাই বলে ফরাসীরা সকলেই যে শুকদেব, তা নয়—কারণ কোন জাতির সম্বন্ধেই সে কথা বলা চলে না। ফরাসীজাতির নৈতিক অবনতির আর একটা কারণ নাকি তা'র মদ খাওয়া। জলের বদলে ফরাসীরা মদ খায় বটে—কারণ তাঁদের দেশে বহু পরিমাণে আঙ্গুর জন্মায়—আর তা'রা সব চেয়ে ভাল মদও তৈরি করে। কিন্তু তাই বলে তা'দের ভিতর মাতলামি যে খুব বেশি একথা সত্য নয়—ইংরাজ তা' নিজেই স্বীকার করে; ফরাসীদেশের চেয়ে ইংলণ্ডেই মাতালের সংখ্যা অধিক। ফরাসীরা যে লোককে ঠকায় তা'র প্রমাণ শুধু তা'দের ব্যবসায়েই কিছু কিছু পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের পর থেকে ইংলণ্ড ও আমেরিকায়ও তা'র বহু প্রমাণ মিল্‌ছে। কিন্তু ফরাসীদেশে ছোটোখাটো দোকানদার ও গ্রামের চাষীদের ভিতর লোক-ঠকানো বিরল।

ফরাসীকে কুঁড়েমি করতে প্রায়ই দেখা যায়। তাই 'কাফে'-তে দু' এক ঘণ্টা সে আনন্দের সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু

যখন কুঁড়েমি করতে চায় তখনই সে তা' করে অন্য সময়ে করে না। তাই যখন সে কোন কাজ পাঁচ মিনিটে করবে বলে প্রতিশ্রুত হয় তখন সে কাজে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগায় না—আর কুঁড়েমি করবার ইচ্ছা থাক্‌লে "bonnes cinq minutes"—লাগ্‌বে বলে দেয়,—তখন তার কাজ পনেরো মিনিটের পূর্ব্বে শেষ হয় না। এর ভিতরে তা'র চরিত্রের স্বচ্ছন্দভাবই ফুটে ওঠে—মানুষকে সে যন্ত্র করতে চায়না। ফরাসী সৈন্য যখন অভিযান করে তখন তা'রা "লেফ্‌ট-রাইট" করে তালে তালে পা ফেলে চলে না—মানুষের মত স্বচ্ছন্দগতিতেই চলে। তাই বহুদূরের অভিযানে অন্যজাতির চেয়ে বেশি সক্ষম ও কষ্টসহিষ্ণু বলেই তা'দের খ্যাতি আছে।

ফরাসীকে ইংরাজ আর দুটী কারণে দেখতে পারে না—প্রথমতঃ সে বেশি কথা বলে, আর দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যবহারে সে কখনো অপ্রস্তুত হয় না। ফরাসী বেশি কথা বলে সত্য—কিন্তু তাই বলে সে কাজে অবহেলা করে না। সে বেশি কথা বল্‌লেও তার কথা কখনো এলোমেলো নয়। তা'র সব কথার ভিতর যুক্তির আভাস পেয়েই ইংরাজ অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। ফরাসীর এই বেশি কথা বল্‌বার প্রবৃত্তিতে আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর ফরাসী ভাষায় এমন একটা বাঁধুনী আছে যে সে ভাষায় কথা কইতে গেলে ভাসা-ভাসা কথা বলা সম্ভব হয় না। সেই জন্যই ঐ ভাষা এককালে সারা ইউরোপে lingua franca হ'য়ে উঠেছিল—আর আন্তর্জাতিক যত কিছু সন্ধিসর্ত্ত করা হ'ত বা এখনও হয় তা' ফরাসী ভাষায়ই লেখা হয়—কারণ সে ভাষায় কোন বাক্য দ্ব্যর্থ-বোধক নয়। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসীকে কখনও অপ্রস্তুত হ'তে দেখা যায় না—সকলের সঙ্গেই সে সহজভাবে ব্যবহার করতে জানে। কিন্তু তা'র ব্যবহারের এই স্বচ্ছন্দভাবকে অস্বাভাবিক মনে করে তা'র স্বভাবে একটা কৃত্রিমতার দোষ আরোপ করা ইংরাজের অভ্যাস। কিন্তু ফরাসীচরিত্র ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সামাজিক ব্যবহারে তা'র এই স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে রয়েছে অহমিকার সম্পূর্ণ অভাব। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্যবাদও যে এর মূলে নেই তা' মনে হয় না। সামাজিক ব্যবহারে ফরাসী চরিত্রের এই সমভাব খুব প্রাচীন—মলিয়েরের নাটকেই তা' স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ফরাসী-বিপ্লবের তিনটী মূল-সূত্র হচ্ছে—Liberté, Egalité ও Fraternité, মৈত্রী, সাম্য ও স্বাধীনতা। সত্য কথা বল্‌তে ফরাসীরা মৈত্রী ও স্বাধীনতার তোয়াক্কা না রাখলেও, সাম্যের উপর তাদের পূরাদস্তুর ঝোঁক আছে। সেই জন্যই ফরাসীদেশে Lord, Sir, প্রভৃতির বালাই নেই—Baron, Duke দু'একজন থাক্‌লেও তাঁরা কোণ-ঠেসা হ'য়ে থাকেন—

নিজেদের গণ্ডির বাইরে মুখ দেখান না? Monsieur-র বেশি খেতাব কারো নেই—আর দেশের ও দশের কাজের জন্য কেউ যদি সরকার থেকে বিশেষ সম্মান (Legion d'honneur) পান তবে সে সম্মান সাধারণতঃ কাগজে-কলমেই আবদ্ধ থাকে। এবং সরকারের দেওয়া রঙীন ফিতেও ঘরে তোলা থাকে কারণ তা' প'রে বেরুলে লোকে নিন্দা ব্যতীত প্রশংসা করে না। ফরাসীদেশে এই সাম্যভাব আছে বলেই 'রেস্তোর্'াতে (Restaurant) বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও কলের মজুর এক টেবিলে বসে খায়—আর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে নামজাদা অধ্যাপকও লাইব্রেরীতে ঢুকে টুপি তুলে বেয়ারাকে অভিবাদন জানান ও তার করমর্দ্দন করেন।

ফরাসীর পারিবারিক জীবনই হচ্ছে সব চেয়ে প্রশংসার যোগ্য। ফরাসী স্বভাবতঃ স্বার্থপর হ'লেও নিজের পরিবারের জন্য যে কতটা স্বার্থত্যাগ করতে পারে তা ইংরাজ কল্পনাতেও আন্‌তে পারে না। এই জন্যই সে মিতব্যয়ী—বাইরে না খেয়ে ঘরে এসে যা জোটে তাই খায়। এই পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে স্ত্রীজাতি। ফরাসী আইন ও রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির কোন পৃথক সত্তা না থাক্‌লেও পারিবারিক ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণে তা'র স্থান খুব উঁচুতে। ইংরাজ যখন তা'র "family"-র কথা বলে তখন সে তা'র নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথাই ভাবে। বিয়ে না করা অবধি কোন পারিবারিক কর্ত্তব্যের কথা তা'র মনে হয় না কিন্তু ফরাসী যখন "famille"-এর কথা বলে তখন নিজের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে ব্যতীত তা'র ভাই বোন ও পিতামাতার কথাও ভাবে। সুতরাং বিয়ের পূর্ব্বেও তা'র পারিবারিক টান থাকে আর সেই পরিবারের কেউ শারীরিক অক্ষমতার জন্য সংসার চালাতে না পারলে তা'র সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জ্ঞানের কিছু অভাব হয় না। ফরাসীদেশে আইনের ও সমাজের চোখে এখনো Conseil de famille (অর্থাৎ পারিবারিক মন্ত্রণা-পরিষদ) উঁচু স্থান অধিকার করে। নাবালক, উন্মাদ ও অসমর্থের ব্যবস্থা করতে হ'লে এই মন্ত্রণা-পরিষদকেই আহ্বান করা হয়। আদালতের জজ (Juge de paix) মাতামহ-বংশের তিনজন ও পিতামহ-বংশের তিনজনকে ডেকে পরিষদ সংগঠন করেন এবং এই পরিষদই সব ব্যবস্থা করে দেয়। সামাজিক জীবনে এই পরিবারকেই unit ধরা হয়। তাই কোন পরিবারে যখন কেউ মারা যায় তখন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের সে খবর দেবার জন্য যে চিঠি বিলি করা হয় তা'তে যে শুধু মৃতের স্ত্রীরই সই থাকে তা' নয়—তা'র ছেলে, মেয়ে, ভাই ও তা'র পিতামহ ও মাতামহবংশের নামও থাকে। পরিবারের এই প্রভাবের জন্য সকল ছেলে-মেয়েই পৈতৃক সম্পত্তিতে

সমান অধিকারী এবং কেউ তা'র প্রাপ্য অংশের চেয়ে বেশি পেতে পারে না। ছেলেমেয়েদের বিবাহের ব্যাপারে এখনো পিতামাতার হাত আছে। গ্রামে এখনো বিবাহিত মেয়ের মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়—যে তা'র মা-ই তা'র জন্য ভাল 'বর' বেছে দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবিবাহিত মেয়েরা এখনো গ্রামে বা শহরে কোথাও স্বেচ্ছাচার করতে পায় না। বাইরে যেতে হ'লে তা'রা একা যায় না—আত্মীয় বা অভিভাবকের সঙ্গেই যেতে হয়। বিবাহের পরও তারা বড় একটা স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায় না—দক্ষতার ও সুব্যবস্থার সঙ্গে গৃহকর্ম্ম চালানোই তা'দের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। সেই জন্যই নাগরিক জীবনে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তাই বলে যে মেয়েরা ফরাসীদেশে কোন স্বাধীন ব্যবসায় করে না তা' নয়—তাদের ভিতরও ডাক্তার, কাগজের সম্পাদক, জর্ণালিষ্ট ও এডভোকেট (Avocat) দেখা যায়। বস্তুতঃ ফরাসীদেশেই সর্ব্বপ্রথম মেয়েদের ভিতর এডভোকেট হ'য়েছিল। এ ছাড়া শহরের নানা দোকান ও আফিসে বহু মেয়েরা কাজ করে।

ফরাসীদের পারিবারিক জীবনে এই দৃঢ় বন্ধন আছে বলেই সামাজিক বিনয়-ব্যবহার তা'রা অল্প বয়স থেকেই শেখে। বিনা কারণে লোকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার না করাই যদি ভদ্রতার লক্ষণ হয় তা'হলে সকল ফরাসীকেই ভদ্রলোক বলতে হবে; কিন্তু চেহারায় চালচলনে, কাপড়-চোপড়ে একটা আভিজাত্যের ছাপ ও নাগরিকতার বিশিষ্ট ভাণ না-থাক্‌লে ও কথাবার্ত্তা বেশ কায়দাদুরোস্ত না-হ'লে যদি কেউ ভদ্রলোক না হ'ন—তাহ'লে ভদ্রলোকের অস্তিত্ব ফরাসীদেশে নেই বল্‌লেই চলে। ফরাসীদেশে গ্রাম ও শহরে এমন কাউকে দেখা যায় না যে লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে জানে না, এই ব্যবহার সে পারিবারিক জীবনে ছোটবেলা থেকেই শেখে আর এই হচ্ছে তা'র সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে তা'র আন্তরিকতা। তাই ইংরাজ যখন Thank you বা তা'র অপভ্রংশ শুধু—"kiu" বলে তখন তা'র মুখে কোন ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ফরাসী যখন merci bien বা merci beaucoup বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তখন তা'র মুখে যে একটা মধুর ভাব ফুটে ওঠে তা' তা'র সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই দেখেছেন। এই আন্তরিকতা আছে বলেই ফরাসীভাষায় এখনও মধ্যমপুরুষের একবচন অর্থাৎ tu—"তুমি বা তুই" টি'কে আছে। ইতালীর লোকেরা ফরাসীদেশকে —le pays du compliment বলে ঠাট্টা করে থাকে। ফরাসীজাতি অন্যকে compliment দিতে জানে—আর সেটা আন্তরিক ভাবেই যে দিয়ে থাকে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না।

ফরাসীরা কা'কে কি ভাবে সম্বোধন করতে হ'বে তা জানে। তাই চিঠিতে আন্তরিকভাবে পরিচিত না হ'লে—শুধু Monsieur, বেশি পরিচিত হ'লে—Cher Monsieur, ও বিশেষ হৃদ্যতা থাক্‌লে—Cher Monsieur Dutt পাঠ লিখ্‌বে, আর ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে Bien Cher Dutt পাঠ লিখে থাকে। তাই ফরাসীরা নিকট আত্মীয় বা বন্ধু ব্যতীত অন্যের কথার জবাবে "হাঁ" বা "না" বলতে হ'লে—"Oui" বা "Non" দিয়ে সারে না—তা'র সঙ্গে একটা Monsieur জুড়ে দেয়।

ফরাসীর বিনয়-ব্যবহার ও সাম্যজ্ঞানই তার জাতীয় ঐক্যের মূলসূত্র। ফরাসীদেশের সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত ন'ন তাঁরা মনে করেন যে শহরে ও বাইরে ফরাসীর চরিত্র এক নয় এবং তা'দের ভিতর কোন যোগাযোগ নেই। সব ফরাসীর ভিতরই যে একটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে তা নয়, তা'দের অনেকের উৎপত্তি-স্থান বিভিন্ন। তাই বাইরের থেকে দেখ্‌লে মনে হয় বৃটানী ও প্রভাঁস (Provence দক্ষিণ ফ্রান্স) এর আলসাস্‌-লোরেন (Alsace-Loraine) ও পিরিনিজ (Pyrenees)-এর বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। আকৃতি ও চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটিতে ওই সব দেশবাসীদের ভিতরে বহু পার্থক্য ধরা পড়ে তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু প্রকৃতিগত একটা বড় ঐক্যও তাদের মধ্যে দেখা যায় সেই ঐক্যই হচ্ছে ফরাসী সভ্যতা। তাই রেনাঁ (Ernest Renan) পূরাদস্তুর বৃটন ও দোদে (Alfonse Daudet) প্রভাঁসের (Provence) লোক হয়েও ফরাসী সাহিত্যিকদের শীর্ষস্থানীয়।

অন্যান্য দেশে রাজধানী জাতীয় জীবনের যতটা কেন্দ্র হোক্‌ বা না হোক্‌ প্যারিস যে পূরামাত্রাতেই ফরাসী জীবনের কেন্দ্র তা'তে সন্দেহ নেই। শুধু প্যারিসের লোকেরাই তাই ভাবে না সমস্ত ফরাসীজাতিই প্যারিসকে সেই চোখে দেখে। প্যারিস ফরাসীজাতির শিক্ষা, শিল্প, রাজনীতি ও শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পূর্ণভাবেই কেন্দ্রস্থানীয়। তা' ছাড়া বাইরের থেকে দেখ্‌লেও প্যারিসের ভিতরেও ফরাসীদেশের গ্রামজীবনের অনেক হাবভাব চোখে পড়ে।

গ্রাম থেকে প্যারিসে এসে যাঁরা বসবাস করেন তাঁ'রাই সে হাবভাব বজায় রাখেন। প্যারিস যাঁরা ওপর ওপর দেখেছেন অর্থাৎ মোঁমার্তের (Montmarte) নাচঘর ও রেস্তোরাঁ, ল্যাটিন কোয়ার্টার (Quartier Latin) ও মোঁপার্নাসের (Montparnasse) কাফেগুলি দেখে যাঁরা প্যারিস দেখার গর্ব্ব করেন তাঁরা প্যারিসের যা' সত্যকার ফরাসী জীবন তা' যে দেখেন নি এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। কারণ নাচ গানে ভরা এই সব কাফে ছেড়ে শহরেরটু এক ভিতরে ঢুক্‌লেই দেখতে

পাওয়া যায় যে সত্যকার ফরাসী নিঃশব্দে তা'র কাজ করে যাচ্ছে—তা'র ভিতর দিয়ে যে প্রাণ-প্রবাহ চলেছে সেই প্রবাহই ফরাসীজাতির নিজস্ব—ও সেইখানেই গ্রাম ও শহরের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ।

সহর ও গ্রামের ভিতর এই যোগাযোগ আছে বলেই ফরাসীরা প্যারিসকে লণ্ডন বা নিউ ইয়র্ক হ'তে দেয় নি। রাস্তাগুলির এখনো দু'ধারে কখনো বা মাঝখানে এখনো সবুজ গাছের সার দেখা যায়—অনেক রাস্তায় এখনো ফেরিওয়ালা হাঁক দিয়ে তা'র জিনিষ বিক্রি করে যায়—আর জাতীয় উৎসবের দিন রাস্তার উপর এখনো নাচ গান হয়—ও সেই উপলক্ষে রাস্তার দু'ধারে যে মেলা বসে তা' একমাসেও ভাঙে না।

তাই বাইরের চেহারায় সত্যকার প্যারিস বিদেশীকে বড় একটা চমক লাগাতে পারে না—ছ'তলার বেশি উঁচু বাড়ী প্যারিসে নেই—এবং দু'বছর পূর্ব্বেও প্যারিসের সীমান্ত সাঁসিরে (St. Cyr) যখন প্রথম দশতলা বাড়ী তৈরি সুরু হয়েছিল তখন মিউনিসিপালিটীই সে বাড়ী তৈরি বন্ধ ক'রে দেয়। প্যারিসের সব চেয়ে বড় ও প্রাচীন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হচ্ছে—কলেজ দ' ফ্রাঁস্‌—(College de France)। ফরাসী দেশের সব চেয়ে নামজাদা পণ্ডিতেরাই এখানকার অধ্যাপক কিন্তু তাঁ'রা এখনো একটা পুরানো দোতলা বাড়ীর এঁধো ঘরেতেই ক্লাস করে থাকেন। প্যারিস শহরে এই বাইরের আড়ম্বরের অভাব দেখেই ইংরাজ ও আমেরিকানের মন চটে যায় আর তা'রা মনে করে Paris is dirty। প্যারিসকে ভেঙে চুরে নিউইয়র্ক করায় ফরাসী জাতির এই অনিচ্ছার মূলে রয়েছে তা'র বহুদিনের সঞ্চিত সৌন্দর্য্যবোধ। প্যারিসের অনেক জিনিষ বিদেশীর পছন্দ না হ'লেও সকলেই প্রায় স্বীকার করে—যে প্যারিস সুন্দর। মিউনিসিপালিটীর কমিটি নক্সা করে বড় বড় রাস্তা ও Sky-scrapper তৈরি করে দিলেই কোন শহর সুন্দর হয় না—শহরকে সুন্দর করতে হ'লে চাই নাগরিকের বহুশতাব্দীর মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান। সেই জন্যই প্যারিসের যে এফেল টাওয়ার (Tour Eiffel) দেখে বিদেশী বলে "সাবাস্‌", ফরাসী তা'কে তা'র কদর্য্য কুকীর্ত্তি বলেই মনে করে।

প্যারিস ও বাইরের ফরাসীদের ভিতর নিকট সম্বন্ধের আর একটা কারণ হচ্ছে তাদের কৃষি। ফরাসী দেশকে কৃষকের দেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ নাগরিকের চেয়ে কৃষকের সংখ্যা তাতে অনেক বেশি। এই কৃষকেরা তা'দের জমির ফসল ও তরি-তরকারি নিজেরাই শহরে আমদানি করে। আর শহরের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ভিতর

অনেকেরই গ্রামে এক টুক্‌রা জমি আছে—ছুটী পেলেই তা'রা [illegible] যায়, আর বৃদ্ধ-বয়সে অবসর নেবার পর গ্রামের জমিই তাদের [illegible] অবলম্বন হয়। তা' ছাড়া গ্রামের কৃষকদের ভিতর থেকেই ফরাসী[illegible] অনেক বড় লোক পেয়েছে। ক্লেমাঁসোর (Clemenceaux) পিতা [illegible] ছিলেন বটে—কিন্তু তাঁর পিতামহ গ্রামের কৃষক—ফশের (Fo[illegible] জন্ম দরিদ্র পরিবারে—আর জোফ্রের (Joffre) পিতামাতা [illegible] কৃষক। জাঁ জরেস্ (Jean Jaures), ব্রিয়াঁ (Briand) [illegible] (Herriot) প্রভৃতি স্বনামখ্যাত লোকেদেরও গ্রামের দরিদ্র পরিবারেই জ[illegible]

গ্রামের সঙ্গে শহরের নিকট-সম্বন্ধের আর একটা কারণ [illegible] ফরাসীদেশের শিক্ষাপদ্ধতি। ফরাসীদেশে খুব কম ছেলেমেয়ে[illegible] বোর্ডিঙে যায়। তারা শিক্ষার বয়সে সাধারণতঃ শহরে পিতামাতার নিক[illegible] থাকে—আর তাঁরা যদি শহরে রেখে তা'দের শিক্ষার ব্যবস্থা কর[illegible] অসমর্থ হন তাহ'লে তা'রা গ্রামে পিতামহ-পিতামহী বা অন্য কো[illegible] আত্মীয়ের নিকটে থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (Ecole communale) পড়াশুনা করে। সাধারণতঃ এগারো থেকে তেরো বৎসর বয়স পর্য্য[illegible] তা'রা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাটায়—তার পর certificat d'etudes নেবার পর নিজেদের পথ ঠিক করে নেয়। যা'দের আরও পড়াশুনা করব[illegible] সুবিধা থাকে তা'রা তাই করে—নতুবা তা'রা কোন কাজে লেগে যায়। ভাল ছেলেমেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে—এই বৃত্তি পেয়েই অনেক[illegible] শহরে কলেজের পড়াশুনা করতে পারে। কিন্তু শহরে এসেও গ্রামে[illegible] টান তাদের কমে না—শৈশবের মধুর স্মৃতি, গ্রামের লতাপাতা ফুলফলে[illegible] সঙ্গে তা'দের পাতানো সম্বন্ধ ও পিতামহ-পিতামহীর বা অন্যান্য আত্মীয়[illegible] স্বজনের স্নেহগ্রন্থী প্রভৃতির আকর্ষণে তা'রা প্রায়ই সেদিকে ছুটে যায়—এম[illegible] কি দু'একদিনের ছুটীতেও সেই স্মৃতিকেই কতকটা জাগিয়ে তুলবার জন্য তা'রা শহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামে বেড়াতে যায়—তাই প্যারিসের প্রান্তভাগে যে সব বন আছে—বোয়া দ' বুলঙ্ (Bois de Boulogne), ভ্যারসাই (Versailles) ও ফঁতেনব্ল (Fontainbleu) রবিবারে বা অন্য ছুটীর দিনে এদের কলধ্বনিতে ভরে ওঠে।

গ্রাম ও জমির সঙ্গে এই যোগ আছে বলে ফরাসীজাতি অন্যজাতির তুলনায় সুখী। কৃষিকার্য্যই তা'দের বড় সম্বল, কলকারখানা তা'দের থাক্‌লেও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিষের বড় বেশি তা'রা তৈরি করে না—তাই প্রাচ্যদেশের বাজারের ওপর তা'দের ততটা লোলুপ দৃষ্টি নেই। বিদেশের থেকে দেদার অর্থ আসে না বলেই তা'দের জীবনযাত্রার [illegible] অসহনীয় ভাবে বেড়ে ওঠে নি। তাই অন্যদেশের তুলনায় ফরাসীদেশে

সকলেরই মাইনে কম। প্যারিস মিউনিসিপ্যালিটীর সব চেয়ে বড় কর্ম্মচারী বছরে ৫৫০০৲ ও চীফ এঞ্জিনিয়ার ৪৫০০৲ টাকার বেশি মাইনে পায় না। সৈন্যবিভাগে Marshal of France বছরে প্রায় ১৬০০০৲ অর্থাৎ মাসে প্রায় তেরো শ টাকা ও General তা'র অর্দ্ধেক এবং সব বিভাগেই অধস্তন কর্ম্মচারীরা বছরে গড়ে দেড় হাজার টাকার বেশি পায় না। তাই প্যারিসের যে সব অধ্যাপক সব চেয়ে বেশি মাইনে পান তাঁরাও মোটরকার রাখবার কথা কল্পনাতেও আন্‌তে পারেন না। তাই বলে সেই সব অধ্যাপকেরা যে খুব কষ্টে দিনপাত করেন তা' নয়—কারণ সপ্তাহে একবার করে তাঁরা নিজেদের সব ছাত্রকেই বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে থাকেন।

* * *

ফরাসী চরিত্রের এই সব গুণ আছে বলেই কার (Carr) সাহেবের তা' ভাল লেগেছে এবং আমাদেরও তা' ভাল লাগে। ফরাসী চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যে বাঙ্গালীর চরিত্রে আছে তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ইংরাজ ও ফরাসী চরিত্রের প্রভেদ একটী গল্পে বেশ ফুটে উঠেছে। গাড়ীতে একজন ফরাসী ও একজন ইংরাজ পাশাপাশি যাচ্ছিল। দু'জনেই চুপ করে ছিল—কারণ বিনা পরিচয়ে ইংরাজ কারো সঙ্গে কথা বলে না। ফরাসী বেশিক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে পারে না। সিগারেটের আগুন ছিট্‌কে পড়ে ইংরাজের ট্রাউজার পুড়ছে দেখে সে বলে উঠ্‌লো, মশায়, আপনার ট্রাউজার পুড়ছে। ইংরাজ চটে উঠে তা'র উত্তরে বল্‌লো—মশায়, তা'তে আপনার কি? অনেকক্ষণ ধরে আপনার জামার পকেট পুড়ছে সেজন্য আপনাকে কি আমি কিছু বলেছি? এ গল্প বর্ণে বর্ণে সত্য না হ'লেও উভয় জাতির চরিত্র অনেকটা ঐ প্রকারের। সিগারেট খাবার সময় পকেটে দেশলাই না থাক্‌লে ফরাসী অপরিচিতকে পথের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেশলাই চেয়ে নেয়—ইংরাজ দেশলাইয়ের অভাবে সারাদিন সিগারেট না খেলেও অপরিচিতের কাছে চাইবে না; গাড়ীতে সারাদিন পাশাপাশি বসে থাক্‌লেও অপরিচিতের সঙ্গে কথা কইবে না। কিন্তু ফরাসী তা' পারে না—বাঙ্গালীও তা' পারে না। কারণ উভয়ের সভ্যতাই এখনো পুরামাত্রায় যান্ত্রিক হয় নি। কিন্তু যে পথে আমরা চল্‌ছি ও ইউরোপের যে জাতির হাবভাবের আমরা অনুকরণ করছি তা'তে চরিত্রের সহজভাব হারিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাকে যে অচিরেই যান্ত্রিক করে তুল্‌বো তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

প্রাচীন ভারতে নাগরকজীবন

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু লিখিতে যাওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। প্রত্নতত্ত্বের কথা দূরে থাকুক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লইয়া নূতন ভাবে আলোচনাও সাধারণতঃ উদ্ভট কল্পনা বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধে 'রিসার্চে'র নামগন্ধ নাই এবং পাঠকগণকে নূতন কিছু শুনাইবার দুরাশাও নাই। প্রাচীন ভারতে নগরবাসিগণ কি প্রণালীতে সাধারণ জীবনযাপন করিতেন, পাঠকগণের নিকট তাহা উপস্থিত করাই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে হয়ত অন্য কথাও আসিয়া পড়িবে, কিন্তু পুরাকালে ভারতীয়গণের দৈনন্দিন গৃহজীবনের মধ্যেও কতটা আদর্শবাদ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল, তাহা দেখানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতে 'নাগরক' শব্দের দুটী অর্থ আছে। একটী চোর, অপরটী নগরবাসী। সুতরাং নাগরক বলিতে বিশিষ্ট কোনও সম্প্রদায় বুঝায় না এবং বৃত্ত বলিতে কোনও একটী বিশিষ্ট বৃত্তি বুঝায় না, সাধারণ জনপদ-বাসীকেই ইঙ্গিত করে। প্রথমে নাগরিকগণ যে ভাবে জীবন যাপন করিতেন, নাগরকবৃত্ত বলিতে তাহাই বুঝাইত। কালক্রমে ইহা একটী পারিভাষিক শব্দ হইয়া পড়ে। আমরা এখানে বাক্যটীর প্রাচীন অর্থ ধরিয়া লইয়া সভ্য ও শিক্ষাদীক্ষাসম্পন্ন জনপদবাসিগণের জীবনপ্রণালী আলোচনা করিব।

প্রাচীন ভারতে কি ভাবে জীবন নিয়ন্ত্রিত হইত তাহার অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ত্রিবর্গ-সাধনই সেকালে পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কামসূত্রাদি গ্রন্থগুলি পড়িলে মনে সহজেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে যখন পুরাকালে ভারতীয়গণের কামজীবনের বিশেষভাবে সেবা করিবার বিধি ও ব্যবস্থা ছিল, তখন তাঁহারা ঘোর ইন্দ্রিয়সক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন কি না? অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে মানবজীবনে ভোগ ও বিলাসের অবাধ সংমিশ্রণ হইলে ও কামজীবনের উপাদানগুলি বহুলপরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলে, ধর্ম্মজীবনে ব্যাঘাত ঘটে ও পুরুষার্থের প্রতি লক্ষ্য স্বভাবতঃই ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারগণ আপনা হইতেই যুক্তি দেখাইয়াছেন। তখনকার দিনে যে নগরবাসীর জীবনে পুষ্প, মাল্য, চন্দন প্রভৃতি বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য, উত্তম শয্যা, উৎকৃষ্ট যান ও বাহন, ভৃত্যবর্গ ও সুসজ্জিত পরিচারিকা-বৃন্দ প্রভৃতি বিলাসের যাবতীয় উপকরণ ছিল, একথা সুনিশ্চিত। গোষ্ঠী-জীবনেও উদ্যানগমন, সুরাসবপানের উল্লেখ এবং গণিকাগণের উপস্থিতি

১৩৩৮]

হইতে অনুমান হয় যে সেকালে মানবজীবনে ইন্দ্রিয়-সেবার স্থান ও অবসর ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পুরাকালে অর্থশাস্ত্র ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর কি কামশাস্ত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল? অর্থাৎ, এককথায়, সূত্রকার-গণ গ্রন্থ-প্রণয়নকালে কি উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন?

বাৎস্যায়ন নিজেই বলিয়াছেন,—

"এবমর্থঞ্চ কামঞ্চ ধর্ম্মং চোপাচরন্নরঃ।
ইহামুত্র নিঃশল্যমত্যন্তম্ সুখমশ্নুতে ॥
কিং স্যাৎ পারত্রেত্যাশঙ্কা কার্য্যে যস্মিন্ন জায়তে।
ন চার্থঘ্নং সুখং চেতি শিষ্টাস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥
ত্রিবর্গসাধকং যৎ স্যাদ্দ্বয়োরেকস্য বা পুনঃ।
কার্য্যং তদপি কুর্ব্বীত ন ত্বেকার্থং দ্বিবাধকং ॥"

(দ্বিতীয় অধ্যায়—৩৯-৪০ শ্লোঃ)

অর্থাৎ এইরূপে অর্থ, কাম ও ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিলে ইহকালে এবং পরকালে বাধাবিঘ্নহীন অশেষ সুখলাভ করিতে পারা যায়। এই শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে কেবল কামসেবা সূত্রকারের অনুমোদিত নয়; ত্রিবর্গ-সাধন মানুষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। অবশ্য আগে অর্থকে প্রাপ্ত হইয়া পরে কাম ও ধর্ম্মের অনুশীলন করিতে হয়; নতুবা অর্থ ও কামের প্রতি অবহেলাবশতঃ ঐহিক সুখলাভে বঞ্চিত হওয়ার জন্য মনে ক্ষোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। শেষোক্ত সংগ্রহ শ্লোকটীতে ঐ কথাই বলা হইয়াছে। যে কার্য্য করিলে পারলৌকিক জীবনে শান্তিলাভের আশঙ্কা না জন্মে, অর্থের ক্ষতি না হয়, অথচ সুখ ভোগ হয়, ত্রিবর্গবিৎ শিষ্টজন সেইরূপ সুখকর কর্ম্মে নিরত হন। সাধারণ অধিকরণে বাৎস্যায়ন, এই কামধর্ম্ম পশুধর্ম্ম হইতে কত পৃথক্, তাহা অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। সাধারণ লোকে ভুল করিয়া মনে করে যে ধর্ম্মাচরণ করিবার কোনও সার্থকতা নাই, কারণ তাহার ফলের আশা সুদূরপরাহত। কিন্তু শাস্ত্রকার বলিতেছেন যে কামসেবার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা কখনই পরমার্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। নতুবা অপরপক্ষে, দর্শ ও পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম ও গবাময়ন প্রভৃতি গৃহ্য ও শ্রৌত ক্রিয়াগুলির এবং পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে কেন? লোকায়ত-সম্প্রদায় অথবা চার্ব্বাকপন্থিগণের সিদ্ধান্তগুলি একেবারে অভ্রান্ত নয়; সূক্ষ্মরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে সেগুলি খণ্ডনসাধ্য। অতএব কোনও একটী বিশিষ্ট জীবনের পরিচর্য্যা যুক্তিসঙ্গত নয়; কারণ ত্রিবর্গের সমন্বয়েই মানব ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভের অধিকারী হয়। যাঁহারা জীবনকে এই আদর্শে পরিচালিত করিতে অভিলাষী হইতেন, তাঁহাদের

পক্ষে কামশাস্ত্রের অধ্যয়ন একান্ত আবশ্যক হইত। কিন্তু সকলেই কিছু কৃতবিদ্য ছিলেন না, আর তখনকার যুগে শাস্ত্রপাঠেও অধিকার ভেদ ছিল। যিনি এই শাস্ত্রপাঠে অধিকারী, তিনি স্বয়ং মূল গ্রন্থ সযত্নে শিক্ষা করিতেন; যিনি অনধিকারী, তিনি নাগরিকজনের সমবায়ে, অর্থাৎ সাধারণের বৈঠক বা সভা হইতে কামজীবনের তথ্যগুলি জানিয়া লইতেন।

নাগরকবৃত্তপ্রসঙ্গে সূত্রকার প্রথমেই বলিয়াছেন, "গৃহীতবিদ্যঃ...... গার্হস্থ্যমধিগম্য নাগরকবৃত্তম্ বর্ত্তেত।" টীকাকার ইহার বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

'বিদ্যাগ্রহণের পর গার্হস্থ্যাশ্রম প্রাপ্ত হইয়া তবে লোক নাগরকবৃত্ত অবলম্বন করিবে'। গৃহীতবিদ্য না হইলে নাগরক হওয়া সহজ নয়। নাগরক স্বভাবতঃ বিদগ্ধজন। সংস্কৃত বিদগ্ধ বাক্যটীর প্রতিশব্দ cultured। একালে আমরা যে ব্যক্তিকে সভ্য ও শিক্ষিত বলিয়া থাকি, বাৎস্যায়নের যুগে তাঁহাকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করা হইত। সুতরাং বিদগ্ধ ব্যক্তির বৃত্তবর্ত্তনে যোগ্যতা ও তদনুরূপ বিদ্যার প্রয়োজন। স্ত্রী না থাকিলে নাগরকজীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, সেইজন্য শাস্ত্রে গার্হস্থ্যাশ্রমের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। আবার পত্নীলাভ হইলে যদিও গৃহকর্ম্ম নাগরকযোগ্য হয়, তথাপি অর্থব্যতিরেকে স্বাচ্ছন্দ্যে এরূপ জীবন যাপন সম্ভবপর হয় না। সব যুগেই স্ত্রী ও অর্থের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; টীকাকারও বলিতেছেন যে অর্জ্জিত হউক অথবা অন্বিত হউক, অর্থাগমের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব ব্রাহ্মণ 'প্রতিগ্রহ'দ্বারা, ক্ষত্রিয় জয়দ্বারা, বৈশ্য 'ক্রয় বিক্রয়' করিয়া আর শূদ্র 'ভৃতি'র সাহায্যে অর্জ্জিত অর্থে ঐ জীবন যাপন করিবে। চতুর্বর্ণেরই যে এই বৃত্তিতে অধিকার ছিল, তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ হইতে বোঝা যায়।

যেখানে যাহার বৃত্তি, সেখানেই তাহার স্থিতি। অতএব নগরে, পত্তনে (রাজধানী), খর্ব্বটে (দুইশত ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি) অথবা সজ্জনাশ্রয়ে নাগরক অবস্থান করিবেন। এগুলি ছাড়া অন্য যেখানে থাকিলে জীবিকানির্ব্বাহ সহজে সম্পন্ন হয়, সেখানেও নাগরক থাকিতে পারেন। 'বৈদগ্ধ্য' একটী সামাজিক গুণ; ধীর ও সংযত ভাষা, উন্নত রুচি এবং ব্যবহারের সৌজন্য মানবমন ও সমাজকে অলঙ্কৃত করে। সেইজন্য, জনবহুল স্থানেই নাগরকজনের বাস করিবার ব্যবস্থা ছিল।

নাগরকজীবনকে তিনভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ গোষ্ঠীজীবন, দ্বিতীয়তঃ গার্হস্থ্যজীবন, তৃতীয়তঃ দৈনন্দিনজীবন।

পুরাকালে সমাজের মধ্যে গোষ্ঠীর একটী বিশিষ্ট স্থান ছিল। 'সভা' ও 'সমিতি'তে যেমন রাষ্ট্রীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইত, গোষ্ঠীতে সেইরূপ সামাজিক জীবনের বিকাশ হইত। আধুনিক যুগের ক্লাব্, বৈঠক বা সভার সহিত ইহার কতকটা মিল আছে। গ্রীক্‌গণ যেমন রঙ্গমঞ্চে, মুক্তপ্রাঙ্গনে অথবা বিপণির মধ্যে সম্মিলিত হইতেন, পুরাকালে নাগরকগণ সেইরূপ গোষ্ঠীতে সমবেত হইতেন। গোষ্ঠীতে সম্মিলিত ব্যক্তিগণ হাস্য-কৌতুক, পানাহার ও নৃত্যক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করিতেন। নাগরকগণের সাধারণ কতকগুলি ক্রীড়াকৌতুকের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। গোষ্ঠী-সমবায়, যাত্রার ব্যবস্থাপন, সমাপানক, উদ্যানগমন ও সমস্যাক্রীড়ার প্রবর্ত্তন, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম নিত্য কর্ত্তব্য। পক্ষে বা মাসে কোনও একটী বিশিষ্ট দিনে, সরস্বতীগৃহে নাগরকগণের সম্মেলন হইত। আগন্তুক নটগণ ও অভ্যাগত নর্ত্তকীগণ তাঁহাদিগকে নৃত্যগীত প্রভৃতি শুনাইত। যাহারা পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত, তাহারা বেতনভোগী বলিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট দিনে স্বীয় কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিত। এই স্থলে ঘটানিবন্ধন বলিয়া একটী কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অপরাহ্নে গোষ্ঠীবিহার, সমাপানক অর্থাৎ সকলে একসঙ্গে মিলিয়া পান ক্রিয়া, বিহারার্থ গৃহবাটিকায় গমন প্রভৃতি কর্ম্মগুলি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু ঘটানিবন্ধন একটী বিশিষ্ট উৎসব। যত নাগরক কোন একটী প্রজ্ঞাত দিনে (সাধারণতঃ নাগরকগণের বিদ্যাকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আয়তনে পঞ্চমী তিথিতে) একত্র মিলিত হইয়া যাহাতে সামাজিক আলাপ করিতে পারেন, তাহার জন্য এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কুশীলবগণ নাগরকদের নিকট বিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন, নাগরকগণও তাঁহাদিগকে একটী নিকৃষ্টপর্য্যায়ে ফেলিয়া শিল্পকলার অবমাননা করিতেন না। কুশীলবগণ ধনী নির্ধন, পাত্রভেদ না করিয়া আপনাদের কলাচাতুর্য্য দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিত। যদি তাহাদের নৃত্যগীত শ্রুতিসুখকর ও দৃষ্টিমধুর হইত, তাহা হইলে প্রেক্ষকগণের অনুরোধে সেই সব নৃত্যগীতের পুনরভিনয় চলিত। নাগরকগণও তাহাদের প্রয়োগদর্শনে সাতিশয় প্রীত হইলে রঙ্গ অথবা সভামধ্যেই তাহাদিগকে পূজাফল (প্যালা দেওয়ার টাকা কড়ি) উপহার দিতেন। তখনকার দিনে বেতনভোগী নিযুক্ত শিল্পিগণের ও আমন্ত্রিত কুশীলবগণের মধ্যে কোনও রূপ বিদ্বেষভাব ছিল না। আগন্তুকগণের উৎসবে অথবা ব্যসনে অপর পক্ষ তাহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া দিত। সেইরূপ, নিযুক্ত কোনও ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার কার্য্য অভ্যাগত নটগণ সম্পন্ন করিয়া লইত। এই এককার্য্যকারিতা অর্থাৎ পরস্পরের

সাহায্য করার প্রবৃত্তি সেকালের গণধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল।

গোষ্ঠীসমবায়ের প্রধান অঙ্গ গণিকা, যেহেতু নাগরকগণ সাধারণতঃ তাহাদের গৃহেই সমবেত হইতেন। গোষ্ঠীসমবায় বলিতে আমরা, সভামণ্ডপে, গণিকাগৃহে অথবা অন্যতম নাগরক ব্যক্তির গৃহে, 'সমানবিদ্যা, সমানবুদ্ধি, ও সমধনশালী কতকগুলি সমবয়স্ক ব্যক্তির বিশ্রম্ভালাপসহযোগে একত্র অবস্থিতি' বুঝিয়া থাকি। সেস্থানে নাগরকগণ কাব্য, নৃত্য, গীত অথবা অন্য কোনও চারুকলার চর্চ্চা করিতেন। সেই গোষ্ঠীতে নাগরকদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য উৎসবাদির অনুষ্ঠান হইত এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে পরিচারিকা-দ্বারা সেবা-শুশ্রূষা চলিত। গণিকাদিগের গোষ্ঠীতে অবস্থিতি সমাজবিরুদ্ধ রীতি নহে, ইহা শিষ্টসম্মত সামাজিক প্রথা। আধুনিক যুগেও অনেক প্রদেশের অধিবাসিগণ নৃত্যগীত শুনিবার জন্য ঐ স্থানে সমাগত হওয়া নির্দ্দোষ আমোদ মনে করেন। এই গণিকাবৃত্তিকে গ্রীসদেশের Hatærism প্রথার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গ্রীসে যেমন গণিকাকুল সমাজের মধ্যে একটী নিজস্ব স্থান অধিকার করিয়াছিল, প্রাচীন ভারতেও তেমনি তাহারা নৃত্য, গীত প্রভৃতি চতুঃষষ্ঠিকলার অনুশীলনের ফলে সমাজে বরেণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। প্রাচীন সাহিত্যে গণিকাবৃন্দের উপস্থিতি অনেকস্থানেই উল্লিখিত আছে। মহর্ষি দত্তক অনেকদিন যাবৎ গণিকাগৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের বৃত্তিরহস্য ও সাম্প্রদায়িক কলানৈপুণ্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। মৃচ্ছকটিকেও দেখিতে পাই যে বসন্তসেনা কুলনারী না হইয়াও চারুদত্তের সহিত পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তদানীন্তন রাজন্যবর্গের সভামণ্ডপে গণিকাগণের উপস্থিতি ও প্রবেশ অব্যাহত ছিল। কাদম্বরীতে রাজাশূদ্রকের, ও বাণভট্টের হর্ষচরিতে রাজা শ্রীহর্ষের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত গণিকার উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। অধ্যাপক Lüders, অশ্বঘোষরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ ও যে অন্য দুখানি খণ্ডিত নাটকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেও আমরা ঐরূপ চরিত্র চিত্রিত আছে দেখিতে পাই। সুতরাং গণিকাবিবাহ, অথবা তাহাদের কলানৈপুণ্য দর্শনার্থ তাহাদের গৃহে গমন একটী সামাজিক প্রথা বলিয়া গণ্য ছিল এবং ঐরূপ প্রথা ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। জন্মগ্রহণ দৈবাধীন, কিন্তু শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্যের ফলে সম্মানলাভ স্বীয় চেষ্টিতফল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক Keith-এর Classical Drama নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য। গণিকাগণের জীবনবৃত্তি, তাহাদের শিক্ষাপ্রণালী, প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় বাৎস্যায়নের বৈশিকাধিকরণেও বিশদ্‌রূপে বিবৃত আছে। সুতরাং শাস্ত্রকারগণও যখন

তাহাদিগকে গোষ্ঠীতে স্থান দিবার অনুমতি দিয়াছেন, তখন ইহা কোনও নিন্দনীয় ব্যাপার নিশ্চয়ই ছিল না।

গোষ্ঠীতে মিলিত হইয়া নাগরকগণ একত্র পানক্রিয়ায় রত হইতেন। ইহাকেই সমাপানক বলা হইত। এক সময়ে একজনের বাটীতে, অন্য সময়ে অন্যজনের গৃহে পালা করিয়া এই পানগোষ্ঠী সম্মিলিত হইত। সেকালের পানরীতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আপানক বলিতে আমরা 'মধু, মৈরেয়, সুরা ও আসব' এই কয়টী বুঝি। এই পানীয় আগে গণিকাদিগকে উপহার দেওয়া হইত, পরে নাগরকগণ তাহা পান করিতেন। এই রীতি দ্বারা গণিকাগণের অভ্যর্থনা, সম্মান ও গৌরবই সূচিত হইতেছে। এই পানগোষ্ঠী উদ্যান-গমনের একটী বিশিষ্ট অঙ্গ। উদ্যানগমন কালে নাগরকগণ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারূঢ় হইয়া পরিচারকগণ সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেখানে কুক্কুট-যুদ্ধ (Cock-fight) ও দ্যূতক্রীড়ার (পাশাখেলা) আয়োজন থাকিত। ঐ সকল ক্রীড়ায় পূর্ব্বাহ্ণ অতিবাহিত করিয়া উদ্যানজাত পত্রপুষ্প সঞ্চয় করিয়া নাগরক স্বগৃহে প্রত্যাগত হইতেন। দ্যূতক্রীড়া ও কুক্কুটযুদ্ধ ভিন্ন হিংস্র জলচররহিত দীর্ঘিকা অথবা পুষ্করিণীতে জলক্রীড়ারও প্রচলন ছিল।

এইবার সমস্যাক্রীড়ার কথা বলা হইতেছে। টীকাকার বলিতেছেন, এই ক্রীড়া দুই প্রকারের—মাহিমানী ও দেশ্যা। মাহিমানী ক্রীড়ার মধ্যে 'যক্ষরাত্রি', 'কৌমুদীজাগর' ও 'সুবসন্তক' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যক্ষরাত্রি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাকেই বলা হইত। সেই রাত্রিতে নাগরকগণ দ্যূতক্রীড়া করিতেন, এইজন্য ইহার অপর নাম দ্যূতপ্রতিপৎ। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার প্রাচুর্য্য হয় বলিয়া ঐ রাত্রিকে কৌমুদীজাগর বলা হইত। সে সময়ে দোলাদ্যূতপ্রায় ক্রীড়া হইত। সুবসন্তক একটী বিশিষ্ট দিন, কারণ ইহার অপর নাম মদনোৎসব। বসন্তে মদনত্রয়োদশী তিথিতে নৃত্যবাদ্য ও বিবিধ ক্রীড়াকৌতুক অনুষ্ঠিত হইত; নাগরকজীবনে ইহা একটী স্মরণীয় দিন ছিল। দেশ্যা অথবা সম্ভূয়ক্রীড়ার মধ্যে সহকারভঞ্জিকা, অভ্যূষখাদিকা, বিসখাদিকা, নবপত্রিকা, একশাল্মলী, পাঞ্চালানুযান ও কদম্বযুদ্ধের নাম উল্লেখযোগ্য। যে ক্রীড়ায় সুগন্ধি অপক্ক আম্রফলের ভঞ্জন হয়, তাহাকে সহকারভঞ্জিকা বলে। ইহা এখনও আমাদের দেশে বিলুপ্ত হয় নাই, এবং বাল্যকালে পল্লীগ্রামে অনেকেই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। ছোলা, মটর প্রভৃতি পুড়াইয়া খাওয়ার ধুমকে অভ্যূষখাদিকা বলে। যে ক্রীড়ায় মৃণাল তুলিয়া খাওয়া হয়, তাহাকে বিসখাদিকা বলে। নববর্ষার ধারাবর্ষণ আরম্ভ হইলে, বৃক্ষরাজিতে যখন নবপল্লবের উদ্‌গম হয়, তখন সিক্ত বনস্থলীতে গিয়া প্রণয়ী ও প্রণয়িনীগণ যে ক্রীড়ায় রত হইতেন,

তাহারই নাম নবপত্রিকা। পাঞ্চালানুযান ক্রীড়াটী বোধ হয় কোন স্থানীয় কৌতুকবিশেষ। ইহা অনেকটা আজকালকার পুতুলনাচ, মিছিল ও শোভাযাত্রার মত। শাল্মলীবৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছ লইয়া নিজ দেহ সুসজ্জিত করার নাম একশাল্মলী। কদম্বযুদ্ধ ক্রীড়াটী বোধ করি আধুনিক যুগের টেনিস্ খেলার প্রাচীন সংস্করণ। কদম্বপুষ্পকে প্রহরণ লইয়া ক্রীড়ার নাম ছিল কদম্বযুদ্ধ। এই ক্রীড়া কয়টী নাগরকজনোচিত ও অতি সুন্দর। সব কয়টীই প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তিবিধানের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাহা ছাড়া, এই ক্রীড়াকৌতুকের নামকরণে সেকালের দীক্ষা ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়; কারণ নামগুলির মধ্যে কেমন একটী মোহময় শব্দবিন্যাস ও সৌকুমার্য্য আছে।

এইরূপে, নাগরকগণ ক্রীড়াকৌতুকে, কাব্যসমস্যায় ও কলাচর্চ্চায় পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। ফলে, তাঁহারা জনসাধারণের নিকট সবিশেষ সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন। গ্রামবৃদ্ধগণ শুধুই উদয়নের প্রেমকাহিনী বলিতেন না; অনুসন্ধিৎসু শ্রোতা পাইলে তাহাদের নিকট নাগরকবৃত্ত বর্ণনা করিতে বসিয়া যাইতেন এবং যাহাতে তাহারা নাগরকদের মত জীবনকে সুন্দর ও সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করে সেই মত উপদেশ দিতেন।

উপরে বর্ণিত গোষ্ঠীজীবন হইতে প্রতীয়মান হয় যে গোষ্ঠী কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের স্থান ছিল না। সেখানে বিশেষ বিশেষ কাব্যচর্চ্চা এবং ক্রীড়াকৌতুকও চলিত। নাগরকগণ স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় ও সুকুমার-বৃত্তির অনুশীলনে অনুরাগী ছিলেন। পরস্পরের প্রতি সৌজন্য ও বিনীত ব্যবহার, উপযুক্ত ব্যক্তিগণের পূজা এবং যাত্রা ও উৎসবাদিতে প্রবর্ত্তমান পুরুষের উপচার ও সম্মান প্রদর্শন তখনকার দিনে শিষ্টতাসম্মত ছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে কাব্য ও কলার অনাদর ছিল না, নতুবা সাহিত্যে কবিচর্য্যার এত নিদর্শন মিলিত না।

এইবার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গোষ্ঠীর কথা শেষ করা হইবে। এখনকার মত তখনকার দিনেও নিশ্চয়ই ভাষাসমস্যা ছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিকগণের সম্মেলনে কোন্ ভাষায় কথা কওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সূত্রকার বলিতেছেন—

নাত্যন্তং সংস্কৃতেনৈব, নাত্যন্তং দেশভাষয়া
কথাং গোষ্ঠীষু কথয়ল্লোঁকে বহুমতো ভবেৎ।'

(৪র্থ অধ্যায়—২০ শ্লোঃ)

শুদ্ধ সংস্কৃতে অথবা কেবল দেশভাষা অবলম্বন না করিয়া আলাপাদি কার্য্য করিলে সমাজে সম্মানিত হইবে। অর্থাৎ, মিশ্রিত ভাষায় আলাপ

করা উচিত, ইহাই শিষ্টজনের অভিমত। অধুনা রাষ্ট্রভাষা লইয়া আন্দোলনের যুগে এ কথা কয়টী প্রণিধানযোগ্য। গোষ্ঠীতে বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে সামাজিকতা থাকা উচিত, সেইজন্য বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ উপযুক্ত গোষ্ঠীতে যথাসুখে বিচরণ করিতেন এবং সকলের বোধগম্য ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া আপনার বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দিতেন;—

"লোকচিত্তানুবর্ত্তিন্যা ক্রীড়ামাত্রৈক কার্য্যয়া
গোষ্ঠ্যা সহ চরন্ বিদ্বাল্লোঁকে সিদ্ধিং নিযচ্ছতি।"

(৪র্থ অধ্যায়—২০ শ্লোঃ)

এইবার গৃহজীবনের কথা। যাঁহারা সুন্দরের পূজা করিতেন, তাঁহারা যে নিজ গৃহ শুধু বাসোপযোগী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একথা বলা বাহুল্য। বাসগৃহটী যাহাতে মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় এ বিষয়ে তাঁহাদের সবিশেষ যত্ন ছিল।

নগরবাসিগণ সাধারণতঃ 'আসন্নোদক ভূমিতে' গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। পান ও বিহারের উপযোগী নির্ম্মলজলপূর্ণ বাপীতট অথবা সরোবরের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানই বাসগৃহের পক্ষে প্রশস্ত ছিল। কেবল উত্তম বাসস্থানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না; সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকাকে তাঁহারা একটী অপরিহার্য্য উপকরণ বলিয়া মনে করিতেন। এই গৃহোদ্যানের উল্লেখ শকুন্তলা-প্রমুখ সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। বাসগৃহটী 'বিভক্তকর্ম্মকক্ষ' হইত, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকোষ্ঠগুলিকে সাজান হইত। যাবতীয় গৃহকর্ম্ম একই গৃহে করিতে থাকিলে বাসভবনের শোভা নষ্ট হইয়া যায়, সেইজন্য নাগরকগণ বিভিন্ন কক্ষভাগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শয়ন ও উপবেশনের জন্য দুইদিকে দুটী বাসগৃহ থাকিত। এই রীতি রুচিসঙ্গত বলিয়াই মনে হয় কারণ শয়নগৃহ নির্জ্জন ও অন্তরালবর্ত্তী হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল অবশ্য যাঁহাদের স্থানাভাব নাই, তাঁহারা এইরূপে প্রকোষ্ঠ ভাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রায়ই উক্ত কক্ষ দুটী ভিন্নদিকে না হইয়া পরস্পর সংলগ্ন হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে গৃহনির্ম্মাণের অবশিষ্ট বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহা বাস্তুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে যে বাস্তু ও স্থপতিবিদ্যার এবং তক্ষণশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। যাঁহাদের এ বিষয়ে কৌতূহল আছে, তাঁহারা শুক্রনীতিসার গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণ খুলিলেই দেখিবেন যে সেখানে বৃক্ষরোপণ, জলসেচন হইতে আরম্ভ করিয়া কূপ ও পুষ্করিণীখনন, মন্দিরাদি দেবায়তননির্ম্মাণ, মূর্ত্তিগঠন, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের

অনুপাত প্রভৃতি ভাস্কর ও স্থপতিবিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথারীতি উল্লিখিত রহিয়াছে।

গৃহসজ্জায় নাগরকগণ অত্যন্ত যত্নবান্ ছিলেন; এবং বাসগৃহে আধেয় বস্তুর (আস্‌বাব পত্রের) বিন্যাসে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। যাঁহারা নাগরকদের গৃহসজ্জা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা বাৎস্যায়ন প্রণীত কামসূত্র পড়িতে পারেন। মূলগ্রন্থের অভাবে, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'আমাদের শিক্ষা' নামক বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। প্রায় তের বৎসর আগে তিনি 'বইপড়া' শীর্ষক প্রবন্ধে এই 'নাগরিকদের গৃহের ও দেহের সাজসজ্জার' বর্ণনাচ্ছলে অনেকগুলি মূল্যবান্ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বহির্ভাগস্থ বাসগৃহে দুটী সুন্দর উপাধান এবং তাহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী শুভ্র আস্তরণ অথবা চাদর পাতা থাকিত। তাহারি নিকটে আর একটী শয্যা প্রস্তুত থাকিত, তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রপ্রসর। শয্যার শিরোদেশে কোনও চিত্রযুক্ত কূর্চ্চাসন (ব্রাকেট্) ও পাদদেশে একটী কাষ্ঠময়ী বেদিকা স্থাপিত থাকিত। শিরোদেশে কূর্চ্চাসনটী ছিল দেবতার স্থান, আর অধোদেশে বেদিকাটী ব্যবহৃত হইত বিলাসের উপকরণগুলি সুসজ্জিত রাখিবার জন্য। গৃহমধ্যে অনুলেপন, মাল্য, সিক্থকরণ্ডক (মোমের কৌটা), সৌগন্ধিকপেটিকা (চূর্ণ গন্ধদ্রব্য রক্ষার জন্য আধার-বিশেষ) মাতুলুঙ্গত্বক্ (ফলবিশেষের ছাল) এবং তাম্বুলপাত্র রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। নিম্নে ভূমিদেশে থাকিত পতদ্‌গ্রহ (পিক্‌দানী), চিত্রফলক (চিত্রাঙ্কনের জন্য কাষ্ঠনির্ম্মিত ফলক), এবং বর্ত্তিকাসমুদ্‌গক (তুলি ও রং প্রভৃতি আঁকিবার সরঞ্জাম)। গৃহসজ্জার প্রধান উপকরণ দুটী ছিল 'ভিত্তিসংলগ্ন, হস্তিদন্তে বিলম্বিত, কারুকার্য্যখচিত বীণা' ও পুস্তকাধার। সাধারণতঃ এই বীণা বাজান হইত না, 'নিচোল-অবগুণ্ঠিতা' (ঘেরা-টোপে ঢাকা) হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিত মাত্র। পুস্তক সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, কেননা টীকাকার 'পুস্তক' বাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন 'যঃ কশ্চিৎ পুস্তকঃ' অর্থাৎ যে কোনও বই। সম্ভবতঃ, বিলাসী নাগরকের গৃহে পুস্তক গৃহসজ্জার একটী অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গণ্য হইত।

ইহা ছাড়াও গৃহসজ্জার অন্যান্য উপকরণ ছিল। গোলাকৃতি ও আস্তরণযুক্ত আরামপ্রদ আসনবিশেষের নাম ছিল বৃত্তাস্তরণ। তাহাতে মস্তকনিধানের জন্য একটী শিরোভাগ থাকিত। 'আকর্ষফলক' নামক অপরিচিত শব্দের বাচ্য পদার্থের পরিচয় কোথাও মিলে নাই। সম্ভবতঃ আজকালকার বিলিয়ার্ড খেলার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। একটী

আঁকুসী লইয়া কাঠের ফলকের উপর বল্ খেলা হইত। এই আকর্ষ-ফলক ও দ্যূতফলক (পাশাখেলার ছক্) ভূমিতেই কুড্যাশ্রিত অর্থাৎ স্তম্ভগাত্রে অথবা গৃহের দেয়ালে সংলগ্ন থাকিত। অভ্যন্তর-গৃহটীর বিন্যাস বাহিরের বাসগৃহের সজ্জারই অনুরূপ। কেবল বৃত্তাস্তরণের পরিবর্ত্তে পালঙ্ক ব্যবহৃত হইত। তাহার উপর একখানি সুরভিত আস্তরণ তুলিকাপাতে সুচিত্রিত হইয়া শোভা পাইত। ইহার শিরোদেশে ও অধোভাগে উভয়বিধ উপাধান রক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শয্যা অতি সুকোমল এবং মধ্যভাগে বিনত ও মৃদুস্পর্শ; আচ্ছাদন-বস্ত্রটীও শুভ্রবর্ণ ও সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন থাকিত। নিকটেই একটী প্রতিশয্যিকা অর্থাৎ উক্ত শয্যা হইতে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুদ্র ও উচ্চ শয়নীয় প্রস্তুত রাখা হইত। ইহা অবশ্য আচার ও নিষ্ঠাবান্ নাগরকদের জন্য। এই অভ্যন্তর বাসগৃহটী সচরাচর পুরন্ধ্রীদের জন্যই ব্যবহৃত হইত। বাসগৃহের অনতিদূরে নানা-জাতীয় পক্ষিপূর্ণ পিঞ্জরগুলি হাতীর দাঁতের দাঁড়ে ঝুলান থাকিত। নাগরক-গণের ক্রীড়াভূমির স্থান নির্ণয় হইতে বুঝা যায় যে তাঁহারা নির্জ্জনতা ও একান্তবর্ত্তিতার পক্ষপাতী ছিলেন। তরুরাজির স্নিগ্ধ শ্যামছায়ায় প্রেঙ্খা-দোলা ও চক্রদোলা খাটান হইত। নারীবৃন্দের এই দোলাভূমি অতি মনোরম স্থান ছিল এবং রৌদ্র নিবারণের জন্য চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ ও লতাগুল্মের ঘন সমাবেশ থাকিত। বিহারভূমির অপর একটী অংশে "স্থণ্ডিলপীঠিকা" অর্থাৎ কুট্টিমময়ী বেদিকা ছিল। এই পুষ্পাকুল স্থানটীর নাম ছিল লতামণ্ডপ। এইরূপে ভবনবিন্যাস সম্পূর্ণ হইত। কূর্চ্চাসন হইতে সঙ্গীতযন্ত্র পর্য্যন্ত যাবতীয় আধেয় বস্তুগুলি গৃহের অভ্যন্তরে যথাস্থানে সজ্জিত থাকিত। গৃহের পারিপাট্য ও শোভাসাধন যে মার্জ্জিতরুচির তথা বৈদগ্ধ্যের পরিচায়ক, একথা নাগরকগণ কখনও বিস্মৃত হন নাই। প্রাচীন ভারতের রুচি, সংস্কার ও আদর্শ হইতে আজ আমরা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি, তথাপি গৃহসজ্জায় তাঁহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

এ যাবৎ আমরা নাগরকের নৈমিত্তিক বৃত্ত লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন নিত্যকর্ম্মগুলির বর্ণনা আবশ্যক। নাগরকগণের দৈনন্দিন জীবনপদ্ধতি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের জীবনধারায় একটী বিশিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা ছিল। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহারা আগে মুখপ্রক্ষালন করিতেন, পরে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিতেন। প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পর মনকে প্রফুল্ল ও সতেজ রাখিবার জন্য সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার ও বেশবিন্যাস অনুমোদিত ছিল। ধূপ, মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা দেহ অনুলেপন, অলক্তক দ্বারা ওষ্ঠরঞ্জন, তাম্বুলপাত্র গ্রহণ

ও দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া তবে অন্য কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সূর্য্যোদয়ের পরেও শয্যাসীন থাকা দূষণীয়, সুতরাং নাগরকসুলভ বিলাসী গাত্রোত্থানজনিত দোষস্খালনের জন্য নিয়তকৃত্য করিয়া তবে পুরাণাদি অথবা ধর্ম্ম কর্ম্মের উদ্যোগ হইত। ধূপ, অগুরু, স্রক্, শেখরক প্রভৃতি উপকরণের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে সেকালেও পুরুষগণের মধ্যে অঙ্গরাগের ও প্রসাধনের কোনও ত্রুটি ছিল না। এগুলি গেল বাহ্যসংস্কার। শরীররক্ষার জন্য আরও অনেকগুলি কর্ত্তব্য ছিল। প্রত্যহ নিয়মিত অবগাহন, দ্বিতীয় দিনে উৎসাদন অর্থাৎ তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, তৃতীয় দিনে ফেনক ব্যবহার করিয়া দেহের ঘর্ম্মসঞ্চার অপনোদন, এবং চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে আয়ুষ্য ও প্রত্যায়ুষ্য (ক্ষৌরকর্ম্ম) করা হইত। নিত্যস্নান ওজস্কর ও পবিত্র, গাত্রমর্দ্দন শরীরের দৃঢ়তাবর্দ্ধক, এবং ফেনক ব্যবহার যে পরিষ্কারক, ইহা নাগরকগণ বুঝিতেন। ঘর্ম দূর করার জন্য কর্পট অথবা রুমাল ব্যবহার করার প্রথা ছিল। তখনকার দিনে ইহা অনাবশ্যক বোধ করা হইত না, কারণ গন্ধিত কর্পট ব্যবহার না করিলে শরীর ক্লেদযুক্ত হয়, তাহাতে নাগরকের বৈদগ্ধ্যের অভাব সূচিত হয়। এইরূপে শরীরসংস্কার ও মানসিক স্ফূর্ত্তিবিধান সেকালের সহজ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ছিল।

পূর্ব্বাহ্ন, অপরাহ্ন, দিনমান ও রাত্রিকে সাধারণতঃ আট ভাগে বিভক্ত করা হইত। পূর্ব্ব তিনভাগে উপরি-উক্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান শেষ হইলে নাগরকগণ ত্রিবর্গসাধক ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেন। ইহাতে নাগরক যে বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া স্বীয় ইষ্টচিন্তা বিস্মৃত হন নাই তাহাই প্রমাণ করে। পূর্ব্বাহ্নের চতুর্থ ভাগে সাধারণতঃ ভোজন করা হইত। অপরাহ্নের শেষ ভাগে বলসঞ্চারের জন্য পুনর্ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। পুনর্ভোজন যে চারায়ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের অভিমত, এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক আছে—

> 'অজীর্ণে ভোজনং যচ্চ যচ্চ জীর্ণে ন ভুজ্যতে।
> রাত্রৌ ন ভুজ্যতে যচ্চ তেন জীর্য্যন্তি মানবাঃ ॥'

অর্থাৎ অজীর্ণে ভোজন, অথবা ক্ষুধা পাইলে ভোজন না করা, কিংবা রাত্রিতে অকারণ উপবাস করিলে মানব নিজেই জীর্ণ হইয়া যায়।

ভোজনের পর আরও কতকগুলি কার্য্য ছিল। শুকসারিকার প্রলাপন, দিবাশয়ন, (অধর্ম্ম হইলেও গ্রীষ্মকালে শরীর পোষণের জন্য অনুমোদিত), প্রহেলিকা, প্রতিমালা প্রভৃতি কলাক্রীড়া, পীঠমর্দ্দ ও বিদূষকের সহিত আলাপ, এবং তৎপরে বন্ধুবান্ধবসহযোগে গোষ্ঠীবিহার, ইহাই নাগরকগণের

দৈনিক জীবন শেষ করিত। সন্ধ্যাকালে গণিকাগৃহে পুনরায় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হইত। নৃত্যগীত শেষ হইলে অনেকেই নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। অতঃপর গৃহসম্মার্জ্জন এবং পুষ্পশয়ন রচনা করিয়া তাঁহারা বাসগৃহ সুরভিত করিতেন। ইহাই নাগরকগণের নৈশবৃত্ত। অবশ্য ইহার পরেও ইচ্ছানুক্রমে দূতীপ্রেরণ, সঙ্কেত স্থানে নায়িকার জন্য প্রতীক্ষা, অভিসারিকার আগমন প্রভৃতি কার্য্য চলিত।

প্রাচীন ভারতে জীবনপর্য্যায়ের যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়, কারণ জীবনের মধ্যে সংযম ও সামঞ্জস্য আনিবার প্রচেষ্টাকে মহৎ বলিতে হইবে। একদিকে যেমন আমোদ ও স্ফূর্ত্তির বিধান ছিল, অপর দিকে তেমনি সুকুমার কলাচর্চ্চার প্রতি অবহেলা ছিল না। ইন্দ্রিয়ের সেবা করিতে গিয়া তাঁহারা কোনও দিন শরীররক্ষণে অমনোযোগী হন নাই, বরং তাহার সংস্কার ও ক্ষয়নিবারণের জন্য তাঁহারা অশেষ যত্ন লইতেন। কি গোষ্ঠী-সম্মেলনে, কি গৃহসজ্জায়, কি নৃত্যগীত উপভোগে, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহাদের একটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাঁহারা শুধু প্রাণধারণেই পরিতৃপ্ত হন্ নাই ; আনন্দের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই জীবধর্ম্ম মানিয়া লইয়াছিলেন। এস্থানে একটী কথার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহাদের জীবনধারা আলোচনা করিলে তাঁহাদের বিলাসাসক্তিই সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Dr. Gore ১৯২৯-৩০ সালে প্রদত্ত Gifford Lectures—The Philosoply of the Good Life পুস্তকে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছে। বোধ হয় অন্যান্য ধর্ম্মের উপর খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য প্রমাণ করিবার জন্যই এ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার অভিমতটী নীচে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—" We cannot expect to find from Hinduism any firmly conceived ideal of the good life……" তিনি হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কোনও নৈতিক আদর্শের সন্ধান পান নাই, এবং বলেন যে সব 'natural religions'ই নীতিবিগর্হিত। ভারতীয় দর্শন অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোনও স্থানেই তিনি এই উচ্চাদর্শের ও 'Good Life'এর সামঞ্জস্যপূর্ণ মিলন দেখিতে পান নাই। তাই তিনি শেষে বলিয়াছেন, "We must then leave out India in our survey of the good life as being disqualified by a fundamental pessimism or moral indifference." এই সিদ্ধান্তগুলি পড়িয়া অবশ্য চিন্তাকুল হইয়া উঠিবার কোনও আশঙ্কা নাই, কারণ বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণের অনুকূল অথবা প্রতিকূল মতামতগুলির বিশেষ কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে ভারতবর্ষে জীবনে যে একমাত্র দুঃখবাদ অথবা নৈতিক অবনতিরই প্রসার

হইয়াছিল, তাহা নহে। নাগরকবৃত্ত পড়িলে এইটুকু বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্মাচরণ অতি প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলেও জীবনকে সুন্দর, বরণীয় ও মঙ্গলময় করিয়া তোলা অসম্ভব নয়।

প্রাচীন ভারতে যে কোনও দিন ইন্দ্রিয়বাদ আসিয়া পড়ে নাই, ও পরবর্ত্তী যুগে যে এই নাগরকগণের উচ্চ আদর্শ ম্লান হয় নাই, একথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উপভোগ কখনই ব্যভিচার নামে অভিহিত হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরও যে সার্থকতা আছে, তাহা নাগরকগণ স্বীকার করিতেন, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার পক্ষপাতী তাঁহারা কোনদিন ছিলেন না। সেই জন্য সূত্রকার একমাত্র যৌবনকে এই ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের সেবার প্রশস্ত সময় বলিয়াছেন, 'কামঞ্চ যৌবনে ইতি স্থাবিরে ধর্ম্মং মোক্ষঞ্চ'। আচার্য্যগণ এ মতের পুষ্ট-পোষকতা করেন, কারণ তাঁহারাও দুই ধর্ম্মের সম্প্রতিপত্তি ও বিপ্রতিপত্তি সূচক যুক্তির অবতারণা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন, "শতায়ুর্বৈ পুরুষো বিভজ্য কাল মন্যোন্যানুবন্ধং পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত"।

অন্যান্য জাতির ইতিহাসেও এই ভোগাসক্তি অথবা বিলাসপ্রিয়তার উদাহরণ মিলিতে পারে। রোমকদিগের মধ্যেও জীবনকে সরল, সুসংযত ও শোভনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই; সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই তাহা কামুকতা ও যথেচ্ছ-চারিতায় পরিণত হয়। ফরাসীজাতিও ভোগপ্রিয়, কিন্তু তাহাদের বিলাসিতার আতিশয্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয়, একমাত্র গ্রীসের সহিত এবিষয়ে ভারতের উপমা চলিতে পারে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দী হইতে Periclean যুগ পর্য্যন্ত এথেন্স্বাসীর জীবনে যে নব উদ্যোগ আসিয়াছিল, তাহা কতকটা ভারতীয় প্রচেষ্টারই অনুরূপ। Greek view of "good life" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভারতে জীবায়ন সেই দিকেই অগ্রসর হইয়াছিল। আনন্দের মধ্য দিয়া শুধু ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি নয়, জাতীয় শিল্পকলারও চরম বিকাশ হয়। দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যে মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে, কিংবা কোনও জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস গড়িয়া উঠিতে পারে; কিন্তু শিল্পকলার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সে জাতির সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌষ্ঠবজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। ভারতীয়গণ আধ্যাত্মিক জাতি হইলেও সুন্দর জীবন-যাত্রায় কোনও দিন বিরাগ অথবা ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই।

প্রাচীন ভারতে এই নিত্য ক্রীড়া, কৌতুক ও বিহারের আয়োজন দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গনে বাড়িয়া ওঠার সুখ আছে বটে, কিন্তু এরূপ জীবন Pagan জীবনেরই সমতুল।

কথাটী অমূলক নয়, কিন্তু এ দুই জীবনের মধ্যে প্রভেদও রহিয়াছে। Pagan শুধু প্রাণধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট এবং সম্মুখীন সুখভোগেই তৃপ্ত, জীবনে উচ্চাদর্শের প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করে নাই। কিন্তু এই নাগরকজীবনের পিছনে অনেক আত্মসংস্থিতি, শিক্ষা ও সংস্কার গুপ্ত রহিয়াছে। নতুবা তাহার জন্য এত দর্শন ও যুক্তিবাদের অবতারণার আবশ্যকতা ছিল না, এবং বাৎস্যায়ন, চারায়ণ, শুক্র, বাভ্রবীয় প্রভৃতি বিভিন্ন আচার্য্য ও সূত্রকারগণের গ্রন্থপ্রণয়ন এবং মতদ্বৈধও নিতান্ত নিরুদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। এই নাগরকগণের তিনটী বিশিষ্ট দানের উল্লেখ করিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। যে তিনটী গুণ তাঁহাদের জীবনকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছিল, সে তিনটী,—সৌন্দর্য্য, সামঞ্জস্য ও সুসংযম। এই তিন গুণের মিলন সাধারণ জীবনে অতি বিরল। প্রসাধন ও অঙ্গ-রাগাদির ঘটা থাকিলেও, তাঁহারা আপনাকে কখনও অযথা বিলাসভারে পীড়িত করেন নাই; জীবনে ইন্দ্রিয়ভোগের সুযোগ থাকিলেও, তাঁহারা মাধুর্য্য ও সংযমের অনুরাগী ছিলেন, এবং বেশভূষার প্রচুর আয়োজন থাকিলেও তাঁহারা আড়ম্বরহীন সৌষ্ঠবেরই পক্ষপাতী ছিলেন। সত্য ও সুন্দরের উপাসনা তাঁহারা প্রতিনিয়তই করিতেন, কিন্তু জীবনকে মনোজ্ঞ করিতে গিয়া তাহাকে কখনও নিরর্থক ও অরুচির করিয়া তোলেন নাই। মোট কথা, জীবনকে দেখিবার, ভোগ করিবার ও যথাযথ উপলব্ধি করিবার সেকালের একটী বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল। অবশ্য ইহাকে যদি কেহ Paganism বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে আমরা বিদেশীয় কবির সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে চাই যে আমরা পুনরায় এইরূপ Pagan হইতে স্বীকৃত আছি; কেননা তাহাতে অন্ততঃ আজকালকার অসুন্দর আবেষ্টন হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

অনেকদিনের কথা। শাহজাদা সেলিম সবে জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেছেন আর মেহেরউন্নিসাকে ছিনিয়ে এনে তাঁর জহান আলো করার ফন্দি আঁটছেন। সেই সময়ে দিল্লীর উপকণ্ঠে এক কুঁড়ে ঘরে অশীতিপর এক ফকীর বাস করেন। বৃদ্ধ হয়েছেন, আর ঘরের বাহির হ'ন না। বহুলোক তাঁর কাছে আসে, পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য নয়, গল্প শুনতে। ফকীর রাজা-উজীরের পুরানো গল্প অনেক করেন। সব গল্প যে নিছক সত্য তা বলা যায় না, তবে সত্য-মূলক বটে। আকবর বাদশাহের আমলে অনেক বৎসর ধ'রে প্রতিদিন এই শাহসাহেব রাজধানীর এক প্রশস্ত রাজপথে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে বসতেন। নীরবে ব'সে থাকতেন। কখনও "এক পয়সা দাও বাবা" ব'লে লোককে বিরক্ত করতেন না। তবু অযাচিত দানে তাঁর ভাণ্ড রোজ ছাপিয়ে উঠত। কেউ কেউ অলস অকর্ম্মণ্য ব'লে গালিও দিত না, এমন নয়। তবে ফকীর গালিগালাজ গায়ে মাখতেন না, ভিক্ষা-লব্ধ ধন নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় আল্লার নাম করতে করতে বাসায় ফিরতেন। সেই রাজপথে অবিরাম জনস্রোত ব'য়ে যেত, রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাহ, সিপাহী, সৌদাগর সব রকমই। ফকীর সবাইকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন, সবাইকে পরিচিত বন্ধু ব'লে মনে ক'রতেন। এক শীতের সন্ধ্যায় খোদ বাদশাহ সেই পথে যেতে যেতে তাঁকে এক কাশ্মীরী শাল বখশীশ করেন। আর একবার মিঞা তানসেন তাঁকে দুই আশরফী দান করবার সময় সুর করে কি এক গজল গেয়ে দিয়েছিলেন। ফৈজী, বীরবল, আবুল ফজল, টোডর মল এঁদের হাত থেকে ত কতবারই ভিক্ষা পেয়েছিলেন। মানসিংহ কাবুল থেকে বিজয়-বাহিনী নিয়ে ফেরবার পথে ফকীরকে পাঁচ আশরফী দিয়ে প্রণাম ক'রে দুয়া চেয়েছিলেন। এই রকম নানা কাহিনী ফকীরের সঞ্চয় ছিল। ডালপালা দিয়ে এই সব পরের কথা বলাই ছিল তার বৃদ্ধ বয়সের পেশা। নিজের কথা বলতেন না, কারণ বলবার মত কিছু ছিল না। লোক-রঞ্জনই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

আমার অবস্থাও কতকটা এই শাহসাহেবের মত। যে যুগে অর্দ্ধশতাব্দীর বেশী কাটিয়েছি সে যুগ আকবরের যুগের মত সমৃদ্ধ না হলেও ভারতের ইতিহাসে এক মহাসন্ধিস্থল। ফকীরের মত, আমিও এই পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে অনেক অযাচিত দান পেয়েছি আর নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছি। সে সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বন্ধুমহলে অনেক গল্পই ক'রে থাকি। তারই দু'দশটা নিয়ে আজ সাহস ক'রে এই বড় আসরে হাজির

হয়েছি। প'ড়ে কারও ভাল লাগলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। একটা ছোট গল্প ব'লে আমার মনের কথাটা আরও পরিষ্কার করে নিই। এক দিন ভোরের বেলায় এক বলদ তার মুনিবের ক্ষেতে লাঙ্গল টানছিল। সেই সময় তার এক স্বজাতি সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাকে সম্ভাষণ ক'রে বল্লে, "কি ভাই, এত ভোরে করছ কি?" বলদ কিছু বলবার আগেই, তার শিঙ্গে বসেছিল এক মাছি, সে গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, "আমরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছি।" ঐ মাছির মত আমিও ঘটনা-চক্রে শৃঙ্গোপরি অধিষ্ঠিত হয়েছি, কিন্তু "লাঙ্গল দিচ্ছি" এ কথা মনে করার মত কল্পনা-শক্তি কখনও হয় নি।

উত্তরাধিকার সূত্রে আমি বর্দ্ধমান জেলার লোক। বর্দ্ধমানের নাম না শুনেছেন এমন কি কেউ আছেন? যদি থাকেন তাঁর জন্য নিজের জেলার গুণগান একটু করব। একদিন সুদূর দাক্ষিণাত্যের রাজকুমার সুন্দর বহু আয়াসে এইখানে বিদ্যালাভ করেন। লাভ করার আগে কিন্তু মশানে প্রায় নিজের মাথাটা দিয়ে ফেলেছিলেন। সুন্দর যা পারেন নি, সের আফগান সপ্তদশ শতাব্দীতে সেটা করলেন। কাঁচা মাথাটা দিলেন মেহেরউন্নিসাকে বিয়ে করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে। অনেক দিন গেল, আবার একজন এখানে মাথা দিলেন। তিনি হিন্দুবীর শোভাসিংহ। মোগলসৈন্যকে হারিয়ে দিয়ে মেদিনীপুর হ'তে অপ্রতিহত-গতিতে মুরশিদাবাদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে বর্দ্ধমানে মতিচ্ছন্ন ধরল। রাত্রে শিবিরে রাজকুমারীর ছোরার ঘায়ে তাঁর হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন শেষ হ'ল। ইদানীং কৈ আর এরকম ঘটনা বর্দ্ধমানে হওয়ার কথা শুনিনি। সব চুপচাপ।

এই বিখ্যাত জেলার এক প্রান্তে দামোদর পারে অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামে আমার বাড়ী। দু'তিন পুরুষ আগে গ্রামখানা আমাদেরই ছিল; শুনেছি প্রপিতামহ-মহাশয় চাষীদের উপর রাগ ক'রে তাদের জব্দ করবার অভিপ্রায়ে রাতারাতি এক নামজাদা জবরদস্ত জমীদারের কাছে বেচে দেন। সেই থেকে আমরাও নিজ গ্রামে প্রজা হয়ে গেলাম। নিকটস্থ দু একটা গ্রামের এক আধ পাই বখরা থাকার দরুণ একেবারে প্রলেটেরিয়েট শ্রেণী-ভুক্ত হওয়া গেল না। "গাঁয়ের বাবুরা" নামটা রইল। পিতামহ নিরীহ লোক ছিলেন, তবে পুরানো বাড়ীর দেউড়ীর চালায় লুকান শখানেক মরচে-পড়া সড়কীর মাথা একবার ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। এক সময় সেগুলো ব্যবহারে লাগত মনে করলে দোষ হয় না। আমরা শাক্তবংশ বটে কিন্তু সড়কী দিয়ে ত আর পাঁঠাবলি হয় না। বর্দ্ধমান জেলার নামও খারাপ ছিল। শুনতে পাই, যখন খ্যাতনামা কাপ্তেন শ্লিম্যান ঠগী দমন

ক'রে এলেন তখন কোম্পানী-বাহাছুর আমাদের জেলার লোককে শান্ত শিষ্ট করবার ভার তাঁকে দেন। তিনি এমন জোরে শান্তিস্থাপন করেছিলেন যে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁর নামে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত। এখনও খায় কিনা জানি না। কারণ আবার যা দিনকাল পড়েছে, গরুর কথা দূরে থাক, ছাগলেও বাঘ-সিংহির জল কেড়ে খাচ্ছে।

আমার মামার বাড়ী রায়না। গ্রামটা এক সময়ে সকলেই জানত, তবে ডাকাতে রায়না এই নামে। বাঙ্গলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ডাকাইতে জমীদারে অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ভব্য শিষ্ট আমরা একথা স্বীকার করতে লজ্জা পাই; কিন্তু কথাটা সত্য। আমার মাতামহকে ছেলেবেলায় দেখেছি। সে কালের গ্রাম্য জমীদারের দোষগুণ সবই তাঁতে ছিল, কিন্তু মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তাঁকে দেখলেই একটা রোমান্টিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসাতে প্রাণ ভ'রে উঠত। তিনি রায়খাদে কি দামোদরের চরে ডাকাতি কখনও করেননি বটে, কিন্তু আশ-পাশের যত পাক, লেঠেল, ঠ্যাঙ্গাড়ে তাঁকে যমের মত ভয় করত। অনেকেই লাঠি খেলায় তাঁর সাকরেদ ছিল আর জানত যে তিনি নিজে লাঠি ধরলে দশজন লোকের মওড়া নিতে পারেন। দাদামশায়ের প্রধান কাজ ছিল প্রতিবেশী জমীদারদের সঙ্গে দাঙ্গা করা। এই ক'রে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব খুইয়েছিলেন। আমার মনে আছে একদিন বলেছিলেন,"—কোম্পানী জেলায় জেলায় যে রকম কাজী কোটাল বসিয়েছে, আর ভদ্রলোকের বাঁচবার উপায় রাখলে না।" সেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। আমাকে এক চমৎকার কুকরী ও আমার ছুই ভাইকে এক তলোয়ার ও এক সাঁজোয়া উপহার দিয়েছিলেন। সেগুলোর ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু নির্দ্দেশ করেননি, তবে ইঙ্গিত করেছিলেন যে কুকরীটা সব রকম রক্তই খেয়েছে। আমি যে যুগের লোক, তাকে সব রকম খোরাক আর কোথা থেকে দেব, তবে অনেক অভ্যাসের পর ছেলেবেলায় ছু চারটে ছাগমুণ্ড কেটেছি। স্বয়ং দেবী যখন আজ ছাগ রক্তে তুষ্ট তখন খড়্গের তুষ্টি হয় নি, মনে করার কারণ নেই। দাদামহাশয়ই বা ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তাঁর হাতিয়ারকে নররক্ত কি ক'রে যুগিয়ে ছিলেন তা পাঠক কে বোঝান দরকার। তাঁর রীতি এই ছিল যে প্রতিপক্ষকে খবর না দিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা করতেন না। কারও সঙ্গে মন কষাকষি হ'লে তাকে এই রকম একটা চিঠি দিতেন—কাল ভোর চারটের সময় আমি অমুক গ্রামে আমার কলুপুকুরে মাছ ধরতে যাব, আপনার রুচি হয় ত আমাকে বাধা দিবেন।" কলুপুকুরের মালিকী সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার আছে কি? বিপক্ষ রাত তিনটা হ'তে পুকুর ঘেরাও ক'রে ব'সে থাকতেন, এঁরা চারটের সময় মশাল জ্বেলে লাঠি হাতে

উপস্থিত হ'লে বল পরীক্ষার পর কলুপুকুরে মাছ ধরার হক সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত হ'য়ে যেত। কোম্পানীর আদালত উকীল জেঁকে বসবার আগে এর আর আপীল চলত না। সচরাচর এই রকমের হাঙ্গামায় নায়েব হুকুম দিলেই কাজ হ'ত। বড় জোর ছু'চারটে হাত প ভাঙ্গত। কিন্তু ঝগড়ার কারণটা একটু গুরুতর হ'লে লড়াই হ'ত a l'outrance, অর্থাৎ খুনের মার। খুনের মারের বিশেষত্ব এই ছিল যে কর্ত্তা নিজে অভিযানের নেতা হ'য়ে গিয়ে হুকুম না দিলে লাঠি সড়কী উঠত না, হুকুমটা দিয়ে চলে গেলেই নিয়ম পালন হ'ত, কিন্তু আমার দাদামহাশয় "Go on, lads"-এর পরিবর্ত্তে "Come on, lads" বলাতেই অভ্যস্ত ছিলেন। এই রকম কোনও শুভলগ্নে তাঁর কুকরীদেবীর নররক্ত পান ঘটে থাকবে। একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি যে আমার মাতুলকুল বৈষ্ণব। কিন্তু তা'তে কাজ বাধত না। বৌদ্ধ হিন্দু, শাক্ত বৈষ্ণব, আর্য্য অনার্য্যের মহা সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই বাঙ্গলা দেশ।

একবার তাঁর কুকরীঠাকরুণকে এই রকম রক্তপান করনোর পর দাদামহাশয় পালকী চেপে ছু-আড়াই ঘণ্টায় আটক্রোশ পথ ভেঙ্গে সদরে গিয়ে ভোর বেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবের সঙ্গে "জনাব, মেজাজ শরীফ" ক'রে এলিবি প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর পালকীটার হাতল বড় করা যেত, আর আটজন বাহক একসঙ্গে কাঁধ দিয়ে সেটাকে নিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে পারত। সাহেব এতটা জানতেন না। তখন ত আর সি, আই, ডি, ছিল না।

সেকালে গ্রামে বিনা অনুমতিতে পুলিশ ঢুকত না। আমার যে ভাই গ্রামে এখন আমাদের প্রতিনিধি তিনি গৌরব ক'রে বলেন, "বড়-দা, আর ত সব গেছে, কিন্তু আপনাদের আশীর্ব্বাদে আজও গাঁয়ে পুলিশ ঢুকতে দিই নি।" আজ এটা কথার কথা, কিন্তু এক সময় এই জাঁকের একটা গভীর অর্থ ছিল। এই ভাবের জন্যই বাঙ্গলা বারোভুঁইয়া বাঙ্গলা ছিল, আর বারোভুঁইয়া ভাঙ্গতে সম্রাটদের এত কষ্ট পেতে হয়েছিল। রাজনীতি এসে পড়ছে, আবার গল্পের রাজ্যে আশ্রয় নিই। একটা রীতি সেকালে ছিল যে গ্রামের মাঝখান দিয়ে কেউ পালকী বা ঘোড়ায় চড়ে যেত না, গেলে গ্রামের বাবুর অসম্মান করা হ'ত। একদিন আমার মাতামহ বৈঠকখানা বাড়ীতে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে আছেন। একটা সামাজিক ব্যাপারের বিচার চলেছে। পাইক জনকয়েক নীচে বসে আছে। এমন সময় দূরে পালকীবেহারার অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ব্যাপার কি দেখতে পাইক ছু'জন ছুটে গেল। তারা এসে জানালে যে পুলিশের একজন ছোকরা সাহেব পালকী ক'রে যাচ্ছেন।

কর্ত্তা তখন তাঁর এক মুসলমান সরদারকে বললেন, "যা ত একবার, এ কি মগের মুল্লুক নাকি ?" সরদার একটু পরে ছোকরা সাহেবকে নিয়ে উপস্থিত হ'ল। দাদামহাশয় সাহেবকে গ্রামের রেওয়াজ কি তা জানালেন। সাহেবের মোটা বুদ্ধি সে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে না চেষ্টা করে জোর ইংরেজীতে কি কি চীৎকার ক'রে বললে। দাদামহাশয় ইংরেজী বুঝতেন না, বেতমিজ, গোস্তাগী ইত্যাদি কয়েকটা ফরাসী শব্দ প্রয়োগ করে হুকুম দিলেন যে সাহেবকে গ্রামের বাহির দিয়ে চলিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সরদার হুকুম পালন করলে, কিন্তু শোনা যায় যে দু'চার ঘা পাদুকা প্রহারও করেছিল। দু'দিন বাদ ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব দাদামহাশয়কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন যে তিনি হীরালালবাবুকে আশরাফ আদমী ব'লে জানতেন কিন্তু বাবু যখন সাহেবের ইজ্জৎ রাখতে জানেন না তখন তিনিও আর বাবুর ইজ্জৎ রাখবেন না। দাদামহাশয় নিতান্ত ভালমানুষ সেজে জিজ্ঞাসা করলেন যে কি হয়েছে। যা' শুনলেন তা'তে বুঝলেন যে ছোকরা সাহেব জুতো মারার কথাটা প্রকাশ করেনি। তখন তিনি বললেন, "সাহেব, তোমরা ত কেউ কোনও দিন আমার গ্রামের পথে পালকী চ'ড়ে যাও না। এ সাহেব নাদান, না জেনে গিয়েছিল তাই আমার লোক তাকে গ্রামের বাহিরের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য আমি মাপ চাইছি। তাঁকে ডাকাও, তিনি যদি বলেন যে আমার আর কিছু কসুর হয়েছে তাহলে আমাকে সাজা দিও।" ছোকরা সাহেবটী এলেন কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলেন না যে জুতো খেয়েছেন। তখন দাদামহাশয় তার কাছে মাফ চেয়ে বললেন, "সাহেব তুমি নূতন হাকীম, এখনও সব বোঝ না, কিন্তু এটা মনে রেখো যে তোমরা আমাদের মান না রাখলে আমরাই বা তোমাদের মান কি ক'রে রাখব ?" বড় সাহেবও এই মর্ম্মে দু'চার কথা বলার পর শান্তি স্থাপন হ'য়ে গেল, দাদামহাশয় রোকশত নিলেন।

গল্পগুলো শুনে হয় ত অনেকে চিন্তাকুল হবেন, ভাববেন যে এই সব আধা ফিউডল্ জমীদারের ঘরে বর্ত্তমান যুগের ভাবপ্রবণ কাব্যশাস্ত্র-বিনোদী তরুণের দল কি ক'রে জন্মাল ? কিন্তু কবিভাব বাঙ্গালীর মজ্জাগত। জয়দেব ঠাকুর যে দিন গেয়েছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্", সেদিন হ'তে আজ পর্য্যন্ত এই ভাবের ধারা শুকায় নি। লাঠিবাজী ও ললিতকলা মোগল যুগে কি রকম পাশাপাশি চলেছিল তার আভাস ত রবিবাবু বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে দিয়েছেন। আমার দাদামহাশয়ের আমলে বাঙ্গলা দেশে সনেট আসেনি, তখন যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন, হাপাকড়াইয়ের দিন। কাজেই তিনি এ সবেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। দিবারাত্র ছড়া কাটতেন, গজল আওড়াতেন, কখনও আবার যাত্রার পালা পর্য্যন্ত বেঁধে

দিতেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও জমীদারী চাল ছিল। একটা গল্প বলি। গ্রামে এক ভিখারী বৈষ্ণব গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াত। একবার সে কোথা হ'তে এক নূতন গান শিখে এসে মহা ধুম লাগিয়ে দিলে। গানটা ছিল "নদীয়ায় অবতরি ইত্যাদি।" গোসাঁই কিন্তু জোর ক'রে গাইত, "নদীয়ায় রব তরী"। দাদামহাশয় সব বিষয়ে যেমন গ্রামের একচ্ছত্রী রেফারী ছিলেন, সাহিত্যেও তাই। তিনি গোসাঁইকে ডেকে অনেকবার সাবধান ক'রে দিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। সে আবার একদিন বৈঠকখানার সামনে এসে খুব সুর ক'রে "রব তরী" গাইতে লাগল। তখন আমার কবি-দাদামহাশয় হতাশ হ'য়ে জমীদার দাদামহাশয়ের শরণাপন্ন হলেন। হুকুম হ'ল, "বোষ্টম ব্যাটাকে কয়েদ ক'রে রাখ, যতক্ষণ না অবতরি বলতে শেখে।" অনেক ঘণ্টা অবরোধে থেকে বোষ্টম শেষটা বুঝলে যে গোরাচাঁদ নদীয়ায় "অবতরণ" করেছিলেন "রবতরী" করেননি। এসব জমীদারের দল বাঙ্গলা দেশ থেকে আজ অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। হয়ত ভালই হয়েছে। কিন্তু তাঁদের প্রভাব বোধ করি আজও পূরোদস্তুর বলবৎ রয়েছে। নইলে 'অটোক্রাট' বিহনে বাঙ্গলা দেশে কোনও কাজ চলে না কেন ?

আর দেশের কথা বলব না। ক্রমশঃ প্যাক্স্ ব্রিটানিকা ও ম্যালেরিয়া দেশে জমী নিয়ে বসল। আমার বাবা গ্রাম ছেড়ে ইংরেজী শিক্ষা ও চাকরীর পথে বাহির হ'য়ে পড়লেন। আমারও দেশে জন্ম নেওয়া হ'ল না। কোথায় বা দামোদর অজয়, কোথায় বা সেই কাঁকরে ভরা লাল মাটি, কোথায় বা ধানের ক্ষেতের সমুদ্রের মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। জন্মালেম গিয়ে সুদূর উত্তরে হিমালয়ের কোলে এক স্বাধীন রাজ্যের মন্ত্রী-মহাশয়ের ঘরে। স্বাধীন রাজ্য শুনে কেউ হাসবেন না যেন। স্বাধীনতা জিনিসটা আপেক্ষিক। কোথায় যেন পড়েছিলাম, ভাণ্ড দুই মধুপানের পর মনিবে গোলামে কোনও তফাৎ থাকে না, দুজনেই সমান স্বাধীন। যাক্, আমার এই জন্মস্থান খেলাঘরের স্বাধীন রাজ্য হলেও ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ আমাদের মহারাজকে দেখলে স্বতঃই মনে হ'ত সেকালের কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, কোশলের রাজাদের কথা। ছেলেবেলাকার কল্পনা এঁকে নিয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই না দেখেছে! মহারাজ সাহেবদের সঙ্গে অনেক সময় কাটাতেন। এই নিয়ে নূতন রাষ্ট্রীয়ভাবে উদ্দীপ্ত দেশের লোক তাঁর নিন্দাবাদও অনেক করত। কিন্তু তাঁর নিজের জাতীয় গৌরব যে কত বেশী ছিল তা' যে তাঁকে কাছাকাছি দেখেছে সেই জানে। দুই একটা গল্প এখানেই বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না, যদিও অনেক পরের কথা।

ইং ১৯০৩ সালে বৃটিশ বাদশাহীর ইজ্জৎ বাড়াবার জন্য লাট কার্জ্জন সাহেব দিল্লীতে দরবারের বন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর কার্জ্জন-বাহাদুরের নিজের গৌরব বৃদ্ধি যে একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা সে সময়ের সবাই জানেন। বাদশাহের খুড়া-মহাশয় এসেছিলেন বটে, কিন্তু সব বিষয়ে তাঁর হ'ল দ্বিতীয় স্থান। জিনিসটা রাজাদের ভাল লাগেনি কিন্তু তাঁরা বৈতসীবৃত্তি অবলম্বন করলেন। দুই একজন, যথা বড়োদার মহারাজ গায়কোয়াড়, একটু মাথা খাড়া করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মোটের উপর কার্জ্জন-লাটেরই জয় জয়কার হয়েছিল। যখন লাট-সাহেব দিল্লী পৌঁছেন, আগে থেকেই রাজাদের (অন্ততঃ ছোট খাটো রাজাদের) প্লাটফর্ম্মের উপর সারবন্দি হ'য়ে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। অনেক দেরী হওয়াতে কোমল-শরীর রাজবৃন্দ একটু শ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিলেন। এক বেচারা ক্ষুদ্র কাঠিয়াবাড়ী রাজা কাসি পাওয়াতে সারি ছেড়ে যেই পেছনে গেছেন অমনি এক মহাকায় ইংরেজ সেনাপতি লাফিয়ে এসে তার কাঁধ ধ'রে তাঁকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিলে। রাজা-মহাশয়ের কাসিই পেয়েছিল, কাশীপ্রাপ্তির কোনও ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। সেই রাজ-শ্রেণীতে শিখ, মরাঠা, রাজপুত, পাঠান সবাই ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভাবে এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন, যে এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা তাঁদের নজরেই পড়ল না। তখন আমাদের মহারাজ ধীরে ধীরে গজেন্দ্র-গমনে সারি ছেড়ে দুই একবার টহল দিলেন। দেওয়ার সময় খাপের ভেতর তলোয়ারটা একটু বোধ হয় ঝন্ ঝন্ করে থাকবে, কেননা ব্রিটিশ সেনানী সেবার চুপ ক'রে গেলেন। গল্পটা ভাল হ'লেও সত্য।

এই গান্ধী-যুগের আগে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস ছিল যে সাহেব দেখলেই মেরুদণ্ড অতি সহজে বেঁকে যেত আর একটা অতি অমায়িক হাসি মুখখানাকে বিকৃত করে দিত। যাঁরা খুব বড় লোক, রাজা উজীর মানুষ, তাঁদেরও এ লক্ষণ দেখেছি, আমাদের মত সাধারণ লোকের ত কথাই নেই। আর একটা রোগ প্রবল ছিল, আমাদের খাওয়া পরা, ঘরদোর সম্বন্ধে আমরা সদাই জগতের কাছে বড় লজ্জিত থাকতাম। পরনের ধুতি, খাওয়ার অন্ন ব্যঞ্জন, অর্দ্ধনগ্ন আত্মীয় স্বজন এ সব অতি সঙ্গোপনে সাহেব-চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতাম। মহারাজের আর্য্যামি ছিল না বরং ষোলো আনা সাহেবি ছিল কিন্তু যে রোগের কথা উপরে বলেছি তার কবলে তিনি কখনও পড়েননি। বৎসরান্তে যে দরবারী ভোজ হ'ত তা' সম্পূর্ণ বাঙ্গালী রীতিতে। নিজে ত ধুতি পরতেনই, অনেক সময় তাঁর ইংরেজ কর্ম্মচারীরাও ধুতি পরে আসন-পীঁড়ি হয়ে দিব্য দু'হাতে খেতেন।

একবার ভাদ্র মাসে মহারাজ তাঁর ফুটবল খেলোয়াড়দের কলিকাতায় খেলিয়ে কুচবেহার ফিরছিলেন। সবাই ধুতি পরে চটি পায়ে। শিয়ালদহ ষ্টেশনে হঠাৎ ফ্রেজার লাট-সাহেব এসে উপস্থিত। তিনিও সেই গাড়ীরই যাত্রী। অর্দ্ধ নগ্ন হ'লেও রাজা ত বটে, কাজেই সাহেব পাশ দিয়ে যাবার সময় দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড সৌজন্য ক'রে গেলেন। বোধ হয় সেই সৌজন্যের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন Britannia rules the waves ভাব ছিল, হয়ত বা ছিল না। কিন্তু মহারাজ ঠিক করলেন সাহেবের সঙ্গে একটু বনেদী ধরণের সামাজিকতা করবেন। ট্রেণ ছাড়ার পর বারাকপুরে একজন কর্ম্মচারী (A. D. C.) পাঠিয়ে লাট-বাহাদুরকে খানায় নিমন্ত্রণ হ'ল। লাট নিমন্ত্রণ কবুল করলেন। ট্রেণ রাজপ্রতিনিধি পিঠে ক'রে সদর্পে এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে মহারাজের পার্শ্বচরেরা শশব্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। স্বয়ং লাট খেতে আসবেন অথচ মহারাজ কাপড় বদলানোর নামও করেন না। শেষে একজন প্রবীণ বয়স্য সাহস ক'রে কথাটা পাড়লেন যে খানার পোষাক পরতে একটু সময় লাগবে আর লাট এলেন ব'লে। মহারাজ হেসে বল্লেন, "লাট ত আর পোষাক খেতে আসছে না। তোর ইচ্ছা হয় এই গরমে জামা-জোড়া আঁটিগে যা।" দুচার ষ্টেশন পরে লাট তলোয়ার বাঁধা কাপ্তান সঙ্গে ক'রে এসে উপস্থিত হলেন। মহারাজ অতিথিকে আদব কায়দা মত অভ্যর্থনা ক'রে খাবার কামরায় নিয়ে গেলেন ও বল্লেন, "আমাদের আজ লুচী তরকারী খাওয়ার কথা কিন্তু আপনার জন্য ইংরেজি খাদ্যও তৈরি আছে, যেমন আদেশ করবেন তেমনিই খাওয়া হবে।" 'সুপিরিয়রিটি কম্প্লেক্সে' একটু ধাক্কা লাগল বোধহয়, কিন্তু সাহেব অমায়িক হাসি হেসে বল্লেন, "আজ আর সুরুয়া রোষ্ট নয়, আসুন আনন্দ ক'রে সবাই লুচী খাওয়া যাক্।" ষোড়শোপচারে লুচী সেবা হ'ল। পানীয় কোন্ দেশের প্রথামত এল সে সম্বন্ধে আমি খোঁজ করিনি।

মহারাজের একটা নিন্দার কথা এখানে না ব'লেও থাকতে পারছি না। তিনি আমাদের বাঙ্গলাদেশের জমীদার প্রভৃতি বড়লোকদের অনেক লোকসান করেছিলেন। এই ভদ্রলোকেরা প্রাণপণে কুচবেহারিয়ানা করতে যেতেন কিন্তু ফল অনেক সময় বড় বিশ্রী হ'ত। একটা উদাহরণ বলি। কুচবেহারের গাড়ীর উপর, চাকরের উর্দ্দির উপর, ও আসবাব পত্রে C. B. এই দুই অক্ষর ও একটা মুকুট আঁকা থাকত। সেই দেখা দেখি চারিদিকে B. B., P. P. ইত্যাদি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠল। লোকে জানতে চাইলে না যে বাগনান দুটো B কি ক'রে হয়, পলাশীতেই বা দুটো P কোথা থেকে আসে। তার পর মুকুট, যে রাজার রাজ্য

নেই তার মুকুটই বা কোথায়? অথচ একটা কিছু তাজের মত অমনি সঙ্গে দেওয়া চাই। আরও গোল হ'ল যাঁরা নামেও রাজা নন তাঁদের। তাঁরা নিজের নামের অক্ষরটা বেঁকিয়ে তুবার লিখে উপরে একটা গোলাপের ফুলের মালা দিয়ে দিলেন। আভিজাত্যের যদি কোনও দেবতা থাকেন ত তিনি এ সব দেখে কি হাসিটাই না হেসেছেন! ক্রমশঃ পাড়াগাঁর জমীদারেরা স্বয়ং বিদেশে গিয়ে মন্ত্রদীক্ষা সংগ্রহ করে আনতে সুরু করলেন। তখন আরও অদ্ভুত জিনিষ সব ঘটতে লাগল। তবে মহারাজকে আর দায়ী করবার কারণ রইল না।

আর পরনিন্দা ক'রে কাজ নেই। একটা গল্প আছে, নৃপেন্দ্র-[illegible] সংবাদ সেটা পরে যথাস্থানে বলব। এখন অনেকটা পথ পিছিয়ে কুচবেহারে যেতে হবে। আমার ছেলেবেলার দেখা জিনিস দুই একটা বলতে চাই। আমি ত একরকম বলেইছি যে আমার জন্ম, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে, রূপোর ঝিনুক মুখে নিয়ে। শুধু তাই নয়, প্যারেড ময়দানে যে পেতলের তোপটা ছিল সেটা সাতবার দাগা হয়েছিল। জ্যোতিষী-ঠাকুরের হুকুম ছিল যে তিন বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত মাটিতে পা না পড়ে। তা পড়ে নি, কোলে কোলেই ফিরতাম। অন্নপ্রাশনের দিন হাতী চড়ে মিছিল করে ঠাকুর প্রণাম ক'রে এসেছিলাম। মহারাজ তাঁর অমাত্যকে সত্যি ভালবাসতেন। একটু বড় হ'য়ে নিজের শৈশবের সব কথা শুনতাম। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্রের রূপকথাও কম শুনিনি। এর ফলে আমার রূপকথার রাজ্যে জীবন কাটানোরই কথা। কিন্তু ক্রমশঃ ভারতের ভাগ্য-আকাশে এমন এক ধ্রুবতারা উঠল যে গন্তব্য পথ নিয়ে ভাবী ভারত-সন্তানের আর কোনও গোলযোগ রইল না। আমার জন্মের বিশ বৎসরের আগে দেশে যে তুফান উঠেছিল, তার জের রয়েই গেল। জগদীশপুরের কুমারসিংহের অলৌকিক সাহস, গঙ্গামায়ীর তাঁর প্রতি অসাধারণ কৃপা, ইংরেজের মকরাক্ষনীতি, অর্থাৎ গরুর পালের আড়াল থেকে তাঁর উপর অগ্নিবাণ বর্ষণ, এই সব গল্প-কথা অহোরাত্র বাড়ীর হিন্দুস্থানী সিপাহী-বরকন্দাজদের কাছে শুনতাম। আমাদের বৈঠকখানায় একটা চীনা মাটির পুতুল থাকত, তার মাথায় একটা হাঁড়ির মত ফুলদানি ছিল। আমার গল্প-শিক্ষকেরা ব'লে দিয়েছিল, যে সেটা ঝাঁসীর রাণীর মূর্ত্তি, ঐ রকম হাঁড়ীতে আগুন ভ'রে তাঁর মাথায় চাপিয়ে তাঁকে কোম্পানী প্রাণে মারেন। কখনও বা শুনতাম যে অশ্বত্থামা হনুমান্ প্রভৃতি পৌরাণিক বীরেরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগে অনেকবার দেখা গেছে, একদিন না একদিন নিশ্চয় হিন্দুর দুঃখে তাঁদের মন গলবে। সব কথাই বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতাম। শৈশবের

ইতিহাস শেখা এই রকমেই হয়েছিল। কুচবেহারে দু'চার ঘর সাহেব ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল, খুব ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ী খেলাধুলো করতে অনেক যেতাম, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি, কারণ চারিদিকে লোকে কেবলই মনে করিয়ে দিত যে এরা আমাদের রাজার মাইনে-খাওয়া সাহেব, এ রকম সাহেব সাবেক কালেও অনেক ছিল। বাঙ্গলা পড়তে শেখার সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের আগেই "আনন্দ মঠ", "নীল দর্পণ" প'ড়ে চুকিয়েছিলাম, বুঝি বা না বুঝি। আমাদের সচরাচর আবৃত্তির পদ্য ছিল, "বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে", "কত কাল পরে বল ভারত রে", "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়" এই সব। ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ায় কিছুদিন পরেই সুরেনবাবুর জেল হ'ল। আমরা সবাই কালো ফিতে পরলাম। সভা ক'রে বক্তৃতা হ'ল, সব বুঝলাম না, কিন্তু মনে একটা স্থির বিশ্বাস হ'ল যে একটা কিছুর সূত্রপাত হচ্ছে। ইস্কুলে আমাদের ইতিহাসের বই ছিল হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষ। তার এক জায়গায় এই উল্লেখ ছিল, "His adopted son, Nana Sahib was the infamous leader of the Sepoy Mutiny"। মাষ্টার মহাশয় ক্লাসে এসেই শেষ কয়েকটা কথা কেটে দিয়ে লিখে নিতে বল্লেন, "The illustrious leader of the Great Sepoy war"। শিক্ষা এই ভাবেই চলল। স্বপ্ন যা দেখতে শিখলাম তাও এই শিক্ষারই অনুগামী।

দেশ হ'তে তখনও পুরানো ব্যায়ামের অভ্যাস যায় নাই। খুব ছেলেবেলাতেই পিতৃ-আদেশে ভোরে আখড়ায় মাটি মাখতে হ'ত। হয়ত কসরতের চেয়ে মাটি মাখা ও ছোলা খাওয়াটারই বহর বেশী ছিল, কিন্তু ছাড়ান ছিল না। সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়াও নিত্যনৈমিত্তিকের মধ্যেই ছিল। কখনও কখনও ছুটীর দিনে বাবা আমাদের দু'চারজনকে মফঃস্বলে তাঁবুতে নিয়ে যেতেন। ক'দিন খুব ঘোড়ায় চ'ড়ে নদীতে সাঁতার দিয়ে আনন্দ ক'রে আসতাম। বড় ছেলেরা বন্দুক ছুঁড়তেও পেতেন। যথা সময় সে বিদ্যাও আয়ত্ত হ'ল। তবে শিকারের দৌড় তখন পাখী পর্য্যন্তই ছিল যদিচ বনের পশুরাও অপরিচিত ছিল না। বাঘ প্রায়ই আমাদের গোয়াল থেকে গরু নিতে আসত। ক্যাম্পে গেলে ত কথাই নেই, এক একদিন তাঁবুর আশপাশেই ডাক শুনতে পেতাম। এই সব পাঁচ রকম কারণে wholesome fear-টা (ভয়ডর) শিক্ষার অঙ্গীভূত হ'ল না। পর-জীবনে এর জন্য ভুগতে হ'ল অনেক।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রুষবিপ্লবের ইতিবৃত্ত

১

বল্‌শেভিক্ মতবাদ সম্পূর্ণ নূতন নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কার্ল্ মার্ক্স্ যে-তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহাই আধুনিক বল্‌শেভিক্‌দের বেদবাক্য। মার্ক্সের অন্যান্য শিষ্য ও বল্‌শেভিক্‌দিগের মধ্যে প্রভেদ আছে কিন্তু সে-পার্থক্য আদর্শের নহে—কর্ম্মপ্রণালীর মাত্র। বল্‌শেভিক্ নামটি আকস্মিক—রাশিয়ার সোসিয়ালিষ্ট্ ডিমোক্র্যাটদিগের ১৯০৩ সালের লণ্ডন অধিবেশনে লেনিনের সমর্থকগণ সংখ্যায় অধিক থাকায় তাহারা বল্‌শেভিক্ বা সংখ্যাধিকের দল বলিয়া খ্যাত হয়। রুষবিপ্লবের পর, ১৯১৮ সালে, বল্‌শেভিকেরা কমিউনিষ্ট্ বা সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে। এই নামটি ইহার সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্স্ তাঁহার নিজের দলের আখ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মার্ক্সের মতে অতীত ও বর্ত্তমানের সকল সমাজই শ্রেণীবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের ঐক্য থাকা অসম্ভব—কোন জাতি বা সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র। কার্য্যতঃ চিরকাল এক শ্রেণী অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে এবং যতদিন সমাজের মধ্যে এইপ্রকার স্তরভেদ থাকিবে ততদিন শ্রেণীসংঘর্ষ ও এক পক্ষ কর্ত্তৃক অন্যদের উপর কর্ত্তৃত্ব অনিবার্য্য। রাষ্ট্রশক্তি শ্রেণী-বিশেষের আধিপত্যের নিদর্শন—শাসনযন্ত্র প্রভুদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায়—দেশপ্রেম বা জাতিভক্তি পদানত জনসাধারণকে ভুলাইবার জন্য স্তোকবাক্য। যে-কোন দেশের শ্রমিকদিগের পক্ষে স্বদেশী ধনিক অপেক্ষা বিদেশী শ্রমিকগণ নিকটতর। সমাজের অধিকাংশ লোকের শ্রমোপার্জ্জিত ধনের উপর ভাগ বসাইয়া এতকাল অভিজাতবর্গ ও ধনিকেরা রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে ধনোৎপাদন-প্রণালীর বিপুল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের সঙ্ঘাত ক্রমশঃ সুস্পষ্ট ও প্রচণ্ড এবং শ্রমিক-আন্দোলন জগদ্ব্যাপী হইয়া পড়িবে। ফলে শ্রেণী-বিভাগ উঠিয়া গিয়া সমস্ত মানবসমাজ এক বিরাট শ্রমিকসম্প্রদায়ে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মার্ক্সের এই চিন্তাধারা ইউরোপের অধিকাংশ সোসিয়ালিষ্ট্ দল গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিংশ-শতকে মার্ক্সের অন্যতম পুরোহিত জার্ম্মান নেতা কার্ল্ কাউট্‌স্কি পর্য্যন্ত বল্‌শেভিক্ বিপ্লব সমর্থন করিতে পারেন নাই। লেনিন্ যে কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করেন তাহা ইহাদের নিকট নূতন বলিয়া

মনে হয়। অথচ লেনিন্ তাঁহার মতবাদ মার্ক্সেরই অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কতকগুলি পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বল্‌শেভিক্‌দের নিকট অন্যান্য সোসিয়ালিষ্টেরা মার্ক্স্‌তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিয়া অশ্রদ্ধা ও উপহাসের পাত্র। বিপ্লবের পর সোসিয়ালিজ্‌ম ও কমিউনিজ্‌মের মধ্যে পার্থক্য কি, ইংলণ্ড হইতে এই প্রশ্ন আসিলে, উত্তরে বল্‌শেভিকেরা লিখিয়াছিল যে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পন্থা হইতে ভিন্ন মতগুলি সোসিয়ালিজ্‌ম্‌ই নহে—তাহার ভাণ মাত্র।

মার্ক্সের আদর্শানুসারে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন সম্ভব নহে ইহাই লেনিনের মতের প্রথম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে এই পরিবর্ত্তন সাধারণ গণতন্ত্রের মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, কারণ মধ্যবিত্ত ধনিকশ্রেণী অর্থবল, ধর্ম্মপ্রচার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবে। যাহারা মার্ক্সে বিশ্বাসী তাহাদের কর্ত্তব্য অকস্মাৎ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দেশের শাসনযন্ত্র অধিকার করা। ইহার জন্য দীর্ঘ আয়োজন ও স্থান কাল বিচার, নিশ্চয়ই, আবশ্যক, কিন্তু বিপ্লব ভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য কখনও ঘুচিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবের পরে দেশে শ্রমিক-শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপন করা প্রয়োজন। বিপ্লবের পরমুহূর্ত্তেই শ্রেণীবিভাগ উঠিয়া যাইবে না—সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন সময়সাপেক্ষ। ভবিষ্যতে শ্রেণীশূন্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়টুকু অতিক্রম করিতে হইবে তাহারই জন্য এই অধিনায়কত্বের ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার, ন্যায়ের বিচার—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই সমস্ত আদর্শ বর্ত্তমানে ধনিক-প্রভুত্বের আবরণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ভবিষ্যতে নূতন সমাজ গঠিত হইলে পর গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সত্যসত্যই সম্ভবপর হইবে।

শাসনভার গ্রহণের পর বল্‌শেভিকদিগকে সময়োপযোগী নানারূপ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। অনেক সমালোচকের চক্ষে সেগুলি মত-পরিবর্ত্তনের চিহ্ন। কিন্তু বস্তুতঃ বল্‌শেভিকেরা তাহাদের মূল আদর্শ ও বিশ্বাস হইতে চ্যুত হয় নাই। লেনিনের মতবাদে শ্রমিকদিগের প্রভুত্ব-স্থাপনের দ্বারাই নূতন যুগের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবে।

২

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত আট মাস, সোভিয়েট্ রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম পর্ব্ব। পেট্রোগ্রাড্ ও মস্কো হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবের স্রোত দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। একদিকে

নগরে নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রমিকদিগের নূতন অস্ত্র—সোভিয়েট সমিতিগুলি—গঠিত হইতেছিল; অন্যদিকে নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কেরেন্‌স্কি, কর্ণিলভ্ ও কালেডিনের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল। বহু শতাব্দীর পুরাতন প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রকে রাষ্ট্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। এবং শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য আহূত জাতীয় মহাপরিষদে বল-শেভিকেরা মুষ্টিমেয় বলিয়া যখন সেই সভার কার্য্য সাঙ্গ হইল, তখন রাশিয়াতে অন্যদেশের ন্যায় গণতন্ত্র স্থাপনের আর আশা রহিল না (জানুয়ারী, ১৯১৮)।

মূল আদর্শে নিষ্ঠা ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবন,—বলশেভিক নীতির এই দুই দিকই এই সময়ে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

দেশের সমস্ত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইলেও, জমিদারদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের জমি কৃষকদিগকে ভাগ করিয়া লইবার আদেশ দিতে লেনিন্ ইতস্ততঃ করেন নাই। কৃষকদিগের স্বাতন্ত্র্য সোসিয়ালিজ্‌ম্-প্রতিষ্ঠার পথে বিশেষ বাধা, কিন্তু বিপ্লবের অব্যবহিত পরে তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ নিতান্ত আবশ্যক ছিল। সেই একই কারণে কৃষক-বন্ধু এসারদলের চরমপন্থী শাখার সহিত প্রথম কয়েক মাস একত্র কাজ করিতে লেনিনের আপত্তি হয় নাই—যদিও বিপ্লবের পূর্ব্বে অন্য কোন দলের সাহচর্য্য তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল।

রণক্লান্ত জনসাধারণের মনে বল্‌শেভিকেরা যুদ্ধাবসানের আশা আনিয়া দিয়াছিল। সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধ শেষের জন্য তাহারা এক সন্ধিসভা আহ্বান করে। রাশিয়ার মিত্রশক্তিগণ কেহ ইহাতে যোগ দেয় নাই। সেই সুযোগে জার্ম্মাণী রাশিয়ার নিকট এমন কঠোর সন্ধি প্রস্তাব করে যে বল্‌শেভিকেরা প্রথমে তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু যখন জার্ম্মান-বাহিনী রাশিয়ার মধ্যে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল তখন দেশের সেই অবস্থায় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া অসম্ভব জানিয়া লেনিন্ ব্রেষ্ট্-লিটভ্‌স্কের সন্ধি স্বাক্ষরের আদেশ দিলেন (মার্চ্চ, ১৯১৮)। দুইশত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম দিকে রাশিয়া যতখানি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই রূপে হস্তচ্যুত হইল বটে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম না হইলে বল্‌শেভিক রাজত্ব কখনও স্থায়ী হইতে পারিত না।

যে-সমস্ত পদানত জাতি রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাদের স্বাধীনতাপ্রয়াসে বল্‌শেভিকেরা কোন বাধা দেয় নাই। ইহাতে রাজ্যক্ষয় হইলেও এই জাতিসমূহের মধ্যে বল্‌শেভিক্‌দিগের প্রতিপত্তির সূত্রপাত হয়। ফলে অনেকে সোভিয়েট্ রাজত্বে ফিরিয়া আসে এবং রাশিয়ার মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্বের প্রকোপ কমিয়া যায়।

ধনোৎপাদনের ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বল্‌শেভিক্‌গণ প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রকর্তৃত্ব স্থাপন করে, সাধারণের এই বিশ্বাস সত্য নহে। বিপ্লবের পর ব্যাঙ্ক, রেল, বিদেশী বাণিজ্য পরিচালনের ভার নূতন শাসন-তন্ত্রের অন্তর্গত হইয়া পড়ে কিন্তু ১৯১৮ সালের জুনের পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীকরণের কোন আদেশ দেওয়া হয় নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়গুলিকে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া তাহাদিগকে নিয়মাবদ্ধ করিবার নিমিত্ত ভেসেন্‌হা বা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সৃষ্টি হইল (ডিসেম্বর, ১৯১৭)। শুধু স্থানীয় শ্রমিকদের অবাধ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা প্রভুদিগের পলায়নের ফলে কতকগুলি কারখানা চালাইবার ভার ষ্টেট্ বাধ্য হইয়া গ্রহণ করে। কারখানা-সমিতি গঠন করিয়া পরিচালন-কার্য্যে শ্রমিকদিগকে অংশ দিবার দিকে এই সময় অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। ব্যবসায়গুলির এই অবস্থা ডায়ার্কি বা দ্বৈত-শাসনের অনুরূপ।

নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশের জন্য লেনিনের এই সাবধানতা বুকারিন, র‍্যাডেক্ প্রভৃতি নেতাদের মনঃপূত হয় নাই। তাঁহারা অপমান-জনক সন্ধিসর্ত্ত গ্রহণ ও রাষ্ট্রীকরণে উপেক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেশের প্রকৃত অবস্থা লেনিন্ অধিক বুঝিতেন। তাঁহার সমালোচকদের এই চরমপন্থাকে তিনি, একটি গ্রন্থে, সাম্যবাদীদলের শৈশব-ব্যাধি বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন।

৩

রাশিয়ার আধুনিক ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯১৮ সালের জুন হইতে ১৯২১-এর অগাষ্ট পর্য্যন্ত তিনটি বৎসর। এই সময়টি বল্‌শেভিক্‌দের অগ্নি-পরীক্ষার যুগ। চারিদিক হইতে বিপদ যেন তখন ঘনাইয়া আসিল,—একদিকে অন্তর্যুদ্ধে বল্‌শেভিক্ আধিপত্য ধ্বংসের প্রচণ্ড উদ্যম ও অন্যদিকে বহির্জ্জগতের সহিত সকল সম্পর্কের অবসান। দেশের ভিতরেও অরাজকতা ও দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল।

কৃষকদিগের প্রতি কঠোর ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া এসারদলের চরমপন্থিগণ ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বিদ্রোহের সৃষ্টি করে। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ সোভিয়েট্‌সমূহ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইল। তাহার পর ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের সেনাপতিবৃন্দ নানা দিক হইতে বল্‌শেভিক্‌দিগকে আক্রমণ আরম্ভ করেন। ইহাদের অভিযান বল্‌শেভিক্‌বাদের রক্তপতাকার বিরুদ্ধে বলিয়া ইহাদের অনুচরদিগকে শ্বেত-সেনাদল নামে অভিহিত করা হইত। উত্তরে সেনাপতি য়ুডেনিচ্ দুইবার পেট্রোগ্রাডের দ্বার

পর্য্যন্ত আসেন। দক্ষিণ হইতে সেনাপতি ডেনিকিন্ ও র‍্যাঙ্গেল মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। পূর্ব্বে সমগ্র সাইবেরিয়া কোল্‌চাকের বশ্যতা স্বীকার করে। তিনি ইউরাল্ অঞ্চলে উপস্থিত হইলে স্থানীয় সোভিয়েট্, রাজধানী মস্কোর কর্ত্তৃপক্ষদিগের আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, বন্দী সম্রাট্ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে হত্যা করিল (জুলাই, ১৯১৮)। পশ্চিমে রাশিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী উক্রেন্ ও শ্বেত-রাশিয়া প্রদেশদ্বয় স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করে এবং পোল্যাণ্ডের সহিত কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

জার্ম্মানীর সহিত বল্‌শেভিক্‌দিগের পৃথক সন্ধিতে মিত্রশক্তিরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই সময় শ্বেত সৈন্যদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিতে পশ্চাদপদ হয় নাই। আর্চাঙ্গেল্, ওডেসা, বাকু, ভ্লাডি-ভষ্টক্ প্রভৃতি রাশিয়ার প্রধান বন্দরগুলি ইংরাজ, ফরাসী, আমেরিকান ও জাপানী সৈন্যের অধিকারে আসিল। এইভাবে বিদেশের সহিত রাশিয়ার সমস্ত যোগ ছিন্ন হইয়া যায়।

চারিদিকে বেষ্টিত হইলেও বল্‌শেভিকেরা এই সংগ্রামে জয়লাভ করে। সুবিখ্যাত লোহিত-বাহিনার সৃষ্টি করিয়া ট্রট্‌স্কি দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বল্‌শেভিক্‌দলের অসাধারণ উৎসাহ, কর্ম্মকুশলতা ও নেতাদিগের নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের বিজয়ের অন্যতম কারণ। জমিদারদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের ভয়ে কৃষকেরাও বল্‌শেভিক্‌দের যথেষ্ট সাহায্য করিতে থাকে। গৃহশত্রুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে দমনের জন্য চেকা নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইল—এখনও পর্য্যন্ত গেপেয়ু (G.P.U.) নামে ইহার অস্তিত্ব রাশিয়াতে রহিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তিদিগের সেনাবল ধীরে ধীরে অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যুদ্ধের অবসান হয়। ১৯২১ সালের মধ্যভাগে বল্‌শেভিক্‌দের প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সঙ্কটের দিনে রাশিয়াতে সামরিক সাম্যতন্ত্রের (War Communism) আবির্ভাব হইয়াছিল। আত্মরক্ষার নিমিত্ত বল্‌শেভিক্‌দিগকে দেশের সমুদয় সম্পদ করায়ত্ত করিতে হয়। ১৯১৮ সালের জুন মাসে যখন অন্তর্যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই সকল কারখানায় রাষ্ট্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল। তখন হইতে ব্যবসায়গুলি কেন্দ্র হইতে চালাইবার চেষ্টা হয়। একদিকে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের স্বাধীনতা লোপ করিয়া—অন্যদিকে সমস্ত ধন রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে গণ্য করিয়া শাসকসম্প্রদায় বণ্টনের সুব্যবস্থা করিলেন। স্থির হয়, কৃষকদিগকে অর্থের বদলে বা অন্য দ্রব্যের বিনিময়ে শস্যাদি জোগাইতে হইবে। এই প্রাগ্রসরণ-নীতি অনেক অধীর বল্‌শেভিকের বিশেষ প্রীতি আকর্ষণ করে।

৪

সামরিক সাম্যতন্ত্র যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছিল বটে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ১৯২১ সালে অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। দেশের কেন্দ্র হইতে সমস্ত ব্যবসায় পরিচালনের চেষ্টায় রাষ্ট্রশক্তি সম্যক সফলতা লাভ করে নাই। উৎপন্ন দ্রব্য অনেক কমিয়া গেল। রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ, এইজন্য বল্‌শেভিক্‌দিগকে কৃষকদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। ইচ্ছামত বিক্রয় বন্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক শস্যসংগ্রহে এখন তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগিল। তাহারা শস্যোৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমাইয়া ফেলিয়া নগরগুলিতে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করিল। ফলে ক্রন্‌ষ্টাডের বিশ্বাসী সৈন্যদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত বিদ্রোহ দেখা দেয়।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বল্‌শেভিক্‌দল লেনিনের নেতৃত্বে নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করে। সামরিক সাম্যতন্ত্রের পথ ছাড়িয়া বিপ্লবের প্রথম যুগের নীতিই এখন আবার অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই নব-বিধান রাশিয়াতে নেপ্ (N.E.P.) নামে পরিচিত। কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যাদি ইচ্ছামত বিক্রয় করিবার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইল; তাহাদিগের নিকট এখন হইতে অন্যদেশের ন্যায় শুধু রাজকর সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকেরা পুনরায় খাদ্য ও অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবর্ত্তে বেতন পাইতে লাগিল। দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য বিদেশী ধনিকদিগকে কারখানা খুলিবার সুবিধা দেওয়া হইল। স্বাধীনভাবে দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় চালাইবার পথে বাধাও উঠাইয়া দেওয়া হয়।

ধনিকদিগের প্রতিপত্তি এইরূপে রাশিয়াতে কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিলেও রাষ্ট্রের মুষ্টি একেবারে শিথিল হইয়া যায় নাই। প্রধান ব্যবসায়গুলি এখনও রাষ্ট্রের হাতে রহিল। অন্য অনেক ব্যবসায়ে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃত্ব কমিয়া গেলেও স্বাধীন মালিকদিগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। ভেসেন্‌হার প্রভাবও পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া গেল। সমবায়-পদ্ধতির দ্রুত উন্নতির বিবিধ প্রচেষ্টা দ্বিগুণ বেগে চলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক হইতে সতর্কতার জাল বেষ্টিত ধনিকের বিদ্যমানতা সাম্যবাদীদিগের নিকট নিতান্ত মারাত্মক বলিয়া বোধ হয় নাই।

৫

যুদ্ধজয়ের ফলে দেশে শান্তিস্থাপনের পর যখন নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কৃষক ও শ্রমিকদিগের মধ্যে সদ্ভাব ফিরাইয়া আনিতেছিল

তখন বিদেশী রাজ্যগুলির সহিত রাশিয়ার সম্বন্ধও পুনর্গঠিত হইতে লাগিল।

বিপ্লবের পর রাশিয়ার সঙ্গে অন্যদেশের সম্পর্ক ছিন্ন হইবার অনেক কারণ ঘটে। বিদেশী ধনিকদিগের বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ-হিসাবে তাহাদিগকে কিছু অর্থ দেওয়া বল্‌শেভিকেরা প্রয়োজন বোধ করে নাই। সম্রাট্‌দিগের সময়ে রাশিয়া বিদেশ হইতে যে-ঋণ গ্রহণ করে তাহাও শোধ করিতে তাহারা অসম্মত হয়। বল্‌শেভিক্‌-বাদ সর্ব্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে, সেইজন্যও সোভিয়েট্ রাশিয়াকে সভ্যসমাজের বাহিরে রাখিবার চেষ্টা চলে। নূতন তন্ত্র স্বল্পায়ু হইবে এই আশাতে মিত্রশক্তিগণ অন্তর্যুদ্ধে শ্বেত-সেনাদলের সাহায্য পর্য্যন্ত করিয়াছিল।

১৯২১-এর পরে ধীরে ধীরে অবস্থা ফিরিল। সোভিয়েটের উচ্ছেদের আশা বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে পড়িল যে রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যে লাভ বই লোকসান নাই। সামরিক উত্তেজনার পরিবর্তে উদারতর মনোভাবের উদয়ের ফলে, রাশিয়া-সম্বন্ধে যত মিথ্যা কথা প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে লোকের সন্দেহ-উদ্রেক হইতে লাগিল। বহির্জগতের অনেকে নেপ্-পদ্ধতিকেও বল্‌শেভিক্‌দের অনুতাপের চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইল।

অন্যদিকে বল্‌শেভিকেরাও পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবের আশু সম্ভাবনা-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া রাশিয়ার স্বার্থের প্রতি অধিক দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিল। রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিতে এই দুই আদর্শের সঙ্ঘাত বারম্বার দেখা যায়। সোভিয়েট্ নেতারা এই সময় বিদেশের সহিত বাণিজ্য ও বিদেশী মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন।

এসিয়ার রাজ্যসমূহের সহিত প্রথম হইতেই রাশিয়ার সদ্ভাব হইয়াছিল। তুরস্ক ও চীন সোভিয়েট্-শক্তির নিকট বিশেষভাবে ঋণী। নূতন বাল্টিক্ রাজ্যগুলির সহিত সহজেই বন্ধুভাব আসিয়া গেল কিন্তু পশ্চিম সীমান্তে পোল্যাণ্ড্ ও রুমেনিয়ার সহিত সীমানা লইয়া রাশিয়ার গোলযোগ এখনও মিটে নাই। ১৯২১ সালে ব্রিটেন্, ইটালি ও জার্ম্মানীর সঙ্গে বাণিজ্যের বন্দোবস্ত হইল। পর বৎসর জেনোয়া ও হেগ্ নগরীর বৈঠকে রাশিয়ার বিদেশী ঋণ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করিবার ব্যর্থ চেষ্টা হয়। কিন্তু সেই সময়েই রাপালোর সন্ধির ফলে জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে দৃঢ় বন্ধুত্বের ভিত্তি স্থাপন হইল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্ম্মানী ও সভ্যসমাজে স্থানহীন রাশিয়ার মৈত্রী যেমন স্বাভাবিক তেমনই অন্যদিগের ভয়ের কারণ। ১৯২৪ সালে ব্রিটেন, ইটালি, ও ফ্রান্সের সহিত সোভিয়েট্ রাশিয়ার

পূর্ণ রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পর বৎসর জাপান ইহাদের পদানুসরণ করে। ইংল্যাণ্ডের সহিত ১৯২৭-এ সম্পর্ক একবার ছিন্ন হইলেও তিন বৎসর পরে লেবার দল আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনে। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এখন পর্য্যন্ত বল্‌শেভিক্‌দিগকে রাশিয়ার শাসকরূপে স্বীকার করে নাই। জেনেভার জাতিসঙ্ঘকে ধনিকদিগের প্রতিষ্ঠান জ্ঞানে সোভিয়েট্ রাশিয়া সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু ব্যবধান ক্রমশঃ ভাঙ্গিবার পথে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের অধীন কয়েকটি সভার কার্য্যে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ রাশিয়া প্রত্যাখ্যান করে নাই। ১৯২৮ সালে জেনেভার বৈঠকে সোভিয়েট্ প্রতিনিধি লিট্‌ভিনভ্ সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব আনিয়া সকল দেশকে চমকিত করিয়াছিলেন।

শ্রীসুশোভন সরকার

ভারতের ভাস্কর্য্য

ভারতের কলা-শিল্পের বিচিত্র পুঁথির সকলের চেয়ে বেশী দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য অধ্যায় হ'ল—ভারতের ভাস্কর্য্য বা প্রতিমা-শিল্প। এদেশের পশু, মানব ও দেবতার রূপের অদ্ভুত কল্পনা, আর কোনও দেশের রূপ-কল্পনার সঙ্গে ঠিক মেলে না। ভারতের প্রাচীন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় নেই, যাঁরা ভারতের পৌরাণিক কল্পনাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন না, তাঁদের পক্ষে, ভারতের প্রাচীন প্রতিমা-শিল্পের রূপ ও রসের মূল্য বিচার করা বড় কঠিন। এই জন্য পশ্চিমদেশের কলাকুশলীর চক্ষে, ভারতের শিল্প অনেকদিন 'জাতিচ্যুত' হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে তাঁরা সভ্য-মানুষের শিল্প বলে অনেকদিন স্বীকার করতে চাননি। গ্রীক শিল্পের উচ্চ প্রাচীরের আড়ালে, 'অ্যাপোলো' আর 'ভিনাসের' ধ্যানেই পশ্চিমের কলাসাধকেরা বহুকাল নিমগ্ন ছিলেন। অন্যদেশের রূপ-শিল্পকে তাঁরা বড় আমলেই আনতেন না। বিধাতার বরে, তাঁদের এখন তৃতীয় চক্ষু খুলেছে, গ্রীক শিল্পের ক্ষুদ্র পরিধি অতিক্রম করে, তাঁদের অতি-বিস্তৃত দৃষ্টি শিল্পজগতের নানা নূতন রাজ্যের, বিভিন্ন রীতির, বিভিন্ন কল্পনার রূপ-শিল্পের অনুসন্ধান করছে। ক্রমশঃ একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ছে যে, বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশের শিল্পের বিচার একই মাপ-কাটীতে করলে, অবিচার হবে। মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি যত বিচিত্র, তার বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন রীতির আত্মপ্রকাশ ও রূপ-কল্পনাও তত বিচিত্র। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক দেশের, রূপ-শিল্পের রহস্য ও সার্থকতা তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। তার মনের চাবিটী খুঁজে না পেলে এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের রত্ন-মন্দিরের দ্বার চিরকালই রুদ্ধ থাকবে। সুতরাং গ্রীক শিল্পের রূপ ও আদর্শের সঙ্গে মেলে না বলে, কোনও নূতন-রীতির শিল্পকল্পনাকে আর অগ্রাহ্য করা চলে না। গ্রীক শিল্পের বেড়াই যখন ভাঙল, তখন বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের গ্রীস-বিরোধী, অথচ নূতন পর্য্যায়ের নানা শিল্পরীতির দাবী, পশ্চিমের কলা-কুশলীরা আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। একজন প্রসিদ্ধ কলাবিৎ ইংরাজ পণ্ডিত স্পষ্টই স্বীকার করে ফেলেন "এলগিন্ মারবেল্‌স্-এর আড়ালে লুকিয়ে, পূর্ব্বদেশের শিল্পের দাবী আর আমরা অস্বীকার করতে পারি না।" পশ্চিমের আদর্শ প্রত্যাখ্যান করে, পূর্ব্বদেশের আদর্শের মাপকাঠীতেই বিচার সুরু হ'ল, পূর্ব্বদেশের শিল্পের রস-বস্তুটী কি, তার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির গুণপনা কোথায়? বিচারের ফলে, ভারতের পৌরাণিক যুগের, নানা 'গজানন', 'ষড়ানন', 'অষ্টাভুজা', 'দশভুজা',

'চতুর্ভুজ' প্রভৃতি 'উদ্ভট' ও 'অদ্ভুত' মূর্ত্তি-কল্পনার মধ্যে রূপ-শিল্পের নূতন সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ, পশ্চিমের কলা-রসিকরা এখন পেয়েছেন। তাঁরা এখন স্বীকার করছেন, ভারতের এই সব অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত কল্পনার মধ্যে, রূপশিল্পের 'নব্যন্যায়ের' একটা নূতন সঙ্গতি, একটা নূতন রূপতত্ত্বের নূতন সামঞ্জস্য, রূপ-সৃষ্টির একটা নূতন কৌশল, একটা নূতন শক্তি আছে। এই নূতন ধারার রূপ-সৃষ্টি, ভারতীয় দৃষ্টি ও আদর্শ দিয়েই বিচার করতে হবে। বিচারে দেখা যায়, ভারত-শিল্পের ভাষার ব্যাকরণ, শব্দরূপ, ধাতুরূপ ও অলঙ্কারশাস্ত্র, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অন্যদেশের ভাষা ও ধারার সঙ্গে বড় মেলে না। ভারতের মূর্ত্তি-শিল্পের ভাষা, তার উদ্ভব, অভিব্যক্তি ও পরিণতির ধারা বড় বিচিত্র। যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে অনুসন্ধান না করলে, হঠাৎ এই বিশিষ্ট ধারা আমাদের নজরে পড়ে না। মূর্ত্তি-শিল্পে ভারতের বিশিষ্ট ধারাটী কি তা প্রাচীন ভারতের পশু-চিত্রে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। এই ধারা, এই বৈশিষ্ট্য অন্য দেশের পশুচিত্রের সহিত তুলনা করলে, সহজেই চোখে পড়ে।

প্রথমে, আমরা আলোচনা করব,—গ্রীস দেশের একটী সিংহ চিত্র (১)। সাদা পাথরের পরিপাটী প্রতিমূর্ত্তি। আমাদের চোখে-দেখা পরিচিত সিংহ-মূর্ত্তির সঙ্গে বেশ মিলে যাচ্ছে। বেশ বলিষ্ঠ, নাতি-কৃশ, নাতি-স্থূল, শক্তিশালী মূর্ত্তি;—মাংসপেশীর কোথাও বাহুল্য নাই,—বেশ ঠাস বুনান, কোথাও চোখে লাগে না। পেটের কাছে,—একটী শিরার সূক্ষ্ম-রেখা, নজরেই পড়ে না। এই মূর্ত্তি-কল্পনায়,—সিংহ-চিত্রের আসল model হুবহু নকল করা হয়েছে, কোথাও একটু অত্যুক্তি নেই, স্বাভাবিক আদর্শের রূপ হতে একচুল তফাৎ নেই। এক কথায়, কোথাও কল্পনার কোনও অবসর নেই,—মানুষের চোখ যা দেখেছে তাই লিখেছে। এই চিত্রে, কল্পনা যদি কোথাও সুযোগ পেয়ে থাকে ত ঐ মাথার ও কাঁধের উপর কেশের সমাবেশে। শিল্পী সিংহের কেশ-গুচ্ছ,—যেন একটু মন-গড়া রীতিতে, মনের মতন করে সাজিয়ে নিয়েছেন,—মুখের চারপাশে, ও দাড়ীর নীচে পর্য্যন্ত,—কেশরগুলি,—একই রকমের তিনটী জোড়া জোড়া বাঁকা রেখার থাকে-থাকে সাজান,—গুচ্ছের কল্পনা করে, শিল্পী যেন একটু অলঙ্কার দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অলঙ্কার-রীতি বেশী ফুটতে পায়নি,—সিংহের আসল প্রাকৃত রূপটী, বড় হয়েই প্রকাশ পেয়েছে—এবং এই বাহ্য রূপ-চিত্রের অতি-প্রকাশে,—সিংহের পশু-প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি ও তেজের প্রখরতা কতকটা যেন খর্ব্ব হয়ে রয়েছে। বাহিরের রূপটী যেন ভিতরকার রূপটীকে বেশী ফুটতে দেয়নি।

ভারত-শিল্পীর পশু-কল্পনা, ইউরোপের রীতি হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারতের বিচিত্র "পশু-শালার" নানা উদাহরণ প্রাচীন ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পে বিত্তমান আছে, যথা :—সিংহ, নরসিংহ, গরুড়, কিন্নর, যক্ষ ইত্যাদি। এই সব পশু-মূর্ত্তির নূতন রূপ-কল্পনা পৌরাণিক জগৎ ও ভাবধারার অপূর্ব্ব রূপ-সমুদ্র থেকে রস ও উপাদান সংগ্রহ করেছে। ভারতের শিল্প-অভিধানের 'সিংহ', 'শার্দ্দূল', 'কেশরী' আমাদের পশু-শালার চোখে-দেখা প্রকৃত সিংহ নয় ;—সিংহের রূপের অন্তর্নিহিত fundamental, elemental গড়নটী এমন একটী নূতন রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যেটী আমাদের চোখে-দেখা বাস্তবিক সিংহের সঠিক প্রতিচ্ছবি নয়, কোনও ব্যক্তিগত, জাতিগত সিংহ-বিশেষের প্রতিকৃতিও নয় ;—সিংহের অবয়বের মূলগত, প্রকৃতিগত, একটী সাধারণ generalised form,—সিংহত্বের মূলরস ও তত্ত্বের অপরূপ কল্পনা। এ যেন আমাদের অরণ্যের পশুরাজ নয়, এ আমাদের হিতোপদেশের ভাবুক, চৈতন্যময়, নীতি-বিশারদ moral philosopher। বনের পশুকে আমরা হারিয়েছি, তার জায়গায় পেয়েছি শিল্পীর কল্পনার "নর-সিংহ"। ভারত-শিল্পের পশু-শালায় বেশীর ভাগ সিংহের যে রূপটী বিরাজ করে, সেটী এই নর-সিংহের কল্পনার প্রতিচ্ছবি। এই 'নর-সিংহ' বিষ্ণুর অবতার নয়, সিংহের নর-রূপী কল্পনা। আমাদের প্রাচীন মন্দিরের দুপাশে শিল্পীরা যে দুটী সিংহ বসিয়ে দেন, সেগুলি ভারত-শিল্পের Heraldic device, অর্থাৎ রাজশক্তির আলঙ্কারিক সঙ্কেত ও প্রতীক। তাৎপর্য্য এই যে, দেশের রাজশক্তি, দেশের ধর্ম্মশক্তির সেবায় নিযুক্ত ; মন্দিরের পূজা-পদ্ধতি, ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্যাদি রাজা মন্দিরের দ্বারদেশে বসে সমস্ত শক্তি দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে রক্ষা করছেন।

সুতরাং ভারত-শিল্পীর কল্পিত সিংহচিত্রের (২) শক্তিরূপী সেবকরূপী সিংহের মুখে, চোখে, নাকে, মানুষের ভাব ও ছায়ার পরিকল্পনা সঙ্গত। সিংহের বক্ষে কুণ্ডলী পাকানো কেশরের কল্পনা, রাজার প্রশস্ত বক্ষে মণি-মাণিক্য ও মুক্তা-হারের ঐশ্বর্য্যের ভাবটী যেন সূচনা করে। মানুষের রূপের ছায়া নিয়ে কল্পিত হলেও, সিংহের বিক্রম ও পশুশক্তির ভাবটী একেবারে বর্জ্জন করা হয়নি। ভারত-শিল্পীর এই কল্পনা-সৃষ্টি বাস্তবিক পশুশালার আসল সিংহ থেকে অনেক দূরে, অথচ প্রকৃতিবাদী সিংহচিত্রের অনেক উপরে প্রতিষ্ঠিত, কোনারকের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে উদ্ধৃত সিংহ-যুগলের চিত্রে, পশুরাজের শৌর্য্য, বিক্রম ও শক্তির যে পরিচয় আমরা পাই—ইউরোপের প্রকৃতিবাদী পশু-শিল্পীর চিত্রে, তা খুঁজে পাওয়া শক্ত। ভারতের সিংহ-চিত্রের রসটী কেবল যে অতিকায় মূর্ত্তির কল্পনা বলে ফুটে



১। সিংহ, গ্রীস।



২। সিংহ, যব-দ্বীপ।



৩। গজ-সিংহ, ("যালী"), মাদুরা।



৪। সিংহ-মিথুন, কোণারক।

উঠেছে তা নয়,—সমস্ত সিংহজাতির পুঞ্জীভূত শক্তি একত্র করে এই বিরাট সিংহমূর্ত্তী কল্পনা করা হয়েছে, যার তুলনায় আমাদের পশুশালার শ্রেষ্ঠ সিংহও সিংহত্বের হীন ও নিকৃষ্ট নমুনা। প্রকৃতির আদর্শ ও সৃষ্টি অতিক্রম করে নূতন কল্পনার রূপ সৃষ্টি করিবার অধিকার যে শিল্পীর আছে, ভারতের ভাস্কর্য্যের পশু-চিত্রে তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা পাই।

দ্রাবিড় দেশে দক্ষিণী শিল্পী, কল্পনার বলে, দুটি বিভিন্ন জাতীয় পশুর আকার জুড়ে নিয়ে, একত্র করে, এক অপরূপ "যালী" বা 'গজ-সিংহ' (৩) গড়ে তুলেছেন। আকৃতিটী মোটামুটী সিংহের মতন, বেশীর মধ্যে হাতীর লম্বা শুঁড় ও প্রকাণ্ড কান। এই বিস্তৃত কান লতাপাতার অলঙ্কার নিয়ে, কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে। আর সিংহের মূর্ত্তিকে অপরূপ ঐশ্বর্য্য দিয়ে উজ্জল করে তুলেছে। একই অলঙ্কারের ভাষায়, লাঙ্গুলের ভূষণ-স্বরূপ কেশগুচ্ছটি একই তালে, একই ছন্দে, সিংহের গায়ে বিচিত্র লহর তুলে ফুটে উঠেছে। "যালী" ও সিংহের রূপ, ভারত-শিল্পীর কল্পনায় প্রাকৃত রূপের অনেকটা বিপরীত,—তথাপি এই অপরূপ, অপ্রাকৃত রূপ দুটীকে হাস্যাস্পদ কিম্বা অসঙ্গত বলে মনে হয় না। শিল্পীর সৃষ্টির কৌশলে, বেশ একটা সম্ভাব্যতার ছাপ এই পশু কল্পনায় আছে। মনে হয় যেন, "যালীর" মতো কোনও পশু ভারতবর্ষে কোন অতিপ্রাচীন যুগে ছিল,—এখন তার বংশ লোপ পেয়েছে। এখন বিচারের বিষয় হচ্ছে—বড় শিল্পী কারা, পশু-রূপের প্রাকৃত নমুনায় যাঁদের দৃষ্টি চিরকাল সীমাবদ্ধ তাঁরা, না যাঁরা পশুরূপের আভ্যন্তরীণ রূপটী আত্মসাৎ করে, পশু-সৃষ্টির নূতন ভাষা রচনা করেছেন তাঁরা ?

স্থানে স্থানে ভারতের শিল্পী, পশুর দেহের প্রাকৃত রূপটী অতিক্রম না করেও মানুষের ভাব ও ভাবনা আরোপ করে যে-এক নূতন রসের সৃষ্টি করেছেন, তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কোনারকের মন্দিরের গায়ে "কেশরী-মিথুন"—সিংহ ও সিংহিনীর আলিঙ্গন ও প্রেম-সম্ভাষণের চিত্র (৪)। পশু-জীবনে যৌন বা মৈথুন-কামনা সাধারণ প্রকৃতি-গত ভাব, সুতরাং সে চিত্রে শিল্পীর কৌশল ও কল্পনার অবসর নেই। পশুর পশুত্ব অতিক্রম করে, শিল্পী প্রীতির প্রেরণা দিয়ে, সাত্বিক প্রেম-রসের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই পবিত্র প্রীতির পূত স্পর্শ দিয়ে, পশুকে মানুষের উচ্চ আসনে টেনে তুলেছেন কোনারকের অমর শিল্পী। সাবলীল গ্রীবাভঙ্গে, নয়নের অভিষিক্ত ভাবে, হস্ত-পদের স্নিগ্ধ ভঙ্গীতে এই সিংহ-মিথুন পশুভাব ভুলে গিয়ে,—নিবিড় প্রেমের আনন্দে এক হয়ে, নূতন রসে মত্ত হয়ে উঠেছে।

এই শ্রেণীর পশু-কল্পনার নানা বিচিত্র সৃষ্টিতে ভারতের শিল্পীরা কি অফুরন্ত অলঙ্কারের ভাষা গড়ে তুলেছেন,—তার অনেক পরিচয় তাঁদের

শিল্প-শাস্ত্রের বিরাট অভিধানে, ও প্রাচীন শিলাচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্নর ও গন্ধর্ব্বের রূপ-কল্পনা ঠিক পশু জগতের কি দেবলোকের কোঠায় পড়ে না। কিন্তু এই শ্রেণীর কাল্পনিক রূপ-সৃষ্টিতে ভারতের প্রাচীন শিলা-শিল্পীরা কি অদ্ভুত কৌশল ও মৌলিক রচনা-রীতির পরিচয় রেখে গেছেন! গন্ধর্ব্ব-মিথুনের অপরূপ চিত্রমালা জৈন মন্দিরের ছাদের স্বর্গ অন্ধকার কোণে কোণে কি উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বেলে দিয়েছে,—অর্ব্বুদ-গিরির মর্ম্মর-মন্দিরের অনাবিল ঐশ্বর্য্য যাঁরা স্বচক্ষে না দেখেছেন, তাঁদের কাছে বুঝিয়ে বলা বড় কঠিন। এখানে উদ্ধৃত চিত্রে (৫) তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। গন্ধর্ব্ব নরনারী একই ভঙ্গীতে হাত তুলে নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়েছে,—প্রত্যেক অবয়বের ভঙ্গীটী পরস্পরের প্রতিধ্বনি তুলেছে,—আর দুটী মূর্ত্তির নাভী-মূল থেকে প্রসারিত হয়েছে দুটী অপূর্ব্ব অলঙ্কারের লতা-পল্লব,—তারই বেষ্টনীর ছটার মধ্যে আনন্দে নাচ্‌ছে এই গন্ধর্ব্ব-মিথুন। এ দুটী প্রাণী যে-কল্পনার অপ্রাকৃত জগতের জীব, এই লতা-পল্লবের সম্ভারও সেই একই জগৎ থেকে এসেছে,—এদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, কোনও অসঙ্গতি নেই। এ লতাও কখনও আমরা চক্ষে দেখিনি, এই নরাকৃতি পক্ষী-মিথুনও কখনও আমাদের নজরে পড়ে নি। শিল্পীর কৌশলে, অসম্ভব-সম্ভাবনার মধুর মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে এই কল্পনার অপরূপ সৃষ্টি। কিন্তু এই মানুষ ও পশু-রূপের যুগ্ম-কল্পনা (composite-figure) কেবল ভারতের শিল্পীর বিশেষত্ব নয়। ঈজিপ্ট ও আসীরিয়াতে বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এর সূচনা হয়েছে। খৃঃ পূঃ সাত শতকে রচিত, আসীরিয়ার প্রাচীন প্রাসাদে, নরমুণ্ড ও পক্ষ-যুক্ত একাধিক অতিকায় বৃষের শিলা-মূর্ত্তি (৬) পাওয়া গিয়েছে। লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশালায় তার নিদর্শন আছে। কিন্তু আসীরিয়ার এই যুগ্ম-মূর্ত্তির কল্পনায় পশু ও মনুষ্য-প্রকৃতির কোনও সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টা নেই,—বৃষের স্কন্ধে মানুষের মুখ যেন যান্ত্রিক ভাবেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঝাঁকড়া, কোঁকড়ান চুল ও দাড়ীর জের টেনে, অসঙ্গত ভাবটা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু চেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি,—মানুষের স্কন্ধে মানুষের মুণ্ড—মন্দিরের চূড়ার মত—যেমন স্বাভাবিক ভাবে জেগে উঠা উচিত, এক্ষেত্রে বৃষের অবয়বের নানা রেখাবলী মানুষের মুণ্ডে তেমন স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারে নি। শিল্পী নানা কৌশলে,—পিঠের উপর প্রকাণ্ড পাখার চাদর উড়িয়ে দিয়ে,—বৃষের দেহটা ভুলিয়ে দিয়ে—কোনও রকমে অসঙ্গতি ও হাস্য-রসের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এরই অনুরূপ কল্পনায়, ভারতের শিল্পী "কামধেনুর" (৭) স্কন্ধে কি অদ্ভুত কৌশলে নারী-মুখের সমাবেশ করেছেন,



৫। গন্ধর্ব্ব-মিথুন, তেজপাল মন্দির, অর্ব্বুদগিরি।



৬। পক্ষ-যুক্ত বৃষ, আসীরিয়া, (বৃটিশ মিউজিয়ম্)।







৮। অস্থুর নসীর-পাল, আসীরিয়া। ১০। শিশু-নাগ (?), মথুরা।



৯। অন্ধ্-রাজা ও রাণী, কার্লীগুহা।

মাদুরা মন্দিরের ধাতু-নির্ম্মিত দেবতার বাহনে তার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই। মুখটী স্কন্ধদেশ থেকে যেন আপনা-আপনি সহজ-প্রকৃতি-গত ভঙ্গীতে জেগে রয়েছে—কোথাও অসঙ্গতি নেই—অসামঞ্জস্য নেই। শৃঙ্গ দুটী খর্ব্ব করে—মাঝে একটী পদ্ম জুড়ে দিয়ে—বেশ একটী সুন্দর মুকুট রচনা করে দিয়েছেন, জীবটী যে শৃঙ্গযুক্ত তা আমাদের মনেই হয় না। দুই কানে জুড়ে দিয়েছেন দুটী প্রকাণ্ড কুণ্ডল ও ঝুমকো ফুল। তারই পাশ দিয়ে অনায়াসে সহজ ভঙ্গীতে নেমে এসেছে সুদীর্ঘ বেণীর লীলায়িত রেখা। পিছনের পুচ্ছটি যেন পুচ্ছই নয়,—সামনের বেণীর সঙ্গে তাল রাখবার জন্য আর একটী অলঙ্কার মাত্র। গাভীর কণ্ঠের নীচে দোলায়মান মাংস-পেশীর রেখা আচ্ছন্ন করে, ঝুলছে থাকে-থাকে হারের বিচিত্র লহর। পশুর অবয়বের প্রত্যেক বিশিষ্ট অঙ্গটী প্রসাধনের প্রাচুর্য্যে ডুবিয়ে দিয়ে, নারী-মূর্ত্তির অলঙ্কৃত মহিমাকে উজ্জ্বল করে চখের সামনে ধরা হয়েছে। এদিকে পেছনের পুচ্ছটী অতিক্রম করে পিঠের ঠিক নীচেই জেগে উঠেছে ময়ূরের পাখা। সমস্ত চিত্রে বেশ একটু নারী-সুলভ কমনীয়তা ও কোমলতার ছায়া কল্পনাটীকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পশু-রূপের নূতন সৃষ্টির কৌশলে, ভারতের ভাস্কর অদ্বিতীয়, একথা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়।

এই ত গেল পশু-সৃষ্টির পালা,—তার পর, মানুষ ও দেব-দেবীর রূপ-সৃষ্টি। ভারতের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে নর-নারীর রূপ-কল্পনা কিছু বিচিত্র। অতি প্রাচীন যুগে, মানুষের মূর্ত্তি-কল্পনায় আসীরিয়ার ভাস্কর্য্যের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। ভারতের অতি প্রাচীন মাটির মূর্ত্তি ও পুত্তলিকার রূপ ও ধারা কিছু স্বতন্ত্র। কিন্তু আদি-যুগের প্রস্তর-মূর্ত্তির সহিত, আসীরিয়ার রাজার প্রতিমূর্ত্তি ও আদর্শ-মূর্ত্তির সহিত ভারতের ভাস্কর্য্যের কিছু তুলনা করা যেতে পারে।

খৃঃ পূঃ ৮৮৩-৮৫৯ যুগের জগৎ-বিখ্যাত সম্রাট্ দ্বিতীয় অসুর-নসীর-পালের প্রতিমূর্ত্তি (৮) আসীরিয়ার এই শ্রেণীর রূপ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লম্বা কেশ ও শ্মশ্রুময় মুখ, অনাবৃত মস্তক, দীর্ঘ দেহ,—এক হাতে একখানি লম্বা ছুরি, আর এক হাতে রাজ-দণ্ড। হাতের ভাঁজ করা কনুইটী বাদ দিলে, সমগ্র মূর্ত্তিটি যেন দুটী সরল রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ —একটী স্তম্ভের প্রতিকৃতি বলে বোধ হয়। এই ঋজু-রেখা অবলম্বন করে, শিল্পী শক্তিশালী অথচ স্থির ও গম্ভীর রাজ-শক্তির কল্পনা করেছেন। নীচে, ছিলেকাটা কাপড়ের আবরণের তলায় পা দুটী যেন দেখাই যাচ্ছে না—এই গতিহীনতার ভাবে, চাঞ্চল্যহীন, পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যের মূর্ত্তিটী বেশ ফুটে উঠেছে। আসীরিয়ার মূর্ত্তিটীর সহিত ভারতের এক যক্ষ-

মূর্ত্তির, আকারগত না হোক,—একটা ভাব ও রস-গত সাদৃশ্য আছে। সম-পাদে বিভক্ত, ঋজু রেখায় কল্পিত, স্থির, শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি। "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধঃ",—বিশাল শক্তির অবতার। কোনও চাঞ্চল্য নেই, কোনও গতির চেষ্টা নেই,—আপনার শক্তিতে যেন আপনি স্থির। পরণে ধুতী, কোমরের কাছে কোমর-বন্ধ প্রকাণ্ড ফাঁস দিয়ে বাঁধা। বিশাল বক্ষের উপর হার, তার উপর উপবীতের মত আস্তরণ; উপর হাতে বাজু-বন্ধ। কেউ কেউ বলেন ইনি নন্দ-বংশের রাজা "বর্ত্তনন্দী," কেউ কেউ বলেন এটী যক্ষমূর্ত্তি। রাজাই হোক, আর যক্ষই হোক, মূর্ত্তিটী পার্থিব শক্তি-সামর্থ্যের কল্পনা, দৈবশক্তির মূর্ত্তি নয়। বিশেষ কোনও উচ্চ-ভাব, কি সুকুমার কল্পনার অবকাশ এই শ্রেণীর মূর্ত্তিতে পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি,—মথুরার আর একটা যক্ষ-মূর্ত্তি (১০)। কেউ কেউ বলেন এটি শিশুনাগবংশের রাজা কুণিক অজাতশত্রু। বেশ শক্তিশালী অতিকায় প্রতিমূর্ত্তি। একটা বিরাট massiveness ও অতি-মানবের ভাব মূর্ত্তিটাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মাধুর্য্য কি কমনীয়তা একবারেই নেই, কিন্তু খুব majesty, শক্তির ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। একটা পুঞ্জীভূত শক্তির আধার, শিল্পী যেন কল্পনা করেছেন এই অতি-বিশাল যক্ষের বিপুল অবয়বে। অনেক পরিশ্রম করতে পারেন, অনেক গুরুভার বহন করতে পারেন, মূর্ত্তিটাতে এইটেই যেন বেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কাপড় পরবার ভঙ্গী ও রীতিতে এবং অলঙ্কারের ভঙ্গীতে পূর্ব্বের উল্লিখিত মূর্ত্তিটীর সঙ্গে বেশ মিল আছে। মোটের উপর একটা অতি-প্রাচীনতার ভাব মূর্ত্তিটাতে আছে। সেইজন্য কেউ কেউ মূর্ত্তিটা খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬০০ বৎসরের, এইরূপ অনুমান করেন।

এগারো নম্বরের চিত্রটী আসীরিয়ার "ভীমের" মূর্ত্তি,—দৈহিক শক্তি-সামর্থ্যের দেবতা। সিংহকে, যেন এক ছোট বিড়ালের মত, এক হাতে চেপে ধরে রেখেছেন। এখানে শিল্পী শক্তির আভাস দিয়েছেন,—হাতের ও পায়ের মাংস-পেশীর রেখার উপর খুব জোর দিয়ে, emphasis দিয়ে ফুটিয়ে তুলে। এই মাংশ-পেশীর বাহুল্য, exaggeration, প্রায় এই যুগের আসীরিয়ার সমস্ত প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভীমের অতিমানুষিক শক্তির পরিচয় দিতে হ'ল, মূর্ত্তিটাকে আকারে বড় করে, আর সিংহটাকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে চিত্রিত করে। এই রীতি, এই কৌশল, কতকটা স্থূল-রীতির objective method। ভারতের শিল্পীর অনুসৃত পন্থা কিছু স্বতন্ত্র, তাঁদের রীতি হ'ল, subjective, কল্পনাবাদী পন্থা। যবদ্বীপের সিঙ্গাসারীর শৈব-মন্দিরের দ্বারে (১২) দুটী দ্বারপালের মূর্ত্তি



১১। "ভীম", আসীরিয়া।



১২। দ্বার-পালক, যবদ্বীপ।



১৩। আপোলো বেলভেদীয়র, ভাটিকান, রোম।



১৪। চন্দ্র-শেখর শিব, চোল-যুগ, দাক্ষিণাত্য।

থাকে, আসীরিয়ার "ভীমের" তুলনায়, আকারে অনেক ছোট,—কিন্তু এই দ্বারপালের মূর্ত্তির অন্তর্নিহিত শক্তি, ঐ আসীরিয়ার "ভীমের" মূর্ত্তিকে অনায়াসে পরাস্ত করেছে। অধিকন্তু, এই দ্বারপালের মূর্ত্তিতে আর একটু নূতন রস ফুটে উঠেছে। আসীরিয়ার মূর্ত্তিটা কতকটা আপনার শক্তি নিয়ে সচেতন ও জাগ্রত, কেমন একটা conscious, গায়ে-পড়া aggressive ভাব; কিন্তু এই ভারতীয় দ্বারপালের মূর্ত্তি একবারেই unconscious—নিজের তেজ ও শক্তি সম্বন্ধে নিজের কোনও চেতনা ও বোধ যেন নেই। আপনার মনে, বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হয়ে, যে মন্দিরের দ্বার রক্ষা করছে, সেই দেবতার ধ্যানেই যেন আত্ম-বিস্মৃত। অথচ গদা ও তরবারী মুঠোর মধ্যে ধরেই সজাগ ও প্রস্তুত হয়ে রয়েছে—আবশ্যক হলেই, অস্ত্র-ব্যবহারে কোনও বিলম্ব হবে না। এই যে কর্ম্মে নিযুক্ত থেকেও কর্ম্মহীনতার ভাব,—এই detachment, এটা হ'ল ভারতের ভাস্কর্য্য-কল্পনার একটা প্রধান বিশেষত্ব। গীতার সেই আসক্তিহীন কর্ম্মবাদই যেন অনুসরণ করছে।

অনেকে বলেন, ভারতের শিল্পী, ঐ শক্তি-সামর্থ্যের মূর্ত্তি—ঐ যক্ষ, জরাসন্ধ, ধৃতরাষ্ট্র, অজাতশত্রুর প্রতিকৃতি—অনায়াসে ফুটিয়ে তুলতে পারেন; কিন্তু বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সুন্দর মানব-দেহের মধুর রসটী তা'র চখে পড়েনি। মানুষের দেহের সেই অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকটা, কেবল গ্রীক শিল্পীর দিব্যদৃষ্টিতেই ধরা দিয়েছিল। গ্রীক-সাধনার আগে, কিম্বা পরে, কোনও দেশের শিল্পীই, মানব-দেহের দিব্যশ্রী, সুষমা ও লালিত্যটুকু, এমন সুন্দর করে, এমন মনোহারী করে, পটে কি শিলায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। কথাটা একদিক দিয়ে খুব সত্য। গ্রীক-শিল্পী মানবদেহের যে বহির্মুখী বাহ্য সৌন্দর্য্যের দীপ্তিটা নত-শিরে পূজা করেছেন, সেই বাহ্য, কমনীয়, আপাত-রমণীয় সৌন্দর্য্য, ভারতবর্ষের বিশ্বকর্ম্মারা অতি সাবধানে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির আদর্শ ছিল ভিন্ন।

গ্রীসে দেবতার আদর্শ সুগঠিত, সুললিত মনুষ্য-দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রোমের ভাটিকান চিত্রশালার Apollo Belvedere-এর মূর্ত্তি (১৩)। বেশ সুন্দর পরিপাটী বলিষ্ঠ দেহ-কান্তি;—ব্যায়াম-কৃশ সুললিত সুঠাম দেহ-যষ্টি,—বেশ একটু শান্ত অথচ মধুর ভাব, এবং বেশ একটু আকর্ষণী-শক্তি আছে। এ আদর্শ কিন্তু দেবতার কিম্বা অতিমানবের কল্পনা নয়। গ্রীসের দেবতা একটা সুন্দর সুগঠিত-দেহ মানুষ মাত্র। মোস্যিউ গোফিয়োর নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক প্যারী-সহরে একটী Apollo-র মূর্ত্তি এনেছিলেন। বহুকাল ধরে

পুরাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বাদানুবাদ করেছিলেন যে মূর্ত্তিটী দেবতার মূর্ত্তি না কোনও পালওয়ানের প্রতিকৃতি। অলিম্পিয়ার ব্যায়ামক্ষেত্রে যাঁরা বাজী জিৎতেন, তাঁদের অনেকের প্রতিমূর্ত্তি গড়ে রাখা হত। দেবতার মূর্ত্তির সহিত, পাল্‌ওয়ানের মূর্ত্তির যে ভ্রম হত, তার কারণই এই যে সুগঠিত ও বলিষ্ঠ দেহ-যুক্ত পালওয়ানের বাহ্য অবয়ব-সৌন্দর্য্যের আদর্শের উপর ভিত্তি করে, গড়া হত গ্রীসের দেবতার প্রতিমা।

মনুষ্য-দেহ অবলম্বন করে, দেব-প্রতিমা ফুঠিয়ে তোলা যতদূর সম্ভব, তা বোধ হয়, এই "এপোলো বেলভেডীয়রের" মূর্ত্তিতে ফুটেছে। ব্যায়ামশালার পালওয়ান্ বলে ভুল না করলেও ভারতের শিল্পী এঁকে গর্ভগৃহের প্রতিমা বলে বরণ করবেন না। দক্ষিণদেশের সুব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিমা না হলেও, আমাদের একালের বাঙ্গালাদেশের কার্ত্তিকেয়-মূর্ত্তির আদর্শের সহিত ইহার কিছু রস-গত সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিটীর দুটী হাতের সুললিত গতি-ভঙ্গে বেশ একটু চমৎকার balance, ছন্দোবন্ধতা, আর সমস্ত শরীরে একটু সচঞ্চল গতির লীলা, সুষমা ও লালিত্য বড়ই রমণীয়। গ্রীক দেবতা-রূপের এই কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রায় এক শতাব্দী ধরে ইউরোপের সুধী-সমাজকে আচ্ছন্ন ও প্রভাবিত করে রেখেছে। স্থানে স্থানে দু'একজন রূপ-সাধক ব্যতীত, কেহই এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যের মোহপাশ এখনও কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেননি। ভারতের প্রাচীন ভাস্কর্য্যে যদি "এপোলো বেল-ভেডীয়রের" অনুরূপ কিছু খোঁজা যায়, তবে বোধ হয় দেখা যাবে দক্ষিণের "চন্দ্রশেখর" শিবের (চিত্র ১৪) মঙ্গলময় শোভন কল্পনার মধ্যে তার কিছু কিছু আছে। "এপোলো বেলভেডীয়রের" চাঞ্চল্য এই মূর্ত্তিতে একেবারেই নেই। গ্রীক প্রতিমার Repose, ভারতের সাত্ত্বিক শান্তিরস হতে অনেক দূরে। সুপুষ্ট, সুগঠিত, শ্রমশীল দেহে, যে একটী বাহ্যিক স্বাস্থ্যের সুষমা ফুটে উঠে, সেটী হল গ্রীসের রাজসিক শান্তিরস। ভারতের সাত্ত্বিক শান্তিরস, আহার, বিহার ও চিন্তার সংযমে, ইন্দ্রিয়ের আত্যন্তিক নিরোধে ফুটে উঠে। দেবাদিদেব মহাদেবের যোগী-মূর্ত্তি, ভারতের সাত্ত্বিক শান্তিরসের অভিনব অলৌকিক প্রতিমা। পদ্মপীঠের উপর সমপাদ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তিটী চার হাতের আয়ুধ ও বরাভয় মুদ্রার সুকৌশলে সংস্থাপিত লীলাভঙ্গীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ছন্দোবন্ধ গ্রীক দেবতার balance ও ছন্দ-মাধুরীকে বোধ হয় পরাস্ত করেছে।

কেবল বীর-রসের বাহ্য-সৌন্দর্য্যই যদি খুঁজি,—তা হলে প্রাচীন গ্রীক শিল্পী পলিক্লীতসের রচিত "দিয়হুমিনসের" মূর্ত্তি নিন্দনীয় নয়। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি-কল্পনায়, গ্রীক ব্যায়ামী-যুবক দেবতার ছদ্মবেশ নিয়ে আমাদের ছলনা করিতে আসেননি। এই রূপ-কল্পনায়, ইনি সুস্থদেহ



১৫। পহ্লব-বীর, মহামল্লপুরম্।

১৩৯]

বলিষ্ঠ-কান্তি, সুগঠিত দৈহিক সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল পুরুষ-মূর্ত্তি। পরিপূর্ণ যৌবনের দীপ্তি ও স্বাস্থ্যের সুষমা এই মূর্ত্তিতে যথেষ্ট আছে। তথাপি এই মূর্ত্তিকে গ্রীসের অলৌকিক শিল্প-বুদ্ধির অপরূপ দান বলে, আমরা স্বীকার করতে পারি না। কারণ এই বলিষ্ঠ দেহের বাহ্য-সৌন্দর্য্য ভারতের শিল্পীরা প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে দ্বারে ছড়িয়ে গেছেন। কিন্তু দক্ষিণদেশে পহ্লব-রাজাদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ বীর-রসের একটী অলৌকিক মূর্ত্তি (চিত্র ১৫) গ্রীকদেশের ব্যায়াম-কুশলীর সমস্ত সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব পদাঘাতে চূর্ণ করেছে। Grace, Repose, Balance প্রভৃতির যদি কোনও অভিধানিক সার্থকতা থাকে, তাহলে এই শব্দগুলির যথার্থ সংজ্ঞা পহ্লব-মন্দিরের এই ভারতীয় "এপোলো" অনায়াসে আত্মসাৎ করেছে। বহু বৎসর পূর্ব্বে, আশ্বিনের প্রত্যুষে, এই মূর্ত্তিটীর রূপ যখন প্রথম আমার চখের সামনে হঠাৎ ফুটে উঠেছিল,—এরূপ সুললিত স্বপ্ন পাথরের কঠিন অক্ষরে লেখা যায়, তার পূর্ব্বে আমার ধারণায় ছিল না। প্রভাত-সূর্য্যের প্রথম কিরণ যখন আমার সম্মুখে এই মূর্ত্তির দেহ স্পর্শ করলে, তখন আমার যেন মনে হ'ল, এর অবয়বের অপূর্ব্ব সূক্ষ্ম রেখা-সুষমা পাছে ছিন্ন হয়, এই ভয়েই যেন সূর্য্য-দেবতার অরুণ-রশ্মি পহ্লব-বীরের দেহ-যষ্টি অতি সন্তর্পণে চুম্বন করছে।

দেখা যাচ্ছে, গ্রীক ও ভারতের শিল্পের সম্পর্ক, মিলনের সম্পর্ক নয়, বিপরীতের সম্পর্ক। তথাপি, এই মূর্ত্তিতে গ্রীক ও ভারতের শিল্পের একটা বিভিন্ন-স্তরের মিলন-ক্ষেত্র আছে। ভারতের ভাস্কর্য্যের কতকটা সাদৃশ্য বা analogy যদি খুঁজতে হয়, তাহলে যেতে হয় নাইল-নদীর স্বর্ণ-বালু ক্ষেত্রের মন্দিরে ও সমাধি-গুহায়। চার হাজার বৎসরের পূর্ব্বের টলেমী যুগের মিশরদেশের রাজা ও রাণীর একশ্রেণীর আদর্শপ্রবণ যুগল প্রতিমায় (idealised portraits) যে এক অপূর্ব্ব শক্তি, ও বিশালত্বের স্পর্শ আছে তা বাস্তবিকই অভিনব। কালের বুকের উপর যেন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবে,—এই স্পর্দ্ধা ও স্মৃতির কেতন, এই monumental quality কি গ্রীসে, কি ভারতে, সর্ব্বত্রই বিরল। এই শ্রেণীর মূর্ত্তি যুগলের সুঠাম বর্ত্তুল-রেখার সুললিত গতি-লীলার মধুর ঝঙ্কার ও ঐকতানের স্পর্শে একটা মোহিনী-শক্তি আছে। পক্ষান্তরে, রাজা ও রাণীর কঠিন ঋজু ও আড়ষ্ট ভঙ্গীতে, দেবতা-প্রতিমার অনুকারী একটু দূরত্বের ভাব আছে, যার প্রভাব এই শ্রেণীর মিথুন-মূর্ত্তির অতি-সান্নিধ্যের একটা বাধা রচনা করে। এর অনুরূপ remoteness, এই দূরত্বের ভাবটী, ভারতের সব দেব-প্রতিমার প্রধান বিশেষত্ব। মিশরদেশের মূর্ত্তির অনুরূপ রস পুণা-শহরের নিকট কার্লীর মহা চৈত্য-মন্দিরের দ্বারদেশে অন্ধ্র রাজা ও

রাণীর মিথুন চিত্রে কতকটা স্থূল ভাবে পাওয়া যায়। বোম্বাই সহরের নিকট কান্‌হেরীর গুহা-মন্দিরের বারান্দায় খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ সদারাপুত্র-দানপতির শৈলচিত্র কার্লী গুহার এই শ্রেণীর প্রতিমূর্ত্তির অনুকরণ ও অনুসরণ করেছে। কিন্তু এই রীতির উপাসক "রাজ-রাণীর" শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়, সাত শতকের মহামল্লপুরের পহলব রাজাদের শৈল-মন্দিরের প্রকোষ্ঠে। সবগুলিই relief work, অর্দ্ধ চিত্র. (১৬) রাজা আগে চলেছেন,—ভক্তিনম্র ও সলজ্জ ভঙ্গীতে অনুসরণ করেছেন রাণী ;—চলার চল্‌তে রাজা ফিরে কথা কইছেন রাণীর সঙ্গে। এই ভঙ্গীটির স্বস্তিত-গতির সুমধুর ভাবটী শিল্পী বড় কৌশলে, সুন্দর ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভঙ্গীটির কুশল-চিত্রে শিল্পীর anatomy-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চাতের ভিত্তি-পটে (back ground) মোটা মোটা রেখা টেনে, মূর্ত্তির মসৃণ ও সুগোল অঙ্গলীলার মাধুর্য্য বিপরীত রস দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। একটীও অনাবশ্যকীয় অলঙ্কার, কি অন্য কোনও খুঁটি-নাটির বাধা নেই। এই অলঙ্কারহীন সরল ঐশ্বর্য্যে অপরূপ শিলা-চিত্রটী বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

গ্রীক ও ভারতের বিভিন্ন নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিপরীত ও বিভিন্ন কল্পনায় চিত্রিত নানা শিলাপটে প্রকটিত হয়েছে।

বৃটিশ মিউজিয়ম চিত্রশালার বিখ্যাত Townley Venus গ্রীক শিল্পীর অভিনব রূপ কল্পনা (১৭)। দেবী দাঁড়িয়েছেন এক পায়ের উপর ভর দিয়ে, অপর পাটী একটু কুঞ্চিত করে। একটী হাত লীলা-ভঙ্গীতে মাথার নিকট পর্য্যন্ত তুলেছেন, অপর হাতটী কটীতে ন্যস্ত করে প্রসারিত করেছেন। পরিধানের বস্ত্র নাভীর নীচে দিয়ে এসে হাতের উপর অযত্নে স্থাপিত। রূপ-শিল্পীর দৈহিক সৌন্দর্য্যের অপরূপ কামধেনু। ভারতের দেবী মূর্ত্তির তুলনায়, রূপের রসটী যেন একটু অতিউজ্জ্বল, অতিউগ্র, অতিপ্রখর। তবে ভঙ্গীটী বেশ মনোহর, নয়ন মুগ্ধকর।

(চিত্র ১৮) আর এক অভিনব ভঙ্গীতে, বৃক্ষের শাখা অবলম্বন করে, নব-বিকশিত বৃক্ষের ফল ও পুষ্প-সম্ভারের উপহার নিয়ে— মোহনী-মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করে দাঁড়িয়েছেন প্রাচীন ভারতের বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—নব-বসন্ত সমাগমে বৃক্ষের নবযৌবনশ্রী। গ্রীসের "ভিনাস" হতে আকৃতিতে কিছু খর্ব্বা, কিছু পীনাঙ্গী, কালিদাসের কবিতায় অভিনন্দিত ভারতের অভীপ্সিত নারীর কাম্য-মূর্ত্তি। মথুরার ভাস্কর্য্য-শিল্পে নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে, পূজা পেয়েছেন এই নয়নের তৃপ্তি-দায়িনী রূপের মায়াবিনী— কখনও 'যক্ষিনীর' ভূমিকায়, কখনও 'নায়িকার' বেশে, কখনও 'বৃক্ষদেবীর' রূপে, কখনও গৃহলক্ষ্মীর সলজ্জ, সংযত, স্তিমিত স্নিগ্ধ দীপ্তি নিয়ে।



১৬। পহ্লব রাজা ও রাণী, মহামল্লপুরম্।



১৭। টাউন্‌লী ভিনস্‌, বৃটিশ মিউজিয়ম্‌।



১৮। বৃক্ষ-দেবতা (যক্ষিণী ?), সাঁচী।

বৃক্ষের তলায় ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গীতে, এক হাত বৃক্ষের পল্লবে রেখে আর এক হাতে বৃক্ষের শাখা বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছেন, ভারতের আর এক প্রাচীন বৃক্ষ-দেবতা (চিত্র ১৯)। মথুরার নানা প্রাচীন চৈত্য-মন্দিরের স্তম্ভের উপর, এই শ্রেণীর নানা ভঙ্গীর বৃক্ষ-দেবতা ও যক্ষিনীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। দেবী-প্রতিমায় সংযম ও মাধুর্য্য এই শ্রেণীর মূর্ত্তিতে প্রায় পাওয়া যায় না। একটা লালসা ও কামনার ভাব,—ইন্দ্রিয়-বোধের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত যেন প্রায় ফুটে উঠে, এই সব বৃক্ষকা ও যক্ষ-সুন্দরীদের রূপ কল্পনায়।

বাম-পদাঘাতে অশোক-বৃক্ষের ফুল ফুটিয়ে, অভিনব রসের মূর্ত্তি নিয়ে, নূতন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছেন আর এক সুন্দরী (২০)। রূপ ও অবয়বের কল্পনা প্রায় একই, প্রভেদ কেবল ঐ ভঙ্গীতে। সুন্দরীর পাদ-তাড়নায় অশোক-বৃক্ষ যে মঞ্জরিত হয়ে উঠে, এই কবি-কল্পনা কালিদাসের অনেক কবিতায় উল্লেখ আছে। 'রঘু-বংশ'র "অজ-বিলাপে," রাজা আক্ষেপ করে বলেছিলেন :—"তুমি যার দোহদ সম্পন্ন করেছ, সেই আশোক যখন পুষ্পিত হয়ে উঠবে, তখন তোমার অলকাভরণের উপযুক্ত ফুল নিয়ে আমি কি করব ? অশোক তোমার স-শব্দ-নূপুর চরণানুগ্রহ স্মরণ করে নিশ্চয়ই কুসুমাশ্রু বিসর্জ্জন করবে" [রঘু, ৮, ৬২-৩]। ভীত, চকিত, ও সলজ্জ ভঙ্গীতে হাত দুটী যুক্ত করে, দাঁড়িয়ে আছেন আর এক ভামিনী, (২১)। কুণ্ডলী-পাকান কেশের অপর্য্যাপ্ত সম্ভার পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। কটী-তটের রসনার গুরুভার যেন নুয়ে পড়েছে পাদ-দ্বয়ের সুললিত বক্র-রেখায়। সমস্ত মূর্ত্তিটী একটু সলজ্জ মাধুরী ও সঙ্কোচের ভাবে অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এই মূর্ত্তি-চিত্রের সুকুমার, সুললিত রেখা-ভঙ্গী ও কল্পনার রূপ-রসটী বেশ স্নিগ্ধ সংযমের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। এই মূর্ত্তির ভাব ও আদর্শ মথুরার অসংখ্য যক্ষিনী-চিত্রের উত্তপ্ত রস ও প্রখর দীপ্তি হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ভারতের নারী-কল্পনার স্তিমিত মাধুরী হতে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, গ্রীসের নারী সৌন্দর্য্যের উজ্জল ও উত্তপ্ত দীপ-শিখার প্রখর আলোকে দুটী বিভিন্ন আদর্শের নারী-কল্পনার আবার তুলনা করা যাক।

লুভ্‌র্‌-চিত্রশালার ফ্রেজুস্‌ আফ্রোডইট্‌, (২২) প্রণয়ের দেবী-প্রতিমা,—রূপের ঈশ্বরী। এঁর রূপের লাবণ্য ও দীপ্তি ফুটেছে স্থির, গম্ভীর প্রশান্ত, গৌরব-পূর্ণ, সুন্দর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিতে। এই গতি-হীন গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিটিকে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যে দীপ্যমান করে তুলেছে। কিন্তু এই দিব্য-ভাবটীর কিঞ্চিৎ বিপরীত রস ফুটেছে দুটী হাতের সঞ্চালনের ভঙ্গীতে। ঊর্দ্ধমুখী হাতটীর কাপড়-টানার ভাণটার বিশেষ কোনও তাৎপর্য্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কৃত্রিম-অভিনয়ের ভঙ্গী, হাতটীর সুগঠিত, সুগোল

সৌন্দর্য্য দেখাবারই একটী কল্পিত pose বা ভাণমাত্র মনে হয়। সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে যে বেশ একটু নীরব নিশ্চলতার গম্ভীর রস ফুটে উঠেছে, হাত দুটীর কৃত্রিম চঞ্চলতায়, তার ঠিক সম্মান ও সঙ্গতি রক্ষা হয়নি।

ভারতের এক দেবী-প্রতিমায় অফ্রোডাইটের অবয়ব-সমাবেশের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। এক হাতে কটীদেশ, আর এক হাতে ঊর্দ্ধে লতা-বেষ্টনীর উপরিভাগ স্পর্শ করে, এক পায়ের উপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছেন,—মকরের 'পীঠের' উপর আসন করে,—মকরবাহিনী (২৪)। ভঙ্গীর ভাবটী হচ্ছে—স্থির, গতিহীন। কিন্তু এই গতিহীন অচঞ্চল রসটী অনুবাদ করা হয়েছে, নানা বক্র ও চঞ্চল রেখার প্রাচুর্য্যে। কোথাও একটী ও সরল সোজা straight line নেই—সবই বাঁকা রেখা। পা দুটী বাঁকা, হাত দুটী বাঁকা, মকরের দেহটী বেশ গোলগাল বাঁকা রেখায় আঁকা, —আর সমস্ত মূর্ত্তিটীকে ঘেরে চলেছে একটী অলৌকিক লতার বক্র-বেষ্টনী,—শিল্পীর উদ্দাম কল্পনা,—মকরের মুখ থেকে বেরিয়ে কটীলগ্ন হাতের নীচে দিয়ে ঘুরে, মাথার চারিদিকে প্রভা-তোরণের মত ঘিরে রয়েছে। মূর্ত্তিটী দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এর চিত্রের সমস্ত রেখাগুলি, পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে তরঙ্গ তুলে, যেন ছুটে চলেছে। এই গতিহীন চঞ্চলতা,—movement in repose,— ভারতের অনেক দেবী প্রতিমার অবয়ব-কল্পনার অভিনব শিল্প-কৌশল। এই কৌশলটী বোধ হয় মথুরার শিল্পীরা তাঁদের যক্ষিণী ও নায়িকা-চিত্রে প্রথম আবিষ্কার করেন; পরের যুগের অনেক ভাস্কর্য্যে বহুদিন কৌশলটী প্রচলিত ছিল।

ষোলো শতকের বিজয়-নগরের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত "তাড়পত্রীর" মন্দিরের এক মকরবাহিনী (চিত্র ২৫) সেই একই কল্পনার অনুসরণ করেছে। লতা-বেষ্টনী আলিঙ্গন করে, মধুর সচঞ্চল ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মন্দিরের দ্বার-পালিকা। মাথার পিছনে ফুলের মালার উপর দিয়ে সুগোল কুণ্ডলী পাকিয়ে, প্রকাশ পেয়েছে কেশ-পাশের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য। গ্রীসের দেবীদের মত, ভারতের দেবীরা অত জাগ্রত, অত self-conscious নয়। স্তিমিত নেত্রে আপনার মধ্যে আপনি নিমজ্জিত ধ্যানের ভাবটী, সেই জন্য শিল্পী বেশ নিবিড় করে ফুটেয়ে তুলেছেন। যত কিছু ভূষণের ঘটা ও রেখা-মালার চঞ্চলতা ও কোলাহল, circle-এর পরিধির ধারে,—কেন্দ্রস্থলে কিন্তু প্রশান্ত, নিশ্চল নীরবতা। দুটী বিপরীত রসের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি শিল্পী বড় কৌশলেই সু-সম্পন্ন করেছেন।

ফ্লোরেন্সের চিত্রশালার সুবিখ্যাত "মেদিচি ভিনাসের" (২২) অনাবৃত সৌন্দর্য্যের অনেক পূজারী, ইউরোপের নানা সৌন্দর্য্য-বিদ্যা-পীঠে, এই প্রতিমার চরণে প্রতি বৎসর মাথা নত করতে শিক্ষা করেন। সু-সমাবিষ্ট



২১। যক্ষিণী, সাঞ্চী।



২২। মেদিচি ভিনস্, ফ্লোরেন্স।





সৌন্দর্য্য দেখাবারই একটী কল্পিত pose বা ভাণমাত্র মনে হয়। সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে যে বেশ একটু নীরব নিশ্চলতার গম্ভীর রস ফুটে উঠেছে, হাত ছুটীর কৃত্রিম চঞ্চলতায়, তার ঠিক সম্মান ও সঙ্গতি রক্ষা হয়নি।

ভারতের এক দেবী-প্রতিমায় অফ্রোডাইটের অবয়ব-সমাবেশের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। এক হাতে কটীদেশ, আর এক হাতে ঊর্দ্ধ লতা-বেষ্টনীর উপরিভাগ স্পর্শ করে, এক পায়ের উপর স্থির ভাবে দাঁড়িয়েছেন,—মকরের 'পীঠের' উপর আসন করে,—মকরবাহিনী (২৪)। ভঙ্গীর ভাবটী হচ্ছে—স্থির, গতিহীন। কিন্তু এই গতিহীন অচঞ্চল রসটী অনুবাদ করা হয়েছে, নানা বক্র ও চঞ্চল রেখার প্রাচুর্য্যে। কোথাও একটী ও সরল সোজা straight line নেই—সবই বাঁকা রেখা। পা ছুটী বাঁকা, হাত ছুটী বাঁকা, মকরের দেহটী বেশ গোলগাল বাঁকা রেখায় আঁকা, —আর সমস্ত মূর্ত্তিটীকে ঘেরে চলেছে একটী অলৌকিক লতার বক্র-বেষ্টনী,—শিল্পীর উদ্দাম কল্পনা,—মকরের মুখ থেকে বেরিয়ে কটীলগ্ন হাতের নীচে দিয়ে ঘুরে, মাথার চারিদিকে প্রভা-তোরণের মত ঘিরে রয়েছে। মূর্ত্তিটী দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু এর চিত্রের সমস্ত রেখাগুলি, পরস্পরের ঘাড়ে পড়ে তরঙ্গ তুলে, যেন ছুটে চলেছে। এই গতিহীন চঞ্চলতা,—movement in repose,— ভারতের অনেক দেবী প্রতিমার অবয়ব-কল্পনার অভিনব শিল্প-কৌশল। এই কৌশলটী বোধ হয় মথুরার শিল্পীরা তাঁদের যক্ষিণী ও নায়িকা-চিত্রে প্রথম আবিষ্কার করেন; পরের যুগের অনেক ভাস্কর্য্যে বহুদিন কৌশলটী প্রচলিত ছিল।

ষোলো শতকের বিজয়-নগরের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত "তাড়পত্রীর" মন্দিরের এক মকরবাহিনী (চিত্র ২৫) সেই একই কল্পনার অনুসরণ করেছে। লতা-বেষ্টনী আলিঙ্গন করে, মধুর সচঞ্চল ভঙ্গীমায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মন্দিরের দ্বার-পালিকা। মাথার পিছনে ফুলের মালার উপর দিয়ে সুগোল কুণ্ডলী পাকিয়ে, প্রকাশ পেয়েছে কেশ-পাশের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য। গ্রীসের দেবীদের মত, ভারতের দেবীরা অত জাগ্রত, অত self-conscious নয়। স্তিমিত নেত্রে আপনার মধ্যে আপনি নিমজ্জিত ধ্যানের ভাবটী, সেই জন্য শিল্পী বেশ নিবিড় করে ফুটেয়ে তুলেছেন। যত কিছু ভূষণের ঘটা ও রেখা-মালার চঞ্চলতা ও কোলাহল, circle-এর পরিধির ধারে,—কেন্দ্রস্থলে কিন্তু প্রশান্ত, নিশ্চল নীরবতা। ছুটী বিপরীত রসের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি শিল্পী বড় কৌশলেই সু-সম্পন্ন করেছেন।

ফ্লোরেন্সের চিত্রশালার সুবিখ্যাত "মেদিচি ভিনাসের" (২২) অনাবৃত সৌন্দর্য্যের অনেক পূজারী, ইউরোপের নানা সৌন্দর্য্য-বিদ্যা-পীঠে, এই প্রতিমার চরণে প্রতি বৎসর মাথা নত করতে শিক্ষা করেন। সু-সমাবিষ্ট



১৯। যক্ষিণী, সাঞ্চী।



২২। মেদিচি ভিনস্, ফ্লোরেন্স।



২০। অশোক বৃক্ষমূলে তরুণী, মথুরা।



২১। নারীমূর্ত্তি, মথুরা।



২৩। ফ্রেজুস্ আফ্রোডাইট, লুভ্র।



২৪। গঙ্গাদেবী, ভেলুর।



২৫। গঙ্গাদেবী
তাড়পত্রী, বিজয়নগর।



২৬। পরিচারিকা
কুরঙ্গনাথ-মন্দির, চোলযুগ।



২৭। প্রজ্ঞাপারমিতা, যবদ্বীপ, লাইডেন মিউজিয়ম।

দেহের লাবণ্যে ও স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে মূর্ত্তিটী বাস্তবিকই অনবদ্য। কিন্তু হাত দুটীর লাজের ও সঙ্কোচের ভঙ্গীটী, যেন দেবী-কল্পনার সম্পূর্ণ বিপরীত-রসের সৃষ্টি করেছে। লাজের বাধা ও সঙ্কোচের ক্ষুদ্রতা সংযুক্ত করে, দেবী-প্রতিমাতে মানুষীভাব আরোপ করা হয়েছে। সদ্য-ত্যক্ত-বসনার বস্ত্রহীনতা, অস্বস্তি ও সঙ্কোচ, লজ্জার বেদনায় ফুটে উঠেছে। দেবীকে মানুষের ক্ষুদ্রতায় ক্ষুণ্ণ করে, ছোট করে কল্পিত ও চিত্রিত করা হয়েছে।

দক্ষিণ-দেশের চোল-যুগের একটী মন্দিরের পরিচারিকার মূর্ত্তি (চিত্র ২৬),—গ্রীসের ঐ অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্য, Venus-মূর্ত্তির সহিত তুলনা করা যাক। এটী দেবীর মূর্ত্তি নয়,—চামর-বাহিনী পরিচারিকা মাত্র,—কাঁধের উপর চামরটী রেখে, এক হাতে দণ্ডটী ধরে, অপর-হাতটী কটীতটে রেখে, সমপাদ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা। অবশ্য একটী হাত ও একটী পা ভেঙ্গে গিয়ে, মূর্ত্তিটীর পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের অঙ্গহানি হয়েছে। কিন্তু এই পরিচারিকার মূর্ত্তিতে, বাধাবিহীন সঙ্কোচহীন, অনাবৃত উত্তমাঙ্গের অকৃত্রিম, সরল সৌন্দর্য্যে, যে দিব্য ভাবটী আপনা-আপনি, ফুটেছে,—যে অলৌকিক অধ্যাত্ম-সুষমার ছটা কল্পনাটীকে আলোকিত করে রেখেছে, গ্রীসের মানুষী দেবী-প্রতিমায় তা পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করিলেও মিলবে না। মন্দিরের দেব-দাসী দেবতার ধ্যানেই আত্মহারা, তাহার উত্তমাঙ্গ আবৃত, কি অনাবৃত, গ্রীসের ভিনাসের মত, অত ভেবে দেখবার অবসর বা প্রবৃত্তি নেই। নারীর প্রতিমা ভারতের শিল্পীর চক্ষে, সাধারণতঃ, মাতৃত্বের গৌরবের চিহ্ন নিয়ে অসঙ্কোচে ফুটে উঠে,—এ কল্পনায় লজ্জা-সঙ্কোচের অবসর নেই। দেবলোকের অমানুষী কল্পনার মানসীরা, ক্ষুদ্র-মানবের ইন্দ্রিয়-বোধের বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত, মানুষের ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়-বুদ্ধির কলঙ্কের ছায়া দেবলোকের দিব্য জ্যোতিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আদি বুদ্ধের জননী, প্রজ্ঞাপারমিতার (চিত্র ২৭) অলৌকিক প্রতিমা যে স্বর্গের সুষমা, যে অধ্যাত্ম-জগতের পবিত্র পাবক-শিখার প্রখর আলোকে উজ্জ্বল, তার জ্বলন্তশিখায় মানুষের মনের সমস্ত ক্ষুদ্রভাব চিরকালের মত সমাধি-লাভ করে, নীরব ও নিস্তব্ধ হয়। মাতৃ-মূর্ত্তির মুখের অনাবিল সৌন্দর্য্যে, মধুর ধ্যানীভাবে নিমজ্জিত হয়ে, আমাদের চোখেই পড়ে না যে দেবীর উত্তমাঙ্গ অনাবৃত। শিল্পী ঝোঁক দিয়েছেন, মনোনিবেশ করেছেন কোনওরূপ বাহ্য, দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রকাশে নয়;—দেহকে, বাহ্য-বস্তুকে, ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে, ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করে, অতীন্দ্রিয়কে জাগিয়ে তুলেছেন ভারতের চির-অনুস্মৃত, দৈব-কল্পনার অলৌকিক অপ্রাকৃত রূপের,—মানুষের হাতে-গড়া,—অমানুষী সৌন্দর্য্য-

সৃষ্টি ;—ভারতের ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব-কল্পনা ও অভিনব শিল্প-সৃষ্টি, সৌন্দর্য্য-জগতের এই সাত্ত্বিকতার অপ্রাকৃত, অভিনব রূপ-কল্পনা, গ্রীসের দৈহিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পনার বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে, এই অতীন্দ্রিয়ের উপাসনা,—এই ভোগী জগতের অতীত [illegible] রূপের আরাধনা,—এই "সমস্ত বিশ্বের রূপ-ডোবান রূপের" পূজা—আমাদের নবীন-শিল্পীদের লেখনী-মুখে, আবার কবে জেগে উঠবে, ব্যগ্র হয়ে [illegible] প্রতীক্ষা করছেন আমাদের ভারতের প্রাচীন শিল্প-দেবতা।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত

সমগ্র সভ্যজগতে আমাদেরই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চ্চা করিতে চাহিলে তর্কের উদ্ভব হয়। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরাজী ভাষা। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এমনই ভাবে গঠিত যে জ্ঞানার্জ্জনের সকল দ্বারগুলিই ইংরাজী ভাষার অর্গলে আবদ্ধ। এই অর্গলটি খুলিবার শক্তি সঞ্চিত না হইলে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন বিষয়েরই অন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই না। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতাও ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্বের মাপকাঠিতে বিচার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয়, ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, বিদ্যায়তনের বাহিরেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, শিক্ষিত মহলে পত্রালাপ ও অনেকস্থলে কথাবার্ত্তাও রাজভাষাতেই পরিচালিত হইত। বাংলাদেশে এমন সংসার এখনও লোপ পায় নাই যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের সহিত ইংরাজীতেই আলাপ করে, ও বাড়ীর কাহারও অ্যাক্‌সেন্ট্ যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ না হইলে তাহার সহিত হিন্দী ব্যবহার করে, পাছে বাংলা বলার হীনতায় লিপ্ত হইতে হয়।

মাতৃভাষার অবহেলা ক্ষোভের কারণ বটে, তবুও এই বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনে বাঙালীমনের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিরূপতা যতই তীব্র হউক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে, সমৃদ্ধতর সাহিত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙালী ইংরাজীকে গ্রহণ করিয়াছিল, ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া। বাঙালী যেরূপ তন্ময়ভাবে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে, অন্য কোন জাতি কোন বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে সেরূপ চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় এক সময় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মাতৃভাষাকেও অবহেলা করিত, কিন্তু কোন রুশ লেখক ফরাসী ভাষায় এমন কিছু লিখিতে পারেন নাই, যাহা ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে। অথচ বাঙালী সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া লর্ড কার্জ্জনের ঈর্ষা হইয়াছে; বাঙালী লেখকের ইংরাজী গদ্য ইংরাজ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে; আর বাঙালী কবি ইংরাজীতে এমন কবিতা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, যাহা ইংরাজী

সৃষ্টি ;—ভারতের ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব-কল্পনা ও অভিনব শিল্প-রীতি। সৌন্দর্য্য-জগতের এই সাত্ত্বিকতার অপ্রাকৃত, অভিনব রূপ-কল্পনা, গ্রীসের দৈহিক, রাজসিক ও তামসিক কল্পনার বহু উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে, এই অতীন্দ্রিয়ের উপাসনা,—এই ভোগী জগতের অতীত অধ্যাত্ম রূপের আরাধনা,—এই "সমস্ত বিশ্বের রূপ-ডোবান রূপের" পূজা—আমাদের নবীন-শিল্পীদের লেখনী-মুখে, আবার কবে জেগে উঠবে, ব্যগ্র হয়ে তার প্রতীক্ষা করছেন আমাদের ভারতের প্রাচীন শিল্প-দেবতা।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত

সমগ্র সভ্যজগতে আমাদেরই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চ্চা করিতে চাহিলে তর্কের উদ্ভব হয়। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরাজী ভাষা। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এমনই ভাবে গঠিত যে জ্ঞানার্জ্জনের সকল দ্বারগুলিই ইংরাজী ভাষার অর্গলে আবদ্ধ। এই অর্গলটি খুলিবার শক্তি সঞ্চিত না হইলে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন বিষয়েরই অন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই না। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতাও ইংরাজী ভাষায় কৃতিত্বের মাপকাঠিতে বিচার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয়, ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? সুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে, বিদ্যায়তনের বাহিরেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, শিক্ষিত মহলে পত্রালাপ ও অনেকস্থলে কথাবার্ত্তাও রাজভাষাতেই পরিচালিত হইত। বাংলাদেশে এমন সংসার এখনও লোপ পায় নাই যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের সহিত ইংরাজীতেই আলাপ করে, ও বাড়ীর কাহারও অ্যাক্‌সেণ্ট্ যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ না হইলে তাহার সহিত হিন্দী ব্যবহার করে, পাছে বাংলা বলার হীনতায় লিপ্ত হইতে হয়।

মাতৃভাষার অবহেলা ক্ষোভের কারণ বটে, তবুও এই বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনে বাঙালীমনের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিরূপতা যতই তীব্র হউক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে, সমৃদ্ধতর সাহিত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙালী ইংরাজীকে গ্রহণ করিয়াছিল, ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া। বাঙালী যেরূপ তন্ময়ভাবে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছে, অন্য কোন জাতি কোন বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে সেরূপ চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় এক সময় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মাতৃভাষাকেও অবহেলা করিত, কিন্তু কোন রুশ লেখক ফরাসী ভাষায় এমন কিছু লিখিতে পারেন নাই, যাহা ফরাসী-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে। অথচ বাঙালী সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া লর্ড কার্জ্জনের ঈর্ষা হইয়াছে; বাঙালী লেখকের ইংরাজী গদ্য ইংরাজ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে; আর বাঙালী কবি ইংরাজীতে এমন কবিতা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, যাহা ইংরাজী

কাব্যচয়নে সগৌরবে আসন গ্রহণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গদ্য, তাহার নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরাজী সাহিত্যে এমন একটি অভিনব রূপ-সম্পদ দান করিয়াছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে বিংশশতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে বাঙালীর এ-কৃতিত্ব স্বরাজ-অর্জ্জনের অপেক্ষাও মহত্তর—ইহা দিগ্বিজয়।

সুধু ইহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য। তাহার এ সম্মানের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য। যেদিন ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত আরবী ফারশী ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহন ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়া লাতিন গ্রীক হিব্রু পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন, সেইদিন হইতে বাঙালীর চিন্তাধারা যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইয়োরোপের ও বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া বাঙালীর জীবন-বেলায় আঘাত করিয়াছে, তাহার জীবন-বেদকে আলোড়িত করিয়াছে। এই আলোড়নের ফলেই আজ বাংলার সমাজ পরিবর্ত্তনের দুর্দ্দম বেগে টলমল, তাহার রাষ্ট্রনীতি স্বাধীনতার তীব্র কামনায় বিপ্লব-পন্থী, তাহার সাহিত্য সুদূরের উন্মাদনায় বিভোর।

কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে যে-দীপের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে তাহাকে জ্বালাইয়া রাখাই মূঢ়তা। বাংলার নির্ব্বাপিত প্রাণপ্রদীপকে দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য ইংরাজী ভাষার দীপশলাকার প্রয়োজন ছিল। আজ যখন জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আজও কি আমাদের জ্ঞানালোকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, পরভাষার নিকট ভিক্ষা মাগিতে হইবে? জাতীয় সমুত্থানের কোনই সার্থকতা থাকিবেনা যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ বিশ্বসম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে না পারি। আমাদের সমস্ত জ্ঞান-প্রচেষ্টার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে যেখানে যাহা কিছু জানিবার আছে, বুঝিবার আছে, উপভোগ করিবার আছে, সমস্তই যেন আমরা সুধু বাংলা ভাষার সহায়তায় জানিতে, বুঝিতে, উপভোগ করিতে পারি।

এ-পথের পথিক হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, সমস্ত শিক্ষায়তনে—উচ্চ-মধ্য-নিম্ন-নির্ব্বিশেষে—বাংলা ভাষার যতদূর সম্ভব একান্ত প্রচলন। যাহা কিছু বাংলায় পড়ানো সম্ভব, তাহার জন্য যেন অন্য ভাষারপ্রয়োগ

না হয়। আর প্রয়োজন, বাংলা ভাষার অসম্পূর্ণতার দিকে শিক্ষিতজনের খরদৃষ্টি, ও সম্প্রসারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা।

সুদীর্ঘ বিলম্বের পর এতদিনে দেশের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে। আদ্য পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমুদয় পাঠ্য যাহাতে বাংলায় পঠিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই উহা বিধিবদ্ধ ও সাধিত হইবে। ইংরাজী ভাষা অবশ্যশিক্ষনীয়ই রহিল, তবে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় সমস্তই বাংলার মারফৎ শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এই যে, সংস্কৃত ভাষা এতদিন আবশ্যিক ছিল, এখন তাহাকে ঐচ্ছিকের কোঠায় ফেলা হইল।

ইহা লইয়া দেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের, এমন কি আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকিলে এত কম ছাত্র উহা পড়িতে চাহিবে যে, পণ্ডিতমহাশয়গণের দুরূহ জীবন দুরূহতর হইয়া উঠিবে। এই ধারণা করুণার উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নহে, কাজেই এ-প্রসঙ্গে আর কিছু না বলাই শোভন। তাঁহাদের দ্বিতীয় আর একটি গুরুতর আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত না পড়িলে বাংলা ভাষার ও সাহিতের উন্নতি অসম্ভব। কেননা, বাঙালীর সমাজ, ধর্ম্ম, দর্শন, সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে পরিচালিত; ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রভাবে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত; তাহার পরিশীলীয় ঐতিহ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তরে সুরক্ষিত।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহারা বাঙালী বলিতে বাঙালী হিন্দুকে বোঝেন, যদিও হয়ত তর্কের খাতিরে স্বীকার করিবেন, সংস্কৃতের মত আরবী বা ফারশীও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালী, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে বাঙালী হইয়া উঠুক, ইহাই কি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় নহে? এই মিলনের জন্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা প্রশস্ততর কোন্ ক্ষেত্র আছে? এই মিলনের জন্য বাংলা ভাষাকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলা চাই যে, তাহা যেন সকল বাঙালীরই মনের ভাষা, প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে। তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে, পৃথিবীর যে-কোন ভাষা হইতে যে-কোন-কিছু আহরণ করিতে আমরা যেন লজ্জিত না হই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্বীকার করা দরকার, বাংলা ভাষার উদ্ভব যেখান হইতে বা যেমন করিয়া হোউক না কেন, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহার স্বাধীন সত্তাকে মানিয়া লইয়া তবে এই আহরণ-প্রণালী প্রয়োগ করা উচিত। বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত যাহার বিরোধ, তাহাকে আমরা যেমন অকুণ্ঠে

বিসর্জ্জন দিব, যাহার সহিত তাহার মিল, তাহাকে তেমনই অকুণ্ঠে গ্রহণ করিয়া লইব। এই উদ্দেশ্যে, দেশের পরিশীলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যত ভাষার প্রচার হয় ততই শুভ। কিন্তু কোনটিকেই অবশ্য-পাঠ্য করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না—এমন কি যাহার সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ নিগূঢ়তম, সেই সংস্কৃতকেও না। সংস্কৃতপন্থী-দিগকে আমরা সবিনয়ে জানাইতে চাহি, সংস্কৃত অভিধানের যে-কোন পদ, সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি সমাস কৃৎ-তদ্ধিতের যে-কোন নিয়ম, প্রয়োজন হইলেই আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার আক্ষরিক রূপ ও তাহার শব্দরূপ ধাতুরূপের বিশাল ভার অবশ্যপাঠ্য করিয়া ছাত্রদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহি না। আমাদের মনে হয়, যে-ভাবে পূর্ব্বে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বাংলা পড়ানো হইত, সে-ভাবে পড়াইলে, সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না হইলেও শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না। আর যদি ছাত্রেরা সংস্কৃত না-ও পড়ে, তাহা হইলে যে-লোক বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', মাইকেলের 'মেঘনাদ-বধ', তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী', কালিসিংহের 'মহাভারত' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র বাংলা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহাকে বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়া সংস্কৃত পরিশীলনের সারমর্ম্ম জ্ঞাপন করা নিতান্ত কঠিন হইবে না।

ইংরাজী তাহা হইলে অবশ্যশিক্ষনীয় থাকিবে কেন? যতদিন ইংরাজ এদেশের রাজা, ততদিন এ-তর্কের কোন সার্থকতা নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষার দিক্ হইতে প্রশ্নটীর কোন উত্তর দেওয়া হইল না। আসল কথাটী এই যে, বাঙালীকে ত সুধুই বাঙালী থাকিলে চলিবে না, তাহাকে বিশ্বের অন্য জাতির সহিত মিশিতেই হইবে—ভাবের আদান-প্রদান, পণ্যের আদান-প্রদান করিতেই হইবে। ইংরাজী ভাষা এ-বিষয়ে আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু যে-ভাবে ও যে-ধরণের ইংরাজী আমাদের দেশে সাধারণতঃ শেখানো হয় আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের শেখা দরকার কাজ-চালানো ইংরাজী, অথচ আমরা শিখি—অর্থাৎ শিখিবার হাস্যকর ব্যর্থ চেষ্টা করি—সাহিত্যিক ইংরাজী। সাধারণ বাঙালী সাহিত্যিক ইংরাজীকে লেখায় বা কথায় ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া ইংরাজ-মহলে "বাবু-ইংরাজীর" প্রতি কটাক্ষের অন্ত নাই। ইংরাজী সাহিত্যের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি; তবুও বলিব, এই সাহিত্যিক ইংরাজী ছাত্রগণের অবশ্যপাঠ্য না হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও বাণিজ্যের তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ আজ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এরূপ

সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাষা-সমস্যার সমাধান না করিলেই নহে। অনেকদিন হইতেই একটা সার্ব্বজনীন ভাষা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলে চলিতেছে। উদ্ভাবনও হইয়াছে অনেক, কোনটীই কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে ধোপে টিঁকিতেছে না। ভাষাতাত্ত্বিকের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়া তাহারা সংসারে প্রবেশ করিতেছে অকালভূমিষ্ঠ শিশুর মত জীবন্মৃত অবস্থায়। দৈনন্দিন ব্যবহার ভাষার প্রাণ, অথচ এমন একদল লোকও নাই যাহারা স্বভাবতঃ এ-ভাষাগুলি ব্যবহার করে। অনেকগুলি চেষ্টা আবার দু-তিনটী সুপরিচিত ভাষার জগাখিচুড়ী মাত্র—একান্ত নিজস্ব বিশেষত্ব-বর্জ্জিত। সার্ব্বজনীনভাবে এরূপ ভাষা চলিবার সম্ভাবনা কতটুকু, সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজ্-এর মড্‌লিন্ কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক সি, কে, অগ্‌ডেন্ এই কূট সমস্যার এক সুচারু সমাধান করিয়া দিয়াছেন—অন্ততঃ এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। বেব্‌লস্তম্ভের আমল হইতে যে ভাষা-বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কথিত, হয়ত ইহার চেষ্টায় তাহার নিরাকরণ হইবে। ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ইংরাজী ভাষা লোক-সংখ্যায় অন্য সব ভাষাকে বহুদূর পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছে। অধ্যাপক অগ্‌ডেন্-এর বিশ্বাস, কয়েকটি আভ্যন্তরীণ বাধা দূর করিতে পারিলেই ইহা একেবারে সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে। তাই সমস্ত ইংরাজী ভাষাকে তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইংরাজী ৮৫০টী শব্দ দিয়াই সাধারণতঃ মানুষের ভাষা-ব্যবহারের সমস্ত প্রয়োজন মেটানো যায়; আর যে বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী-অনুযায়ী এই শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহারা একটি পৃষ্ঠার মধ্যেই অনায়াসে স্থান করিয়া লইতে পারে। তাঁহার এই উদ্ভাবনায়—যাহার নাম হইয়াছে Basic English—ইংলণ্ডে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তিনি তাঁহার Debabelisation পুস্তিকায় করিয়াছেন। তাহার মুখবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

Basic English is an attempt to give to everyone a second, or international, language, which will take as little of the learner's time as possible.

It is a system in which everything may be said for all the purposes of everyday existence: the common interests of men and women, general talk, news, trade, and science.

To the eye and ear it will not seem in any way different from normal English, which is now the language of 500,000,000, persons.

There are only 850 words in the complete list, which may be clearly printed on one side of a piece of note-paper. But simple rules are given for making other words with the help of those in

the list; such as **designer, designing** and **designed,** from design, or **air-plane** from **air** and **plane.**

The word order is fixed by other short rules, which make it clear from an example such as

"I will put the record on the machine now."

What is the right natural place for every sort of word?

Whatever is doing the act comes first; then the time word, such as **will ;** then the act or operation **put, take,** or **get ;** then the thing to which something is done, and so on.

It is an English in which 850 words do all the work of 20,000; and has been formed by taking out everything which is not necessary to the sense. **Disembark,** for example, is broken up into **get off** a ship; **I am able** takes the place of **I can ; shape** is covered by the more general word **form;** and **difficult** by the use of **hard.**

By putting together the names of simple operations—such as **get, give, come, go, put, take**—with the words for directions like **in, over, through,** and the rest, two or three thousand complex ideas like **insert** which becomes **put in,** are made part of the learner's store.

Most of these are clear to everyone. It would be hard, for example, to go wrong about the way to put **disembark** or **debarquer,** into Basic English. But in no other language is there an equal chance of making use of this process. That is why Basic is designed to be the international language of the future.

In addition to the Basic words themselves, the learner has, at the start, about fifty words which are now so common in all languages that they may be freely used for any puryose. Examples are **Radio, Hotel, Telephone, Bar, Club.** Records like the one now on your machine will make it clear what the sounds are to be like.

For the needs of any science, a short special list gets the expert to a stage where international words are ready to hand.

Those who have no knowledge of English will be able to make out the sense of **Radio Talk,** or a **business letter,** after a week with the word-list and the records; but it may be a month or two before talking and writing are possible.

An Englishman will make an adjustment to Basic ways of thought in a very short time, but at first he will have to take some trouble to be clear and simple.

In fact, it is the business of all internationally-minded persons to make Basic English part of the system of Education in every country, so that there may be less chance of war, and less learning of languages—which, after all, for most of us, are a very unnecessary waste of time.

বাংলা প্রবন্ধে এই সুদীর্ঘ ইংরাজী সঙ্কলনের কৈফিয়ৎ আবশ্যক। সে কৈফিয়ৎ, বেসিক্ ইংলিশ্-এর আসল চেহারার সহিত বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়া দেওয়া। কারণ, বলিয়া না দিলে বোঝা দুঃসাধ্য, এই প্রবন্ধের আগাগোড়াই বেসিক্ ইংলিশ্-এ লিখিত। এ-ভাষার বিরুদ্ধে আর যে আপত্তিই থাকুক, ইহাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। ইহাতে

এমন একটি কথাও নাই যাহা সাধারণ ইংরাজে সাধারণতঃ ব্যবহার করে না।

ইংরাজী ভাষা সহজ হইবার পথে আর একটি প্রকাণ্ড বাধা আছে, অধ্যাপক অগ্‌ডেন্-এর উদ্ভাবনা যাহার সর্ব্বাঙ্গীন নিষ্পত্তি করিতে পারে নাই—অর্থাৎ ইংরাজীর বানান ও উচ্চারণ-বৈষম্য। প্রত্যেকটি বর্ণ প্রত্যেক স্থলে সমভাবে উচ্চারিত হইবে, ইহাই হইল আদর্শ রীতি। সব ভাষাতেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু ইংরাজীতে বানান ও উচ্চারণে বিভেদ অনেক সময় দিনরাত্রির মত বিপরীত। তাই আর একজন অধ্যাপক—ইনিও ইংরাজীকে সার্ব্বজনীন করিতে অভিলাষী যদিও নিজে সুইডেনবাসী—ইংরাজীর বানানরীতির সংশোধন করিয়া একটি খসড়া তৈরি করিয়াছেন। তাহারও বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। তাই অধ্যাপক জ্যাক্‌রিশন্-এর আংগ্লিক্ ইংরাজীর (Anglic English) কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল।

The prezent orthografy has mor than 500 waez of speling the 40 od soundz that okur in English wurdz in kurent use. Anglic has 65. Spaes is saeved to the extent of wun or tuu lienz on a printed paej. Anglic has aulredy been submited to nuemerus praktikal tests. Leeding eduekaeshonists and reprezentativz of the Pres, who hav been prezent at korsez givn in Stockholm and Uppsala, hav testified that Anglic is a moest efektiv meenz of teeching English to forinerz. After 20 lesnz the puepilz had aquierd a wurking nolij of English, and were aebl to reed not oenly Anglic but aulso eezy spesimenz of English in the egzisting speling.

তবে বেসিক্ ইংরাজীর স্বপক্ষে এইটুকু বলিবার আছে, ৮৫০টী কথার বানান ও উচ্চারণ শিখিতে কোন শিক্ষার্থীরই আপত্তি হওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ যখন এ-ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত বাক্-বিনিময়ের সম্ভাবনা। কাজেই অবশ্যপাঠ্যভাবে ইংরাজী শিখিতে হইলে আমাদের সাহিত্যিক ইংরাজী না শিখিয়া এই বেসিক্ ইংরাজী শেখাই উচিত। আর ইংরাজী সাহিত্যের অনুরাগীদিগকেও আমরা সবিনয়ে বলিয়া রাখি, বেসিক্ ইংরাজী সাহিত্যিক ইংরাজীর প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক ; সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তির নিকট বেসিক্ ইংরাজী হইতে সাহিত্যিক ইংরাজীর দূরত্ব মাত্র একটি পদক্ষেপ, এমন কি তদপেক্ষাও ন্যূন।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

অকৃতজ্ঞ

(১)

বিনীতা মুখভার করিয়া বসিয়াছিল; বিমলা সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—রাগ কোরে কি হবে বল্ মা, বিনু। আমাদের কি সাধ যে তোকে এমন কোরে কষ্ট দিই। কিন্তু আর উপায় ত কিছু নেই।

"দিদি, এদিকে এসো, দেখে টেখে নাও জিনিসপত্তর সব। তোমার মেয়েকে আসবে দেখতে, আর খাটুনি খেটে মরব আমি।" হাসিতে হাসিতে একটী যুবক ঘরে প্রবেশ করিয়া, মা ও মেয়ের মুখের ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া গেল। তাহার পিঠে কে যেন চাবুক কসাইয়া দিল। সে দেখিল বিনীতার মুখ রাগের ঝাঁঝে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিমলা কিন্তু শান্তস্বরেই কহিলেন—বিনু আজ ভারি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, সুজয়। কিছুতেই তৈরি হ'তে চাইছে না। তুই একটু ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্ দেখি। আমি যাই, আবার ওদিকের ব্যবস্থা কোরতে হবে ত। ওরা হয়ত এখুনি এসে পড়বে।

বিমলা চলিয়া গেলেন। বিনীতা মুখভার করিয়াই রহিল। তাহাকে বুঝাইবার কোন চেষ্টা করিতেই সুজয় সাহস পাইল না। সুধু অপলক-দৃষ্টিতে বিনীতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। এই তরুণীর মনের ব্যথাটী তাহার কাছে অতি সুস্পষ্ট। এই যে মাঝে মাঝে সাজিয়া গুজিয়া বলিদানের পশুর মত কাঁপিতে কাঁপিতে একদল তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুরুষের সামনে হাজির হওয়া; তাহার পর পরীক্ষার নাম করিয়া এক নির্ম্মম অত্যাচার; লেখাপড়া, গৃহকর্ম্ম, চিত্র, সঙ্গীত ও অঙ্গসৌষ্ঠব, সকল বিষয়েই পরীক্ষকেরা সবজান্তা, কাজেই অন্যায় প্রশ্ন ও অযথা মন্তব্য করিতে একটুও বাধে না;—এই অগ্নিপরীক্ষার পরেও যদি বার বার প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়—এমন একটী অপরিশোধনীয় অপরাধে যাহা তাহার স্বকৃতও নহে—তবে কোন্ তরুণী স্বীয় নারীত্বের এই দুঃসহ অপমান নির্ব্বিবাদে বহন করিতে পারে? আর এই পরীক্ষার পুনরভিনয়ের আতঙ্কে সে যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায়, কোন হৃদয়বান যুবক তাহার সমর্থন না করিয়া পারিয়া ওঠে! সুজয় চুপ করিয়া রহিল, বিনীতাও মুখ তুলিল না। দুজনার সুকঠিন নিস্তব্ধতায় গৃহমধ্যস্থ বায়ু অস্বাভাবিক ভারী হইয়া উঠিয়া তাহাদের নিঃশ্বাস রোধ করিতে লাগিল।

হঠাৎ খট্ খট্ করিয়া অচেনা ধরণে দরজার কড়া বাজিয়া উঠিল। সুজয় চঞ্চল হইয়া উঠিয়া অর্দ্ধজড়িতস্বরে বলিল—"ঐ বুঝি তাঁরা এসে পড়লেন।" তারপর স্পষ্ট করিয়াই বলিল—"আর দেরী করিস্নে, বিনু, উঠে পড়্ লক্ষীটি, ঠিক হয়ে নে, শীগ্গির।"

বিনু তাহার কালো চোখজোড়া মুহূর্ত্তকাল সুজয়ের মুখের পরে স্থাপিত করিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আলনা হইতে কাপড় ব্লাউজ নামাইয়া লইয়া ধীর পদবিক্ষেপে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

* * *

অতিথিদের বিদায় দিয়া ফিরিয়া আসিতেই বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—কি বল্লে ওরা?

সুজয় খুব গম্ভীর হইয়াই উত্তর দিল—যা বলে।

বিমলার মুখ আঁধার হইয়া গেল। এমন সময় বিনীতা বলিয়া উঠিল—আজ তুমি আমাকে কি বিপদেই ফেলেছিলে যাহোক। তোমার ওপর যা রাগ হচ্ছে আমার—

সুজয় বলিল—কেন? অপরাধ?

—ফ্রেঞ্চ পড়ি সে কথা তোলার কি দরকার ছিল?

—মিথ্যে বলেছি কি?

—কিন্তু ঠিক সত্যি কথাও বলনি। ডিক্স্নারী দেখে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দুচার লাইন পড়তে পারলেই বুঝি একটা ভাষা জানা হয়? যদি ওরা avoir কি etre-এর conjugation জিজ্ঞাসা কোরত?

—কোরে নিত? আর ওই রকম করেছিলাম বলেইত তোর কপাল খুলে গেল আজ। আর তোকে কষ্ট কোরে পড়ে একজামিন দিতে হবে না। ওরাই তোকে পাশ করিয়ে একেবারে ডিগ্রী দিয়ে দেবে।

বিমলা বিরক্তভাবে বলিলেন—তুই দিনকার দিন ভারি বদ্ হয়ে উঠ্ছিস্, সুজয়। এ কি-রকমের ঠাট্টা। সত্যি কথায় যখন ঠাট্টা করিস্, রাগ করি না, কিন্তু—

—তাহলে দিদি তোমার এখনও রাগ করা অন্যায়। আমি যা ঠাট্টা করছি, তা সব সত্যি। ওরা মেয়ে পছন্দ করেছে। কাল কি পরশু এসে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সব কথা পাকা কোরে যাবে।

কথাটা বিমলার পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত; অথচ সুজয় এখন যেভাবে কথাটা কহিল তাহাতে অবিশ্বাস করা যায় না। তাই স্তম্ভিত বিমলা কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসিলেন—ছেলের ত নিজেরই দেখ্তে আসার কথা ছিল, না?

—হ্যাঁ, বাঁ কোণের চেয়ারে যে বসেছিল, সে-ই ত তোমার জামাই, অর্থাৎ হবু-জামাই। দেখছিলে না নিজেই কি রকম প্রশ্ন করছিল।

—আমার এই কালো মেয়ে তবুও—

—তা হলে কি হবে! বাহিরে গিয়ে আমায় বলছিল—বিনুর আঁকা ছবিগুলো তার খুব ভালো লেগেছে। বিয়েটা তাহলে আমারই গুণে হচ্ছে বল্‌তে হবে।

—কি যে বকিস্ তার ঠিক নেই! হয়ত এত কিছু চেয়ে বসবে, আমাদের সামর্থ্যে কুলোবে না।

বিমলা সত্যই সে আশঙ্কা করিতে পারিতেন। সচরাচর ভাল পাত্র বলিতে যে গুণগুলি বুঝায় তাহার সবগুলিই অপ্রকাশের ছিল।

—কিন্তু ওদের ত কোন দাবী দাওয়া নেই; মেয়ের সঙ্গে চেলী আর রুলি ছাড়া আর কিছুই চায় না।

—তাই বলে গেছে নাকি? কিন্তু হঠাৎ এত দয়ার ত কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না আমি। কোন গলদ্ নেই ত? তাই তাড়াতাড়ি যাহোক কোরে বিয়েটা সেরে নিতে চায়?

সুজয় বলিল—এ রকম সন্দেহ করা তোমার ভারী অন্যায় দিদি। যে ছেলে শিক্ষার দাম বোঝে, সে যে বিনুকে আগ্রহ কোরে নিয়ে যেতে চাইবে, এতে ত আমি কিছুই আশ্চর্য্যি দেখতে পাই না।

বিমলা বলিলেন—কি জানি বাপু, চারহাত একঠাঁই হবার আগে কিছুতে বিশ্বাস নেই আমার।

সুজয় বলিল—"না থাকে নেই থাক।" তারপর বিনীতার দিকে ফিরিয়া কহিল—"ও কিরে, তুই অমন নিঝুম হয়ে বসে পড়লি কেন? বিয়ের কথা যে হাঁ কোরে গিলছিস দেখছি।···শোন্, শোন্, কাপড় ছাড়তে যেতে হবে না, চল্ বায়োস্কোপ দেখে আসি।"

—না।

—চল্ না, আজ যে Daddy Long Legs আছে; তোর Mary Pickford Judy-র role-এ।

—আর একদিন যাবো।

—আজ শেষ দিন।

—হোক্‌গে, ভালো লাগ্‌ছে না।

সুজয় একটু বিস্মিত হইল। এই মেয়েটীকে বায়োস্কোপের পোকা বলিলেই হয়; আর মেরি পিক্‌ফোর্ডের এমন ভক্ত আমেরিকাতেও আছে কিনা সন্দেহ। আজ সেই মেরি পিক্‌ফোর্ডের 'জুডি'র অভিনয় দেখিতে বিনীতার আগ্রহের অভাব দেখিয়া সুজয় খোঁচা দিয়া বলিল—ও বাবা, এযে দেখ্‌ছি গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। বিয়ে না হতেই এত বৈরাগ্য,

বিয়ে হয়ে গেলে দেখছি আর কাউকেই মনে থাক্‌বে না। কিন্তু এত অহঙ্কার ভালো না, হয়ত ভেঙেও যেতে পারে।

বিনীতা চীৎকার করিয়া বলিল—মা, তুমি কি আজ কালা হয়েছ? শুনতে পাচ্ছ না আমায় কি রকম জ্বালাতন করছে?

—সত্যিই ত সুজয়, কেন ওকে জ্বালাচ্ছিস্?

—কেন ও আজ আমার সঙ্গে যাবে না? ক'দিন পরে হয়ত আর দেখতে পাবেনা।

—কি পাগল ছেলেরে তুই! কালই ত আর বিয়ে হচ্ছে না। যখন ওর যেতে ইচ্ছে নেই, তখন না-হয় থাক্ না আজ।

—না; ও না যায়, আমি আজই যাবো। একলা যেতে কি আমি পারি না?

বিমলা জানিতেন একলা সিনেমায় গিয়া সুজয় কোন আনন্দই পাইবে না, অথচ প্রতিবাদ করিলে তাহার জেদ চড়িয়া যাইবে। তাই বুদ্ধি করিয়া কহিলেন—তোর ত আজ যাওয়া হবে না। উনি আফিস থেকে এসে সব খবর জানতে চাইবেন। তুই না থাকলে চলবে না ত!

সুজয় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—দিদি কি চালাক্। মেয়ে গেল না দেখে আমাকেও ধরে রাখার মতলব। মেয়ের ওপর এত টান।

বিমলা হাসিয়া উত্তর দিলেন—টান আমার দুটীর পরেই সমান। এই দুজনের কেহই জানিল না যে পাশের ঘরে বিনীতা লুটিয়া পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

(২)

এই সংসারটীকে আজ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই যে এমন একদিন ছিল যখন সুজয় ইহার কেহই ছিল না; আজ বুঝিবার জো নাই, জন্মাবধি এই আবহাওয়ায় সুজয় বাড়িয়া উঠে নাই, সে এখানে আসিয়াছে নবারোপিত কলমের চারার মত। সুজয় বিমলার সম্পর্কিত ভাই। আট-ন বছর বয়সের সময় তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাহারপর দশটী বৎসর তাহার পিতার শাসন-সুকঠিন স্নেহের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিতার মৌন গাম্ভীর্য্যের প্রভাবে সে মানুষ না হইয়া সুপরিচালিত কলের মতই হইয়া উঠিতেছিল। মায়ের লীলাচঞ্চল, হাস্যমুখর, স্নেহমধুর মূর্ত্তিটি সুজয়ের মাঝে মাঝে স্বপ্নের মত মনে পড়িত। কিন্তু পিতার গম্ভীর মুখ সে স্বপ্নকে দূরে সরাইয়া দিত। তাহার যৌবনসুলভ সামাজিকতা ও সরসতা এইরূপে ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু এই যে প্রাণপণ চোখে-চোখে-রাখা তাহাও ... হঠাৎ এক দিন সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হইয়া ঘণ্টা চার পাঁচ ... সুজয়ের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে ... পুত্রটীর যে কি গতি হইবে তাহার কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে ... না।

খবর পাইয়া আত্মীয়-স্বজনের অনেকেই আসিলেন। ... সমাধান সুজয়ের পিতা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ... বিব্রত করিতে লাগিল। সুজয়ের ভার যে কাহার উপর পড়ি... ভাবিয়া সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। এটা যে সকলেরই ... তাহা সকলেই বুঝিতেছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া এই কর্ত্তব্যের ভার ... ঘাড়ে তুলিয়া লওয়ার মত কর্ত্তব্যজ্ঞান কাহারও ছিল না। আর ... থাকিলে অনেক গুরুভার আপনা হইতে লঘু হইয়া আসে, ... পিতার সহিত সেই সমপ্রাণতা কোন আত্মীয়েরই ছিল না। কারণ ... প্রকৃতিগত অসামাজিকতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর অন্য আত্মীয়ের সহিত সম্প... মৌখিক ভদ্রতা ছাপাইয়া বাড়িয়া উঠিতে দেয় নাই।

সুজয়ের বাড়ীতে যখন ঘনঘন আত্মীয়-মহাসভার অধি... হইতেছিল, বিনীতার পিতা মহেন্দ্রনাথ তাহার সকলগুলিতেই উপ... থাকিতেন, কিন্তু কোন কথা কহিতেন না। তাঁহার স্বভাব ... সুপরিজ্ঞাত ছিল যে কেহ কোন অনুরোধও করে নাই। কারণ ... বলিয়া ইঁহারও বিশেষ বদনাম ছিল। লোকে বলিত, এই ... তিনি চেনেন কেবল দুটী জিনিস—বাহিরে আফিস ও ঘরে ... মহেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনকে ঘড়ির কাঁটার সহিত ছন্দ রাখিয়া চালাইতে... তাহার একতিল নড়চড় হইবার জো ছিল না। কতবার কতখানি ... খাইবেন, স্নানের সময় কত ঘটী জল মাথায় ঢালা হইবে, খাইতে ... ক'খানি রুটী খাইবেন, ও শুইতে গিয়া কি রকমে বালিশ বিছানা ... লইবেন—এ সমস্তই তাঁহার সুনির্দ্দিষ্ট। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে ... ছিলিম তামাক বাড়ীতে খাইবেন, তাহা স্বহস্তে কলিকায় সাজিয়া ... মাত্রা অনুসারে কাওয়াজী সৈন্যের মত সাজাইয়া রাখিতেন, এবং ... সময় কত নম্বর কলিকা লাগিবে ও তাহা পুড়াইতেও কতক্ষণ সময় লাগিবে ... এসব বিষয়েও তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়ম ছিল। আবশ্যকের অতিরিক্ত ... কথা কহিতে বা কোন কাজ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

যেদিন শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে প্রাথমিক কর্ত্তব্য শেষ হইয়া ... শুধু সুজয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই বৈঠক বসি... মহেন্দ্রনাথ সেদিন এক কথায় সকলকে স্তম্ভিত ও আশ্বস্ত করিয়া দিলেন।

১৩৩৮]

সমবেত আত্মীয়মণ্ডলীকে তিনি ধীরস্বরে জানাইলেন যে কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে ও সুজয় কোন অসুবিধা বোধ না করিলে, তিনি তাহার সমস্ত ভার আনন্দের সহিত নিজের হাতে তুলিয়া লইতে ইচ্ছুক। মহেন্দ্রনাথ অপুত্রক, সংসারে স্ত্রী ও কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই, কাজেই তাঁহার আশ্রয়ে সুজয় আশাতীত সুখে থাকিতে পারিবে এ বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ রহিল না। সুতরাং আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিপজ্জনক সমস্যার এই সুচারু সমাধানে আনন্দের আতিশয্যে তাঁহারা সুজয়ের মতামতের অপেক্ষা করিলেন না—পাছে সে অস্বীকার করিলে ঝুঁকিটা আবার তাঁহাদেরই ঘাড়ে ফিরিয়া আসে।

হেমন্তের এক অনাড়ম্বর ধূসর-ম্লান সন্ধ্যাবেলায় আজন্ম-পরিচিত গৃহ হইতে চিরবিদায় লইয়া শঙ্কাকম্পিতহৃদয়ে সুজয় তাহার দিদির গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বিমলার সহিত সুজয়ের ইতিপূর্ব্বে কোন ঘনিষ্ঠতার যোগ ছিল না। মা বাঁচিয়া থাকিতে কয়েকবার দেখিয়াছিল মাত্র। আর বিনীতাকে ত অপরিচিতা বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। মহেন্দ্রনাথ সুজয়কে আনিয়া দিয়াই বেশ নিশ্চিন্তমনে আফিস ও তামাক লইয়া জমিয়া গেলেন। এই ছেলেটীর সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বিমলার উপরেই পড়িল।

এই অপরিচিত পরিবেষ্টনের মধ্যে আসিয়া সুজয় নিজেকে অতিরিক্ত সংযত করিয়া তুলিল। কাহারও সহিত মিশিল না। এই গাম্ভীর্য্যের আবরণ হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিবার জন্য বিমলা অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃথা হইল। তাহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না। তিনি জানিতেন শোকের ক্ষত শুকাইয়া না গেলে কোন মানুষই সুস্থ ও সহজ হইতে পারে না। তিনি সময়ের প্রলেপের অপেক্ষায় রহিলেন।

এই ব্যবস্থা কিন্তু বিনীতার মোটেই মনঃপূত হইল না। চিরদিন নিঃসঙ্গভাবে বর্দ্ধিত সে হঠাৎ এই লোকটীর আগমন-সংবাদে একটী সঙ্গী লাভের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাসের সঙ্গিনীদের সকলেরই কেহ-না-কেহ কলেজে পড়ে, এইবার যখন তাহাদের সহিত ছাত্রজগতের আলোচনা হইবে, তখন যে তাহাকে উৎসুক শ্রোতাই থাকিতে হইবে না, সেও যে সেই আলোচনাতে যোগদান করিতে পারিবে, এই কল্পনা তাহাকে খুব মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু নবাগতের অটল গাম্ভীর্য্য ও বিচ্ছিন্ন সঙ্গবিমুখভাব তাহার উৎসাহকে নিবাইয়া দিল। চটিয়া মটিয়া সে স্থির করিল ওই লোকটীর সম্বন্ধে মোটেই কেয়ার করা হইবে না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে এই প্রিয়দর্শন যুবকের সামান্যটুকু গতিবিধিও অতি মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া পারিল না।

(৩)

বাহির হইতে বাড়ী ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুজয় ইত
করিতে লাগিল—বিমলা ও বিনীতা তাহার ঘরে। বিমলা ডাকিলেন,
"বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিতরে এসো।" ঘরে ঢুকিতেই
স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসিলেন—"তুমি ছবি আঁকতে পার?"

সুজয় লজ্জিতভাবে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক
আগে এক রাত্রে ইংরেজ কবির—

> And the long moonbeam, on the hard wet sand,
> Lay like a marble column half upreared—

লাইনটী পড়িয়াই তাহার সুপ্ত চিত্রাঙ্কন-বৃত্তি সাড়া দিয়া উঠে। সেই
মাথায় তৎক্ষণাৎ কাগজ, পেন্সিল, পিঁড়ি, রং ও তুলি খুঁজিয়া
করিয়া আঁকিতে বসিয়াছিল—দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা
সহিল না। তাহার পর হইতে প্রত্যহ রাত্রে সে ছবিটির উপর
করিত, কৌতূহল উদ্রেক করিবার ভয়ে দিনে আঁকিত না।

বিমলা আবার বলিলেন—বিন্নু বলছিল কাল রাত্রে উঠে তোমার
ঘরে অত রাত্রে আলো জ্বলছে দেখে সে উঁকি মেরে দেখেছিল যে তুমি
ছবি আঁকছ।

সুজয় কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিমলা
তখন সুজয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন—তুমি আমাদের এত পর ভাবো
কেন? কতদিন এখানে এসেছ, তবুও এত দূরে দূরে থাক।
তোমাকে আপনার কোরে নেবার জন্য আমাদের যে কত আগ্রহ তা বোধ হয়
তুমি বুঝতে পারছ। আর সম্পর্কে আমি তোমার দিদি বটে কিন্তু বয়সে
এত বড় যে সাধারণতঃ লোকের যে বয়সে ছেলে হয়, সে বয়সে হলে
তুমিও আমার ছেলে হতে পারতে। ভগবান আমায় পুত্রভাগ্য থেকে
বঞ্চিত করেছেন, তাই তোমাকে পেয়ে ভাবছিলাম হয়ত আমার সে অভাব
পূরণ হতে পারে।

সুজয়ের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, বলিল—আমি বুঝতে পারি
দিদি আমার এই ব্যবহারে আপনারা কষ্ট পান। একা থেকে থেকে
আমার এমন স্বভাব হয়ে গেছে যে কারো সঙ্গে মিশ্তে আমার সঙ্কোচ
হয়। এখন থেকে আমি চেষ্টা করব, দিদি, আপনাদের স্নেহের উপযুক্ত
হতে।

এমন সময় বিনীতা বলিয়া উঠিল—আমার খুব ইচ্ছে করে যে আমি
ছবি আঁক্তে শিখি।

বিমলা বলিলেন—শেখ্না কেন তোর মামার কাছে। স্কুলে ড্রয়িং ত তুই মন্দ পারতিস্ না।

বিনীতা বলিল—ড্রইং নয়, আমার পেন্টিং শিখ্তে ইচ্ছে।

সুজয় বলিল—পেন্টিং শেখার গোড়ার কথা হচ্ছে রুচি তৈরি করা। বড় বড় চিত্রকরের আঁকা ছবি দেখ্তে দেখ্তে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা ও রুচি গড়ে ওঠে। আমার কাছে ছবির এল্বাম্ আছে।

সেইদিন হইতে চিত্রচর্চ্চা আরম্ভ হইল। বিনীতা বুঝিল—ছবি দেখাটা শুধু ছবির উপর চোখ বুলাইয়া লইয়া বেশ হইয়াছে বা কিছু হয় নাই বলিলেই শেষ হয় না। ইহার প্রতিটী রেখা, ভঙ্গী ও বর্ণের বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। চিত্রশিল্পেও ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা-জ্ঞান না থাকিলে রসবোধ সম্পূর্ণ হয় না। তাই সে প্রাচীন ইজিপ্সীয়, আসিরীয় ও গ্রীক আর্ট হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ইম্প্রেশনিজ্ম্, একস্প্রেশনিজ্ম্ কিউবিজ্ম্, পৌয়াতিলিজ্ম্, ওপন্-এয়ার স্কুল প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়া উঠিল। চীন, জাপান, পারস্য ও ভারতের শিল্পও তাহাদের আলোচনা হইতে বাদ পড়িত না। দূরাদূরসংস্থান, ছায়ালোকসম্পাত, বর্ণস্তরবিন্যাস ইত্যাদি ব্যাবহারিক বিষয়েও তাহার জ্ঞানের প্রসার ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। ক্রমে রাফাএল্ ও মুরিলোর মাতৃমূর্ত্তি, টার্ণার ও রুইস্ডেলের স্বভাব-চিত্র, হলবাইন, রেনল্ড্স্ ও মুঘলদিগের মূর্ত্তি-চিত্র, য়ুরোপীয় জ্যঁর (Genre) পেন্টিং ও ভারতীয় রাজপুত শিল্প প্রভৃতির তুলনামূলক সমালোচনায় বিনীতা সুজয়ের সহিত তুমুল তর্ক বাধাইয়া দিত। এক অজ্ঞাত-সুন্দর বিশ্বের সুপরিচিত অধিবাসী হইয়া উঠাতে তাহার আনন্দের সীমা রহিল না। সুজয়ের অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিও এই সুযোগে শতধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। হাসির হাওয়ায়, ঝগড়ার ঝড়ে, মান-অভিমানের মেঘরৌদ্রখেলায় ইহারা বিমলার বৈচিত্র্যহীন সংসারকে বসন্তাগমে কোকিল-কাকলী-মুখরিত ধরণীর মত সজীব করিয়া তুলিল।

(৪)

সন্ধ্যার কিছু পরে অভ্যস্ত স্থানটীতে মাদুর বিছাইয়া বসিয়া মহেন্দ্রনাথ অভ্যস্তভাবেই তামাক টানিয়া যাইতেছিলেন। চাঁদের আলোয় রেলিঙের ছায়া ছাতের ধারে সুন্দর একটী পাড় বুনিয়া দিয়াছিল। হালকা হাওয়া আসিয়া বিনীতার ঝুলন্ত শাড়ীখানিতে মৃদু দোল দিয়া গেল। স্যাক্রার দোকানের ঠুক্ঠাক্, পাঠনিরত বালকের চীৎকার ও থিয়েটারের আখ্ড়ার

বাঁশীর শব্দ তাঁহার গড়গড়ার সুপ্রিয় আওয়াজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনোযোগ আকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। তিনি বসিয়া দেখিতেছিলেন, ঘনশ্বেত ধূমকুণ্ডলী তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইয়া গড়াইয়া পাক খাইতে খাইতে কেমন ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইতেছিল।

এমন সময় বিমলা আসিয়া বলিলেন—দেখেছ একবার ছেলেমেয়ে ছুটোর কাণ্ড।

—না।

—তা দেখবে কেন ? তুমি ত তাদের কোন দোষই দেখতে পাও না।

—তাদেরই আজ দেখতে পাচ্ছিনে ত তাদের দোষ দেখব কোথা থেকে ?

—আমিও ত সেই কথাই বলছি। তাদের দেখতে পাবে কি, তাঁরা বেরিয়েছেন সেই দুপুরবেলায়, এখনও উদ্দিশ নেই। কোথায় গেল তা-ও বলে গেল না। জিজ্ঞেস করলুম, বল্লে, এসে বলব। কি হাস্‌ছ, তোমার আদরেই ত এইসব হচ্ছে। সুজয় গেছে যাক সে ছেলে ! কিন্তু মেয়েটা যে এই ধিঙ্গি হয়ে উঠ্‌ছে, তার কি বিয়ে-টিয়ে দেবে না ?

—না, একেবারে বিয়ে দেব না এতবড় সাহস আমার নেই, তবে আরও কিছুদিন বিনু জীবনটাকে একটু উপভোগ কোরে নিক্।

সিঁড়িতে খটাখট্ ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ। বিনীতা ও সুজয় ছাতে আসিয়া হাজির হইল।

বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—কোথায় যাওয়া হয়েছিল সব ?

বিনীতা উত্তর দিল—আর্ট এক্‌জিবিসন দেখতে গিছলাম, মা।

—সেটা কি রাত নটা পর্য্যন্ত খোলা থাকে নাকি ?

সুজয় বলিল—তারপর তোমার মেয়ে বায়না ধরলেন, অচল ছবি দেখলুম, সচল ছবি দেখে তবে বাড়ী যাব।

—আহাহা, তাই বুঝি ? আমি ত বল্‌লুম, উট্‌রাম ঘাটে খানিকটা বেড়িয়ে চল বাড়ী যাই। তোমার ওই ডেম্প্‌সী-কারপাঁতিয়ে-র ঘুষোঘুষি দেখতে আমার ত ভারী বয়ে গিয়েছিল।

—বটে, তুই দেখছি আর্টিষ্ট হবার একদম অযোগ্য। ওরে, কারপাঁতিয়ে যদি সেকালের গ্রীসে জন্মাত, তবে লিসিপ্পাস কি প্রাক্‌সিটিলিস্ ওর মূর্ত্তি গড়তে পেলে নিজেকে কৃতার্থ মনে কোরত।

—ভাগ্যিস আনাতোল ফ্রাঁস কথাটা বলে ফেলেছিল, নইলে কি ওটা তোমার জোগাত ?

—কথাটা আমারই, যেহেতু ওটাকে আমি সত্যি বলে মানি। তবে কিনা আনাতোল ফ্রাঁস চুরি কোরে আগে বলে ফেলেছে, এই যা। ভাবছি ওর নামে একটা নালিশ ঠুকে দেব।

—কোথায় ? নখদন্তহীন লীগ্-অব-নেশন্‌স্-এর বেকার সুপ্রীম্ কাউন্সিলে নাকি ? যাক্‌গে, হঠাৎ একটা কথা মনে হচ্ছে, তোমায় জিজ্ঞাসা কোরে নিই। শিল্পীরা নগ্নমূর্ত্তি আঁক্‌তে এত ভালোবাসেন কেন ? আর ভালো যে বাসেন, আজকের ছবির মেলা ও ফ্রান্সের যে কোন সালোঁ তার প্রমাণ।

আর্টের বিচারে সুজয় সর্ব্বদাই তৈরি ; সে গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—তার কারণ মানুষের দেহটা তাঁদের চোখে এমনই সুন্দর যে কাপড় দিয়ে ঢেকে তার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতাকে ক্ষুণ্ণ কোরতে তাঁদের সৌন্দর্য্যবোধে ঘা লাগে।

—তোমার এই কথাটা যদি সত্যি হয় তবে নগ্নমূর্ত্তির মধ্যে বেশীর ভাগই নারী-দেহ হবার মানে কি ?

—মানে অনেক। প্রথমতঃ এই কথাটা আগে বলে নিই, আর্টে পুরুষ নগ্নমূর্ত্তিও বড় ফেল্‌না নয়। গ্রীক্ ভাস্কর্য্য, মাইকেল এঞ্জিলো ও রোদাঁর কথা মনে কোরে দেখ। কবিতায় হুইট্‌ম্যানের কথাও ভুললে চল্‌বে না। তবে নারীদেহ যে বেশী আঁকা হয়েছে, তার কারণ একদল বলেন, ওটা নাকি বিবর্ত্তন-ধারায় একধাপ এগিয়ে গেছে ; কোন কোন বিশেষ অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে সুন্দর। আমার কিন্তু মনে হয় চিত্রকরেরা পুরুষ এইটাই হচ্ছে আসল কারণ। নারীদেহের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক।

—তা হলে যাঁরা নারীশিল্পী আছেন, তাঁদেরও ত পুরুষের প্রতি ওই রকম একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। অথচ তাঁদের আঁকা একটাও নগ্নপুরুষমূর্ত্তি আমার চোখে পড়েনি।

—তার কারণ নারী এখনও কোনখানেই সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব এখনও অসঙ্কোচ সরলতা ও শিল্পীর নিরপেক্ষ দৃষ্টি লাভ করেনি। সেই দিনই নারীর অন্তরের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, যেদিন পুরুষের সম্বন্ধে তার মনোভাব লজ্জা-ভয়-দ্বিধা-লেশশূন্য হতে পারবে ; যেদিন সে প্রাণ খুলে বলতে পারবে, পুরুষের শক্তি, পুরুষের সৌন্দর্য্য তার ভাল লাগে।

বামুনঠাকুর ডাক দিল—দিদিমণি, খাবার দিয়েছি।

বিনীতা বলিল—ঠাকুর, মামাবাবুরও খাবার দাও।

সুজয় বলিল—সে কি, আমি এখন পড়তে বসব যে।

—না, এখন খাবে চল। আমার একলা খেতে ইচ্ছে করছে না।

দুজনে চলিয়া গেল।

বিমলা জিজ্ঞাসিলেন—চুপ কোরে রয়েছ যে? কি ভাবছ?

—ভাবছি, বিনুর একটা বিয়ে দিতে হবে।

—কেমন, কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে। আমি যখন আগে বলেছিলাম তখন ত গ্রাহ্য করনি।

—আমি ভেবেছিলাম, বিনুর আরো কিছু লেখাপড়া করা দরকার। কিন্তু দেখছি সুজয়ের সঙ্গে থেকে তার পুঁথিগত বিদ্যের চেয়ে বস্তুগত বিদ্যে ঢের বেশী হয়ে গেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর সবকিছুকে তলিয়ে বুঝবার এমন ক্ষমতা বিনুর হচ্ছে যাতে জীবনের সুখদুঃখ দুটোকেই ও সহজভাবে নিতে পারবে। সুজয়কে বোলো সে যেন বিনুর জন্যে একটী ভাল পাত্রের খোঁজ করে।

ঘরের ভিতর হইতে উচ্চহাসি ও বিনীতার গলার স্বর আসিয়া পৌঁছিল—মা দেখ, মামুবু 'কুমীর'কে 'জামাই' কোরতে পারছে না।

সুজয় উত্তর দিল—আমি 'জল'কে 'দুধ' কোরতে, কিম্বা 'আকাশ'কে 'পাতাল' কোরতে রাজী আছি, কিন্তু 'কুমীর'কে 'জামাই' কোরতে কিছুতেই রাজী নই। তুমি আছ দিদি?

বিনীতা বলিল—চালাকি রেখে দাও, পারছ না, তাই বল।

মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসিলেন—কি বলছে, বুঝতে পারছি না ত?

বিমলা বলিলেন—ও এক রকম খেলা,—কথা বদল করা—"সন্দেশ"-এ বেরিয়েছিল।

(৫)

বাংলা দেশে সাধারণতঃ মা ও মেয়ের মধ্যে সুস্থ, স্বচ্ছন্দ ও স্বস্তি-পূর্ণ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না। কথায় বলে, মেয়ে হলে জ্বালা, থাকলে জ্বালা, মরলে জ্বালা। বিমলাও মেয়ের মা হইয়া এই জ্বালার হাত এড়াইতে পারেন নাই। যতদিন মেয়ে বাপের আদরে ও খামখেয়ালিতে ধিঙ্গি হইয়া উঠিতেছিল, ততদিন মুখ ফুটিয়া বলিতে না পারিলেও মনে মনে শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন না। ক্রমে যখন মেয়েকে পাত্রের পর পাত্র আসিয়া উপেক্ষা করিয়া গেল, তখন তাঁহার অশান্তি কত বেশী হইয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া বলিবার দরকার করে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বরপক্ষ যখন অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সহিত বিবাহের সমস্ত

সম্বন্ধ পাকা করিয়া ফেলিল, তখনও তিনি সুস্থ বোধ করিতে পারেন নাই। অপ্রকাশ মিরাটে কাজ করে, তাহার ছুটী ফুরাইয়া আসিয়াছে, তাহার পূর্ব্বেই বিবাহ সারিয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিতে হইবে, সুতরাং বরপক্ষ মোটেই অপেক্ষা করিতে রাজী নহে। কিন্তু বিমলার মনে হইতেছিল তাহার এতদিনকার সযত্ন-পালিতা কন্যাটীকে কে যেন জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া যাইতেছে। অথচ এ আশঙ্কা সুজয় কি মহেন্দ্রনাথের কাছে খুলিয়া বলিবার জো নাই। তাহারা ত উহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে।

বিবাহের পরদিন আত্মীয়-কুটুম্বিনীরা দল বাঁধিয়া জটলা করিতে-ছিলেন। একজন বলিলেন—বিমলার আমাদের কপাল ভাল। বেশ জামাইটী পেয়েছে। ওই ত কালো মেয়ে।

দ্বিতীয়া একজন বলিলেন—যা বলেছ ভাই; আমিও এই কথাই ভাবছিলাম।

নবীনা একজন তৃতীয়া বলিয়া উঠিলেন—কেন বাপু, মেয়ের নিন্দে করছ। রংটাই না হয় একটু কালো, কিন্তু কেমন শিক্ষিতা?

প্রথমা বলিলেন—তোদের কথা শুনে গা জ্বলে যায়। শ্বশুর-বাড়ী কি আপিসঘর না হাইকোর্ট, যে লেখাপড়া নইলে চলে না। আমার নগেনের বৌ যদি কালো হত ত লোকের কাছে মুখ দেখাতেই পারতুম না।

দ্বিতীয়া বলিলেন—যা বলেছ ভাই।

তৃতীয়া বলিলেন—জামাইটী এদিকে মন্দ নয়। কিন্তু ভারী গোমড়া-মুখো। আমার ভয় হচ্ছে, একটা বেরসিকের হাতে পড়ে এমন মেয়েটা না মাটি হয়ে যায়।

প্রথমা বলিলেন—পুরুষমানুষ ত ওই রকম হওয়াই ভালো। আমার নগেন তার বোনেদের সঙ্গেও হেসে কথা কয় না। আজকাল কি সব ছেলে হচ্ছে বাপু, যত কথা, যত হাসি, সব মেয়েদের সঙ্গে। দেখ না ওই সুজয় ছোঁড়াটা, বিমলার সঙ্গে এমন ধারা কথা কয় যেন ও তার পেট-থেকে-পড়া ছেলে আর কি?

এমন সময় বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—সুজয়কে আমি পেটে জায়গা দিইনি বটে, কিন্তু ও আমার পেটের ছেলের মত।

প্রথমা শিহরিয়া বলিলেন—বলিস্ নি ও কথা, ও কথা মুখে আনতে নেই। ওতে পাপ হয়।

বিমলা বলিলেন—তাতে কি হয়েছে। ও যখন আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে, আমার তখন মনে হয়, কোন মা বোধহয় কোন

ছেলেকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসেনি। আগে আমার ছেলে নেই বলে দুঃখ হত, এখন মনে হয়, পেটের ছেলে ও-রকম না হলে একেবারে না হওয়াই ভালো।

সুজয় আসিয়া বলিল—দিদি, তুমি এখানে? তোমাকে অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি।

দলের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

বিমলা বলিলেন—কেন?

—বিনু আজ কোন স্যুট্‌টা পরবে তা কিছুতেই ঠিক কোরতে পারছি না—তুমি বল না ওকে কোনটায় বেশী মানাবে, মোভ্‌ রঙেরটা, না, এমিথিষ্ট রঙেরটা?

—সে তুই যা হয় করিস্‌ এখন, আমি এখন একটু জামাইয়ের কাছে যাই।

বিমলা ও সুজয় চলিয়া গেল।

নবীনা বলিলেন—যা-ই বল বাপু, বেশ ছেলেটী। বিমলা-দির সত্যিই কপাল ভালো।

প্রবীণা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওরে, যে দুধের আস্বাদ জানে না, তার কাছে ঘোলই মিষ্টি। আর দেখা যাবে, দেখা যাবে কতদিন এ রকম থাকে। এক গাছের ছাল কখনও আর একগাছে জোড়া লাগে! পর কখনও আপনার হয়?

দ্বিতীয়া বলিলেন—যা বলেছ ভাই।

ইহারা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে তাঁহারা সেই উৎসবে নিমন্ত্রিত—যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—পরকে আপনার করা, এক গাছের ছালকে আর এক গাছে জোড়া লাগানো।

* * * *

কি একটা কাজে সুজয় বাহিরে গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়াই শুনিল, বর-কন্যার যাইবার সময় হইয়াছে। আর দেরী করা চলে না।

উপরে গিয়া দেখিল, বিমলা যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। বিনীতাকে খুঁজিয়া কোথাও পাইল না। কিন্তু তাহার নিজের ঘরে ভেজান দরজা খুলিয়া দেখিল, বিনীতা একটা চেয়ারে গোঁজ হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছে।

সুজয়ের মনটা খারাপ হইয়া গেল। তবুও হাসিমুখ করিয়া কহিল—কাঁদ্‌ছিস কেন, ছি! আবার ত ক'দিন পরেই ফিরে আস্‌বি।

বিনীতার মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক কঠিন হইয়া উঠিল; সে তাহার চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে নত হইয়া

সুজয়কে প্রণাম করিয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন ফিরতে না হয়।

সুজয় কিছু না বুঝিতে পারিয়া বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল এমন সময় প্রথমা প্রবেশ করিয়া বলিলেন—বেশ বাপু, তোমরা দুটীতে এখনও গল্প করছ? এতকাল কথা ক'য়েও কথা ফুরোয়নি? ওদিকে যে শুভক্ষণ উতরে গেল, তার হুঁস আছে কি?

তিনি বিনীতাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

(৬)

প্রোফেসর ঘোষের লেকচার শেষ হইবার পরই সুজয় তাড়াতাড়ি ক্লাস হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পিছন হইতে শৈলেশ ডাকিয়া বলিল—এই সুজয়, চল্লি যে, এখনও আর একটা ক্লাস আছে।

সুজয় না ফিরিয়াই উত্তর দিল—থাকব না।

—তুই না থাক্‌লে আজ হকি ক্লাবের মিটিংএর কি গতি হবে?

—যে গতি তোরা করবি।

—তাহলে আমরা তোকে আর এবার কলেজ-টীমে নামাবো না।

—বেশ, দেখা যাবে, বলিয়া সুজয় চলিতে আরম্ভ করিল।

শৈলেশ আবার বলিল—এত যদি তাড়া ত আজ কলেজে এসেছিলি কি করতে?

—"ভুল হয়েছে! কালকে না হয় আস্‌ব না।" এই বলিয়া দৌড়িয়া গিয়া সে একখানা ছুটন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

কণ্ডাক্‌টার আসিয়া বলিল—বাবু, টিকিট।

সুজয় পয়সা বাহির করিতে করিতে বলিল—কালীঘাট।

—এটা হাইকোটের গাড়ী, এস্‌প্লানেডের নয়।

সুজয় অপ্রতিভ হইয়া নামিয়া পড়িল।

বাড়ী আসিয়া দেখিল, বিনীতা বিমলার সহিত হাত পা চোখ মুখ নাড়িয়া কথা কহিতেছে। ঘরে ঢুকিতেই বিনীতা তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

—কখন এলি?

—এই খানিকক্ষণ।

—ভাল ছিলি ত?

—হাঁ।

—শ্বশুরবাড়ী কেমন লাগ্‌লো ?

—মন্দ কি ?

—ও বাবা, এর মধ্যেই শ্বশুরবাড়ী ভালো লেগে গেছে। তাহলে তোর রাগ পড়ে গেছে বল ?

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন—রাগ আবার কবে হোল ?

—তা বুঝি জান না, দিদি। সে এক কাণ্ড। ওরা যেদিন যায় সেদিন যাওয়ার ঠিক আগেই দেখি বিনু আমার ঘরে বসে কাঁদ্‌ছে।

বিমলা বলিলেন—তা ত কাঁদবেই ; প্রথমবার আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে, আর কান্না আসবে না ?

—বেশ ত, তা না হয় হোল। কিন্তু আমি যখন সান্ত্বনা দিতে গেলুম—

বিনীতা বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—তখন আমার এমন রাগ হয়ে গেল। নিজেরা বেশ দল বেঁধে চেনা জায়গায় থাকবেন, আমায় যেতে হবে কোথায় এক অচেনা জায়গায় অচেনা লোকের মধ্যে। এই বলিয়া বিনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজয় বলিল—উঠ্‌লি যে ? যাচ্ছিস্‌ কোথায় ?

—আমার ঘরে। কথা কাটাকাটি কোরতে ভাল লাগছে না।

—বাঃ, আজ আমাদের হকি ক্লাবের মিটিং ছিল, তাই ফেলে আমি এলাম, আর তুই কি না—

—যাওনা তোমার মিটিং-এ। সময় ত এখনও বয়ে যায় নি।

বিমলা ভাবিলেন ইহারা আবার আগের মতই খুন্‌সুড়ি কাটা আরম্ভ করিয়াছে ; কিন্তু বিনীতার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাহাতে সুজয় ব্যথা পাইল। বাইক্‌ লইয়া সে বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে বিনীতা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল—মাম্‌বু কি সত্যিই চলে গেছে নাকি ?

বিমলা উত্তর দিলেন—তাই দেখছি।

এদিকে হকি ক্লাবে সুজয়কে দেখিয়া শৈলেশ বলিল—এই যে চাঁদ এসেছ। তখনই জানতুম, তুই আসবি। হকি যে তোর কাছে কাব্যের চেয়ে কম প্রিয় নয়, তা কি আর আমি জানিনে ?

সেইদিন সুজয়েরর মনে ব্যথা দিয়া অবধি বিনীতার স্বস্তি ছিল না। অথচ তখন ব্যথা না দিয়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। সুজয় যে বিষয়ের কথা তুলিয়াছিল, আমল দিলে কোন বিশ্রী অপ্রীতিকর আলোচনায় তাহার শেষ হইত ভাবিয়া বিনীতা শিহরিয়া উঠিল। সে আরো লক্ষ্য করিয়াছে সেইদিন হইতে সুজয় তাহাকে যেন এড়াইয়া

চলে। সুজয়ের মনের বেদনার এই পরিচয় পাইয়া তাহার নিজের বেদনা আরো ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ব্যাপারটাকে সহজ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য সে একদিন সুজয়ের ঘরে ঢুকিয়া যেন কিছুই হয় নাই এইরূপ হাল্কা সুরে জিজ্ঞাসিল—কি হচ্ছে ?

সুজয় ছবি আঁকিতেছিল—আনন্দ-চঞ্চল সমুদ্রের বিশাল বিস্তার আর একটি ছোট নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে।

সে মুখ না তুলিয়াই বলিল—কে বিনু, আয়।

—কি আঁক্‌ছ ওটা ?

—দেখ্‌তেই ত পাচ্ছিস্‌।

—Sea-scape আঁক্‌তে লেগে গেছ, অথচ তুমি ত কখনও সমুদ্র চোখে দেখ নি।

সুজয় মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল—কি করি, দায়ে প'ড়ে।

—তুমি কি আজ সোজা কোরে কথা কইবে না ?

—এটা Sea-scape নয়, বিবাহের উপহার।

—আবার হেঁয়ালি।

—বুদ্ধি থাকে এবার হেঁয়ালি ভেঙে নাও। আমাদের জলধির বিয়ে।

—ও ; মেয়ের নাম বুঝি তটিনী বা নির্ঝরিণী বা অমনি কিছু ?

—হ্যাঁ।

দুজনেই দুজনের মুখে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিনীতা বলিল—পরের বিয়ে দিয়ে কল্পনার খোরাক জোগানো কেন ? মাকে বল্‌ছি তোমার একটা কনে ঠিক কোরতে।

—তুই যে দেখছি এরই মধ্যে প্রজাপতি কোম্পানীর ক্যানভাসার হ'য়ে উঠেছিস্‌।

বিনীতা উত্তর দিল—তুমিও যদি কোরতে তাহলে তুমিও বল্‌তে তাই।

সুজয় বলিল—আমার বিয়ে-টিয়ে হচ্ছে না—

—আমার যখন হোল, তখন তোমারই বা হবে না কেন ?

—"কেন, তা দেখবি। এই দেখ্‌"—বলিয়া সুজয় এলবাম হইতে তেনিয়ে (Tenier-le-fils)-র অঙ্কিত হাইমেন-ছবিটি দেখাইয়া দিল। ছবিটির একটি বিশেষত্ব ছিল। শিল্পী বিবাহ-দেবতাকে এমন করিয়া আঁকিয়াছেন যে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় হাসি-হাসি, সুখ-বিহ্বল। কিন্তু কাছে আনিলে আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। সে মূর্ত্তি শোক-মলিন, বিষাদ-জর্জ্জর। এইটা দেখাইবার জন্যই ছবিখানি চিত্রশালিকায় একটী

মঞ্চের উপরে রাখা হয়, যাহাতে লোকে দূর হইতে একটি রূপ দেখিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিয়া অপর রূপটি দেখিতে পায়।

বিনীতা বলিল—কিন্তু এই চিত্রের চিত্রকরও বিয়ে করেছিলেন, আর ভুলে যাওনি বোধ হয় এই ছবি দেখানোতেই সেই বিয়ের সূত্রপাত।

সুজয় বলিল—এই ছবিটা দেখে চিন্‌তে পারে এমন মেয়ে বাংলা দেশে তুই ছাড়া কটা আছে জানিনে।

সেইদিন মিরাট হইতে বিনীতা পত্র পাইল। অপ্রকাশ লিখিয়াছে, তাহার বাসা সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা তাহাকে শীঘ্রই লইয়া আসে।

বিনীতা উত্তরে লিখিল—তাহারও তাই ইচ্ছা।

(৭)

চাকরীর বিচিত্র গতি। বছর দুই পরে বড় সাহেবের এক কলমের খোঁচায় অপ্রকাশ মিরাট হইতে কলিকাতায় বদলী হইয়া আসিল। বড় ভাই কলিকাতায় থাকিতেন, তাঁহারই সহিত একত্র বাসা করিল।

এত কাছে থাকিয়াও কিন্তু বিনীতার বাপের বাড়ী আসা হইত না। অপ্রকাশ বিশেষ অপছন্দ করিত। বিনীতাও কখন বিশেষ আগ্রহ জানায় নাই। বিমলা যে কন্যা-জামাতা-পরিশোভিত সংসারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা স্বপ্নই রহিয়া গেল বটে, কিন্তু নিজের বিবাহিত যৌবনে স্বামী-সাহচর্য্যের কথা মনে করিয়া, কন্যা স্বামীসোহাগিনী হইয়াছে ভাবিয়া, অদর্শনক্লেশ কোনমতে চাপিয়া রাখিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে স্বীয় গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া বিনীতা ছোট দেবরের ঘরটী পরিষ্কার করিতে যাইতেছে, এমন সময় শুনিল বড় জা তাঁহার বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছেন।

—তোদের মেজ-বৌ কোথা?

—ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

—দুপুর বেলায়? ছেলেপিলে হবে নাকি?

বড় জা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—ওর আর কোন কালে হয়েছে!

—কেন?

বড় জা খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া চাপা গলায় বলিলেন—আমাদের মেজবাবুর বাপ হবার ক্ষমতা নেই, অনেক চেষ্টা হয়েছিল, কিছুতেই সারানো গেল না।

বিনীতা আর দাঁড়াইতে না পারিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। একটা অন্ধকার রহস্য আজ তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া গেল। আজ সে বুঝিল কেন স্বামী তাহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইতেছেন, কেন আজ পর্য্যন্ত সে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে স্থান পায় নাই। ব্যাপারটা তাহার কাছে বিসদৃশ লাগিত, কিন্তু স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে মানিয়া লইবে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া কোনদিন কোন প্রতিবাদ করে নাই।

আহারান্তে ইচ্ছা করিয়াই বেশ খানিকটা দেরী করিয়া শয়নকক্ষে আসিয়া বিনীতা দেখিল অপ্রকাশ তখনও বই পড়িতেছে। দেখিতে ভালোমানুষটীর মত এই লোকটাকে দেখিয়া আজ তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। তথাপি কাছে আসিয়া ধীরস্বরে বলিল—আমি আর তোমার ও-সব নিয়ম-কানুন মান্‌ব না।

—হঠাৎ এ খেয়াল হ'ল কেন?

—কেন মান্‌ব? বিয়ে যখন হয়েছে, তখন তার সমস্ত অধিকার আমি পেতে চাই। প্রকৃতিকে বঞ্চিত কোরে ও-রকম সংযমের বাঁধনের কোন অর্থ নেই।

অপ্রকাশ খোঁচা-মারা ঠাট্টার সুরে বলিল—তা থাক্‌বে কেন? যে সংযমের উদ্দেশ্য জীবনে পশুত্বকে লোপ করা, মানুষকে ভগবান কোরে তোলা, তা তুমি বুঝবে কেন? সাধে কি কথা আছে—নারী নরকের দ্বার?

—দেখ, ভূতের মুখে রামনাম শোভা পায় না। যে চেষ্টা কোরেও অসংযমী হতে পারে না, তার আবার সংযমের দাম কি? তোমার মত পুরুষত্ব-বর্জ্জিত লোকের ও-সব কথা মুখে আনাই পাপ।

—কি? কে বলেছে তোকে?

—যেই বলুক, কথাটা যে সত্যি তোমার ওই চম্‌কে ওঠায়, ওই অভদ্র ভাষায় টের পাচ্ছি। তোমায় এখন জিজ্ঞাসা করি আমি, কেন তুমি জেনেশুনে আমায় বিয়ে কোরে এমন ঠকালে?

—বলতে লজ্জা করে না, একটা পয়সা না নিয়ে বিয়ে কোরে তোকে উদ্ধার কোরে দিয়েছি। মনে নেই, তার আগে কত লোকে লাথি মেরে চলে গেছে।

—আমায় তুমি বিয়ে করেছিলে কি আমায় উদ্ধার করার জন্যে, না আমার বন্ধ্যাত্ব প্রচার কোরে তোমার পুরুষত্বহীনতাকে চাপা দিয়ে লোক-সমাজে তোমার মান বজায় রাখবার জন্যে? আর আমার বিয়ে যদি না-ই হোত, ত ছবি এঁকে অনায়াসে আমার দিন কেটে যেত।

—জানি গো জানি, ছবি-অঁাকিয়ে মামার সঙ্গে ঘর কোরতে পেলে খুব ফুর্ত্তি হোত জানি। আহা কি সম্বন্ধ—মামাও বটে, ভাইও বটে, আর একটা হলেই ত্র্যহস্পর্শ সম্পূর্ণ হোত।

—উঃ, তুমি এত ছোটলোক। যার নাম কোরে এই বিশ্রী কথাগুলো বলতে তোমার একটুও বাধলনা, তার ভদ্রতার এককণাও যদি তুমি পেতে ত উদ্ধার হয়ে যেতে।

—"কে কাকে উদ্ধার করে দেখছি।" এই বলিয়া অপ্রকাশ উঠিয়া দাঁড়াইল। এত দিনের সযত্ন-রক্ষিত ধর্ম্মের মুখোষটা এইমাত্র খসিয়া পড়াতে তাহার কদাকার স্বরূপ অতি পাশবিকরূপেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। নিষ্পেষিত প্রবৃত্তির চাপা-আগুন চোখের লেলিহান দৃষ্টিতে জ্বলিয়া বাহির হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে বিনীতার পানে অগ্রসর হইল। বিনীতা ভয় পাইয়াছিল ছুটিয়া বাথরুমে গিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দিল।

অনেক রাত্রে পা টিপিয়া টিপিয়া সে ছাদের আলিসার উপর আসিয়া বসিল। সংকল্প—অপ্রকাশ সেখানে আসিলে নীচে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

সেইখানে বসিয়া বিনীতা ভাবিতেছিল—কি হইল, এ তাহার কি হইল? কি করিয়া সে এই নীচপ্রাণ ভণ্ড লম্পটের সহবাসিনী হইয়া সারা জীবন কাটাইবে। ভাগ্যবিধাতার উপর তাহার রাগ হইল। কিন্তু যাহার কোন রূপ নাই, যাহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, তাহার উপর রাগ টিঁকিয়া থাকিবে কেমন করিয়া? তাই তাহার সমস্ত রাগ কেন্দ্রীভূত হইল সুজয়ের উপর—যে তাহাকে নারী-জীবনের বিশাল আদর্শের সন্ধান দিয়াছিল, যে শিখাইয়াছিল মহত্ত্বকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ও নীচতাকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা করিতে।

(৮)

একতাড়া চাবির শব্দে চকিত হইয়া সুজয় চাহিয়া দেখে বিনীতা দাঁড়াইয়া। ত্রস্ত হইয়া বলিল—দিদি ত বাড়ী নেই।

এই কথা ক'টির আড়ালে যে একটী পর্ব্বত-প্রমাণ অভিমান ঢাকা রহিয়াছে বিনীতা তাহা বুঝিল। আরও বুঝিল, এটা তাহার ন্যায্য পাওনা। বাপের বাড়ী আসিয়া সে যে সুজয়ের সঙ্গকে যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিত, তাহা আর সকলকে ফাঁকি দিলেও সুজয়কে ঠকাইতে পারিবে না, ইহা সে জানিত।

বিনীতার এই চিত্ত-পরিবর্ত্তনে সুজয় ব্যথা পাইল বটে, কিন্তু সে-ও পিঠ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। বিনীতা আসিলে তাহার বাহিরের কাজ লক্ষগুণ বাড়িয়া যাইত।

আজ একলা বাড়ীতে বিনীতার এই হঠাৎ আবির্ভাবে সে এখন নিজেকে বিপদ্‌গ্রস্ত ভাবিতে লাগিল।

বিনীতা কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া সুজয়কে প্রণাম করিয়া সহজভাবে কহিল—ভালোই হয়েছে, আমি তোমার কাছে এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ, কথা আছে, অনেক।

—কথা, আমার সঙ্গে? সে ত অনেককাল হয়নি।

—"তাই ত আজ বলতে এসেছি।" এই বলিয়া বিনীতা টেবিলের উপর চড়িয়া বসিল। সুজয় চেয়ারে বসিয়াছিল।

দুজনেই চুপচাপ। তারপর সুজয় বলিল—কৈ, কি বল্‌বি, বল্।

—আমি তোমায় বলতে এসেছি যে তোমায় আমি খুব ভালো বাসতুম।

সুজয় হাসিয়া উঠিল—সরল, সবল, উচ্ছ্বসিত হাসি। বলিল—এই কথাটা এত ঘটা কোরে বলার কি দরকার?

—আছে। তোমাকে ভালবাসতুম আমি স্বামীর মত। স্বামীত্বের সমস্ত আদর্শটা তোমাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল।

সুজয়ের হাসি কোথায় উড়িয়া গেল। গম্ভীর তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছিঃ ও-কথা মুখে আনা—

—পাপ, কিন্তু যে-কথা মনের ভিতরকার চাপে ঠেলে মুখের কাছে আসে, তাকে আট্‌কাই কি দিয়ে? ভয় পেওনা তুমি, আমি তোমার সঙ্গে পালিয়ে বর্ম্মা মুলুকে যাবার ব্যবস্থা কোরতে আসিনি। আমি সুধু তোমায় এই কথাটা জিজ্ঞাসা কোরতে চাই, তোমায় যদি আমার ওইরকম কোরেই ভালো লেগে থাকে, সে দোষটা কি কেবল আমারই একলার? কেন তুমি ছেলেবেলা থেকে আমার কাছে পরিচিত ছিলে না? কেন তুমি হঠাৎ এলে আমার যৌবনোদ্‌গমের সেই অনন্ত-সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমি প্রথম পুরুষের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছি। কেন আমার চোখে পড়ল না এমন একটাও লোক যার চেয়ে তুমি রূপে গুণে কোন অংশে নিকৃষ্ট? আর যার হাতে তোমরা দেখে শুনে তুলে দিলে তোমার তুলনায় সে কেন এমন, সে কেন এমন·········

সুজয় তাহার জামাটা কাঁধে ফেলিয়া বাহির হইতে যাইতেছিল, বিনীতা দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাচ্ছ কোথায় তুমি? আরো

অনেক কথা তোমায় শুনতে হবে। তুমি জান, এসব কথাগুলো তোমার কানে যত খারাপ লাগছে, তোমার দিদির কানে তা লাগবে না। 'তোমার মত' জামাই' তিনি কামনা কোরতেন। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমায়, কেন মা তোমাকে ভাইএর চেয়ে ছেলে হিসেবেই বেশী দেখে ?

সুজয় আর সহ্য করিতে পারিল না। দাঁত চাপিয়া রুক্ষস্বরে কহিল—তুই এত নীচ, তোর মনে এত ময়লা যে তার কাদা দিয়ে তুই আমাদের সমস্ত সম্বন্ধকে ঘোলাটে করে দিচ্ছিস্। তোর সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। পথ ছাড়্।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিয়া বিনীতা দরজা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। মহেন্দ্রনাথ আসিয়া বলিলেন—কে বিন্তু, কখন এলি মা ?

—এই এখ্খুনি।

সুজয় বাহিরে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে একটা অস্পষ্ট গুম্‌রানির শব্দে জাগিয়া উঠিয়া সুজয় দেখিল, বিনীতা তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে। তাহাকে জাগিতে দেখিয়া বিনীতা সুজয়ের পা-ত্নখানি নিজের বুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মুখ গুঁজড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলই বলিতে লাগিল—জ্বলে গেলাম, আমি জ্বলে গেলাম।

ঘর অন্ধকার ; সুধু পথের গ্যাসের আলো সাম্‌নের বাড়ীর নতুন-রং-করা দেওয়ালে প্রতিফলিত হইয়া অন্ধকারের গায়ে সাদা তুলি বুলাইয়া দিয়াছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। তারি মাঝে বিনীতার এই অসঙ্কোচ আত্মনিবেদন—সুজয় সংযম হারাইল। বিনীতাকে সাদরে নিজের বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এই যদি তোর মনে ছিল, রাক্ষুসী, আগে বলিস্ নি কেন ?

বিনীতার মুখে এক অস্বাভাবিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি বৃথা-বিজয়ের হাসি। সুজয়ের সংযম-কঠিন হৃদয়কে সে যে তাহার প্রাণের উষ্ণ আবেগ দিয়া গলাইতে প্যারিয়াছে, এ হাসি সেই নিষ্ফল সার্থকতার হাসি। বিনীতা ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—কি লাভ হোত তাতে ?

উঠিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

—দেখ, তোমার সংযম যখন একবার ভেঙেছে, তখন তোমাকে আর বিশ্বাস নেই। তুমি আর এখানে থাকতে পাবে না।

—দিদির কি হবে

—"সে ভাবনা আমি ভাব্‌বো।" তারপর মিনতির সুরে কহিল, "আমার একটা মাত্র জুড়োবার জায়গা এই বাপের বাড়ী। এটাকে তুমি ঘুচিয়ো না।"

আবার চলিয়া যাইতেছিল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—তাই বলে আজ-কালই যেওনা যেন। যেও, আমি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে।

পরদিন অপ্রকাশের ছোট ভাই আসিয়া বিনীতাকে লইয়া গেল।

(৮)

ক'দিন পরে রাত্রে একদিন সুজয় নিজের ঘরে শুইতে যাইতেছিল, বিমলা ডাকিয়া কহিলেন—"শুনে যা ত এঘরে।" সুজয় ঘরে ঢুকিবার সময় মনে মনে বলিল—"তবে আজই, আচ্ছা তাই হোক্।" বিমলা বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোর হয়েছে কি ? ক'দিন ধ'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস্! বাড়ীতে মোটে তোকে দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না, বাইরে বাইরে থাকিস্! কেন ? কি জন্যে ?"

সুজয় বেশ হাসিতে হাসিতেই বলিল—ছাড়াছাড়ি ত হবেই একদিন, তাই এখন থেকে ওটার মহলা দিয়ে অভ্যাস কোরে রাখছি।

—আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোকে ঘরজামাই কোরে রাখ্‌তে পারে এমন শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান ত আমি আজও পাইনি।

—আর কতকাল তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌ব দিদি।

বিমলা চমকিয়া উঠিলেন। এ ত উপহাসের স্বর নয়, এ যে নিবিড় অনুভূতির স্বর, প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে।

—গলগ্রহ, তুই আমাদের গলগ্রহ, কে তোকে এ কথা বলেছে, ফের যদি তুই এমন কথা মুখে আনবি—

এইবার মহেন্দ্রনাথ কথা বলিলেন। এই মৃদুস্বভাব লোকটি সাধারণতঃ কোন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। কিন্তু যখন মুখ ফুটিয়া কথা বলা দরকার, তখন তাঁহাকে কখন মুখ বুঁজিয়া থাকিতেও দেখা যায় নাই। আর তাঁহার উক্তি সুস্থির চিন্তাশীলতার এমন একটা পরিচয় দিত যে প্রায়শঃই তাঁহাকে মানিয়া লওয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকিত না। তিনি বলিলেন—সুজয়কে যে আমরা গলগ্রহ মনে করি না, তা ওঁকে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তবুও যদি ও মনে করে এখানে থাকাটা ওর মঙ্গলের পক্ষে অন্তরায়, তবে আমার মতে ওকে জোর কোরে না আটকানই উচিত।

বিমলা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"চাইনে আমি তোমার ও-সব কথা শুন্‌তে। কি বোঝে ও ওর জীবনের ভালমন্দর কথা।" তারপর স্নুজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর সুজয়, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি কর স্নুজয়, আর কখনও ও সব কথা মনে আনবি না।"

স্নুজয়ের মনে বন্যার মাতামাতি আরম্ভ হইল। একে ত দিদির প্রতি তাহার আন্তরিক টান ছিল, তাহাতে তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের এই প্রবল উচ্ছ্বাসে তাহার চিত্তের দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে বিমলার পা ছুঁইয়া বলিল—তাই হবে, দিদি, তোমার কথাই রইল।

বিমলা বলিলেন—আজ থেকে তোকে আর একলা শুতে দেওয়া হবে না, তুই আমার কাছে শুবি।

স্নুজয় বলিল—না দিদি, তার কোন দরকার নেই। আমি বলছি আমার কথার কোন নড়চড় হবে না।

কিন্তু নিজের প্রায়ান্ধকার ঘরে প্রবেশ করিয়া স্নুজয়ের চিত্ত আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রের সমস্ত ঘটনা আবার তাহার চোখের সম্মুখে অভিনীত হইতে লাগিল—বিনীতার সেই আকুল ক্রন্দন, সেই অসংকোচ আত্মনিবেদন, সেই ক্রূর রহস্যময় হাসি, সেই অলঙ্ঘ্য আদেশ। একজোড়া কুঞ্চিত-ভ্রূ কালো চোখ তাহাকে তীব্র আক্রমণ করিতে লাগিল। যতই রাত্রি পোহাইয়া আসিতেছিল, একটা ব্যাকুল বাণীও যেন শব্দ সপ্তকের উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। তাহা বলিতেছিল—"তুমি যাও, আজই যাও, আজ নইলে তোমার আর যাওয়া হবে না।" ভোরের মুখে স্নুজয় আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। একটা কাগজে লিখিল—

দিদি,

ক্ষমা কোরো, আমি চল্লুম। দুঃখ কোরো না, পর কখনও আপনার হয় না। ইতি—

অকৃতজ্ঞ স্নুজয়

তারপর বিমলার ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। যখন ফিরিয়া চাহিল, দেখিল শীতপ্রভাতের ঘন কুজ্ঝটিকা তাহার পশ্চাতের অনন্ত বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

শ্রীস্বয়ম্ভূ চক্রবর্তী

কবিতাগুচ্ছ

এইটুকু ?

(শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের Credo নামক কবিতা পাঠান্তে)

মনের কথা মনের মতন ক'রে কইবে শুধু কান্নাহাসির ফাঁকে ?—
হায় রে! যখন পথের প্রতি বাঁকে স্নুদূর নিতুই ডাকে···ডাকে···ডাকে!
কবিরে কি শুধুই সমীপ চায় ? ছায়াপথও ডাকে না কি তারে ?
ঊর্দ্ধলোকের দুরভিসার-দাবী নয় কি তাহার জন্ম-অধিকারে ?
হৃদির অতল রত্নাকরের তলে মুক্তামাণিক জ্বল্‌ছে থরে থরে
মন-ডুবুরি ডুব দিয়ে না তুলি' রইবে ব'সে অলস বেলা-'পরে ?
পরিয়ে হিয়ার কুসুম প্রিয়ার চুলে সারা জীবন মিট্‌বে কি আশ তার ?
অভীপ্সা যা'র রচ্‌তে তারা-ফুলে প্রাণ-দিশারীর উজল স্তবহার ?

জন্ম-বেদুইন যে—গৃহছাড়া হয় নিয়ত উধাও মরু-পারে,—
পাথার তরি ধায় যে স্বপ্ন চোখে নিত্য নূতন ভুবন আবিষ্কারে,—
বিন্দুমাঝে সিন্ধুনূপুর শোনে যে-শ্রুতিধর প্রতি চরণপাতে,—
নন্দনেরি মন্দারে যে যাচে মর্ত্ত্য হিয়ার মালঞ্চে ফুটাতে,—
লঙ্ঘে গিরি, দলে আগুন, কাটে লক্ষ পিছুটানের উর্ণাজালে,—
বিদ্যুতেরি বহ্নিঝলকে যে অঙ্কিতে চায় তিলক মরভালে,—
যুগে যুগে অন্তরে যার ঘোষে ঃ অল্পে কোথাও নেইকো সার্থকতা,—
দুর্গমী-সে রইবে ধরি প্রিয়ার অ'াচল—কহি' আধ-আধ কথা।

বদ্ধ সীমায় শাপ সম যে গণে রূপের মাঝেও অরূপে যার রতি,—
ধ্রুবে যাহার বুক ওঠে না ভ'রে অধ্রুবেরেই নিত্য করে নতি,—
সগৌরবে যে-জন নটের ঢঙে মাখে না হীন অগৌরবের কালি,—
অশ্রু-নেশায় চায় না মায়া-রঙে, মিথ্যা অর্ঘ্যে সাজায় না তার ডালি,—
উদ্‌গাতা যে অলখ চিরন্তনের, মানুষ ব'লে নেইকো গরব যার,—
পদে পদে মানুষ সে—এই ছাপ জীবনে যার চরম তিরস্কার,—
যার দুরাশা-দর্পণে দেবতা দেবাতীতের ছায়া হেরি' ডরে,—
মনস্‌-পারের সেই ধ্যানী কি শুধুই কইবে কথা মনের মতন ক'রে ?

শিখর-হুরাশী

আলোদীপ্ত গিরিচূড়া ; চলে পান্থ সেই পথে ; আঁখি তা'র ধাঁধে সে-আভায়।
উর্দ্ধ-নিমন্ত্রণে তার হৃদে ক্ষুধা উঠে জাগি',—তবু লুব্ধ ফিরে ফিরে চায়
যেথা নিম্নে অদ্রিমূলে রাজে নব দূর্ব্বাশ্যাম প্রীতিস্বচ্ছ কান্ত মায়াধাম ;—
শৃঙ্খলের ঝঞ্চনাও বীণার নিক্কণসম শুনিত যেথায় অভিরাম।

নাহি সেথা গতিবেগ ? উত্তাল উচ্ছ্বাস নাহি ? নাহি সঙ্কটের অভিসারে
উদাত্ত আনন্দ ব্যথা ? আসে যায় কতটুক ? স্বস্তি-তরু ছায়া ত বিথারে।
নাহি সেথা যতিহীন নিরুদ্দেশ যাত্রা ? নাহি অকূলের বিপুল বাঁশরী ?
"কী বা যায় আসে ?"—ক্ষুব্ধ পথিক উত্তরে কহে মধ্যপথে আহ্বান পাসরি'।

"আহ্বান ?—কিসের ? কোথা ?" সুধায় সে থাকি থাকি,সত্য কি সে
শুনেছে তাহারে ?
ওই দীপ্যমান ছায়া শূন্য হিম-মৌলি ' পরে কভু কেহ বাঁচিতে কি পারে ?
তথাপি তারেই চাহে—যুক্তি মানা নাহি মানি' গহনেই পশিবে বিদ্রোহী ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ ডাকে···ডাকে···অধিত্যকা পিছে ফেলি' চলে চাতকের তৃষ্ণা বহি'।

পথে মেঘ ছায় তা'র হৃদাকাশ পলে পলে ভাবে থামি প্রতি সানুদেশে ;
ছায়া যদি পদে পদে আলোজয়ী,—তবে সে কি চলে আলেয়ার মোহে ভেসে ?
ঝঞ্চা-ভীত পক্ষ ছুটি গুটায়ে আশ্রয় মাগে সেই নীড়ে—বিদায়েছে যাহে,
হাসে সে-মমতাময়ী, গৃহাঙ্গনে সন্ধ্যা জ্বালি' ফিরে তারে বাহুপাশে চাহে।

কিন্তু—এ কী পরিহাস ! যারে হায় ! ফিরে চায় সেও যে আলেয়াসম তার—
সেই দিন হ'তে—যবে বাজিল শিখর-বাঁশি—"ওরে যাত্রী ! মোর কাছে আয়"
সে-বাঁশি না শুনে যবে—সংশয়ে ঘনায় ব্যথা, দৃষ্টি আবিলায় বারম্বার,
উর্দ্ধ-স্বয়ম্বরা আশা তবু চলে—উর্দ্ধদিঠি ; নিম্নে তৃষা মিটে না যে তার।

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কবি পরিচয়

মোর নদীতটে বটের ছায়ায় পায়ে-পায়ে-আঁকা সরণীতে
উতলা হাওয়ায় পাতা ঝ'রে যায়, গ্রাম-বধূ আসে জল নিতে ;
এই ঘাটে, কবি, এলে তরী বেয়ে
কান্না হাসির সারি-গান গেয়ে,
এই তব পরিচয় ;
এই বন-ফুলে তোমাতে আমাতে হলো মালা-বিনিময়।

আঙিনায় শ্যাম আঁচল বিছানু, সেথায় তোমার কাটে বেলা,
কত না মূর্ত্তি ভেঙেছো গড়েছো, করেছো নিভৃতে কত খেলা।
আমি জানি তব বাঁশরীর সুর
কত বিচিত্র কত পরিপূর
যাদু মাধুরীতে মাখা ;
জানি ছন্দের বলাকা তোমার মেলে অনন্তে পাখা।

আমার গঙ্গা মিলেছে তোমার ভাব-গঙ্গার জল-ধারে,
আমার যমুনা চিনিয়া নিয়াছে তব যৌবন-যমুনারে।
তব চিত্তের নৃত্যের তালে
দোলা লাগে মোর মাধুরীর ডালে,
কালবৈশাখী-গলে
তোমার সুরের বিছ্যুতে গাঁথা বজ্রমাণিক জ্বলে।

তোমার গানের প্লাবনে আমার শ্রাবণেরে করে দিশাহারা,
তব আনমনা বিরহ-বেদনা নীপবনে রচে স্বর-ধারা।
বাদল-বাতাসে মোর মেঘে মেঘে
তব মল্লার উঠে জেগে জেগে,
মুখর করিলে তুমি
ভরা বাদরের উৎসব-রাতে মোর অরণ্যভূমি।

মুগ্ধ চোখের পরশমাণিক মাধুরী লাগায় নীলাকাশে
সলিল-রিক্ত মেঘের কোণায়, শিশির-সিক্ত ঘাসে ঘাসে !
শিথিল শেফালি ক্ষণে ক্ষণে ঝরি
সাজিখানি মোর দেয় ভরি' ভরি' ;
তোমার ছন্দে ঢালা
মনের বাসনা বনের বাসনা কুড়ায়ে গেঁথেছি মালা।

আমার ধূসর ধূলার বাসর সন্ধ্যামালতী দেয় ছেয়ে,
তোমার গাঁথনী মিলন-মালায় ঠাঁই পাবে ব'লে রয় চেয়ে;
ঘুমহারা রাতে বৌকথাকও
যে-সুর জাগায়, তা'রে তুমি লও
স্বপ্ন ডালায় তব,
বিশ্বের চির-বিরহবাণীতে রচো তা'রে অভিনব।

মজিয়া আমার সহজিয়া সুরে চিরদিন ধরা দিলে মোরে,
জনমে জনমে আসিবে হৃদয়ে রাখিলাম সেই ঠাঁই ক'রে।
আশ্বিনে যেথা হঠাৎ হাওয়ায়
ছায়া-আলোকের তরণী বাওয়ায়
নবীন ধানের ক্ষেতে,
সেথায় শ্যামল কাঁপনে তোমার রাখিব আসন পেতে।

যেথা ঝলে তব যশের মুকুট, ভক্তেরা আসে ভিড় ক'রে,
মালা চন্দনে বন্দনা-গানে অঙ্গনতল যায় ভরে,
যেথায় তোমার উন্নত শির
উচ্চ আসনে অতি গম্ভীর—
সেথা মোরে নাহি পাবে,
আমি যুগে যুগে ডাকিব তোমায় ধূলার খেলার ভাবে॥

শ্রীনিশিকান্ত রায়চৌধুরী

বর্ষপঞ্চক

১

পঞ্চ বর্ষ গত হলো। আলোড়িয়া মরুপথধূলি
সহসা অদৃশ্য হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ বর্ষগুলি
দৃষ্টির দিগন্তপারে, অনিশ্চিত বেদনার মাঝে
সমাপ্ত পূরবী যেথা নির্ব্বিকার অনুনাদে বাজে
স্মৃতির গন্তব্যহরা অসংহত রিক্ত সন্ধিক্ষণে।
একদা যে-পঞ্চবর্ষ অমিতির নিশ্চিহ্ন অয়নে
ব্যূহবদ্ধ শরীরের ঘনঘোর ছায়াপাত করি
দীপ্র ভবিতব্যতারে রেখেছিলো সম্পূর্ণ আবরি
আমার নয়ন হতে; স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ব্যেপে
যে-মন্থর পঞ্চবর্ষ জগদ্দল প্রতি পদক্ষেপে
সুপ্রতিষ্ঠ শতাব্দীরে ক'রে যেতো হেলায় নিষ্পেষ,
সীমাশূন্য শূন্যতায় তারাও কি হলো নিরুদ্দেশ?
অবিচ্ছিন্ন অবিরাম অচঞ্চল তাদের প্রগতি,
আপাতনিশ্চলা যেন হিমনদী অন্তর্বেগবতী,
আচম্বিতে একদিন প্রলয়ের বিক্ষুব্ধ সম্পাতে
করে আত্মপ্রকটন। আজি নব বসন্তপ্রভাতে
চেয়ে দেখি অকস্মাৎ তাহাদের স্থবির প্রয়াণ
মোর স্তব্ধ যৌবনেরে দিয়ে গেছে বিনষ্টির দান,
ধ্বংসের কালিমাক্লিষ্ট নগ্ন নিঃস্ব বৈধব্য গোপন॥

ভেবেছিনু নাহি ত্বরা; তোদের সাদর সম্ভাষণ
শুনিলে চলিবে পরে। ভেবেছিনু তোরা বর্ত্তমান,
রক্ষণশীলের শত্রু জয়দৃপ্ত চির-আয়ুষ্মান,
নহিস ক্ষণের পান্থ; তোদের ও-অচল গৌরব
ফুরালে, পাতিবো সখ্য; এখন গতের পরাভব
উদ্ধত অসহযোগে নিতে হবে পরিশোধ ক'রে।
অতীতের ক্ষত দেহ ভাঙা বক্ষে তাই চেপে ধ'রে,
ফিরায়ে আনত পৃষ্ঠ বসেছিনু প্রস্তরের মতো
মুমূর্ষুর শুশ্রূষায়, নিয়েছিনু মৌনিতার ব্রত
অনম্র উপেক্ষা-ভরে। ভাবিনি যে, ভাবিনি সেদিন
লগ্ননিষ্ঠ গড্ডলিকা জিতশ্রম স্বচ্ছন্দবিহীন

গমনসর্ব্বস্ব তোরা ; অনন্তের পটে যেন অাঁকা
অসীমের আজ্ঞাবহ মুক্তপক্ষ উদ্বাস্ত বলাকা
তোরা ক্ষিতিনিরপেক্ষ। বুঝি নাই সেইদিন মনে
জীবনের মায়াপুরে নিরুদ্ধ স্ফটিক বাতায়নে
সবাষ্প রঙীন শ্বাস তোরাও যে ব্যাহত কালের,
নিমেষে বিলুপ্ত হবি ; অচুম্বিতা কুমারীগালের
সন্ত্রস্ত লজ্জার রাগ প্রথম প্রগল্‌ভ নিমন্ত্রণে,
তোরাও বিলীন হবি সম্ভোগের সার্থক লগনে
পাণ্ডু শ্লথ তর্পণের নিরুপায় নির্ব্বীর্য্য ধিক্কারে
অকস্মাৎ। নিষ্করুণ মধ্যাহ্নের প্রখর প্রহারে
তোদের সন্তাপশুভ্র হৃদয়ের মুকুরফলকে
যে-ইন্দ্রধনুর কান্তি বিচ্ছুরিত বিচিত্র ঝলকে,
কে জানিতো সেইদিন, হবে তার আশু পরিণাম
উন্মাদিনী বৈশাখীর প্রলয়দ নবঘনশ্যাম
তড়িৎতাড়িত মেঘে। কে জানিতো পাঁচটি বৎসর
কালগ্রাসী বিধাতার অলক্ষিত তুচ্ছ অবসর
প্রহরাপীড়িত আঁখি একবার পালটি লবার।
কে জানিতো সেইদিন, ভোগাসক্ত বিরহ আমার
বিলাসী অশ্রুর ধারা মুছিতে পাবেনা অবকাশ ;
করিতে নারিবে সাঙ্গ দীর্ণ দীর্ঘ একটি উচ্ছ্বাস
মুহূর্ত্তেক অবহেলি উর্দ্ধশ্বাস মিলন-উল্লোল ॥

২

আজি পুন প্রত্যাগত বসন্তের পুলকহিল্লোল
সগর্ব্বে প্রচার করে চেতনের মজ্জায় মজ্জায়
নব প্রতীক্ষার বার্ত্তা ; মাঙ্গলিক নূতন লজ্জায়
হোথা ওই শোকস্তব্ধ ভ্রান্তমতি উলঙ্গ বল্লরী
আস্বচ্ছ কপিশ বস্ত্র রিক্ত বক্ষে টানিছে শিহরি
আগন্তুক জ্যোতিষ্কের মুগ্ধ স্থির তপ্ত আঁখিপাতে ;
সংহতির চির-অরি যৌবনের দুর্ব্বার সঙ্ঘাতে
বিজড় প্রান্তর ওই অকস্মাৎ হয়েছে জাগ্রত
প্রাণের পরম স্পন্দে ; অভিশপ্তা অহল্যার মতো,
তরুণের পদস্পর্শে উজ্জীবিত শিলাস্তূপে আজি
অঙ্কুরিছে আচম্বিতে হর্ষোত্থিত নব রোমরাজি ;

কিছু না ভ্রূক্ষেপ ক'রে আত্মম্ভরী যুগের সারথি
অজ্ঞানগোচরগতি চ'লে গেছে যে-পথে সম্প্রতি
ঘর্ঘরিত রথচক্রে এঁকে দিয়ে গভীর লাঞ্ছন,
সে-পথের মর্ম্মক্ষত ফাল্গুনের লঘু বরিষণ
সস্নেহে দিয়েছে ধুয়ে। ভুলিবার এসেছে সময়।
প্রাচীন দৌর্ব্বল্য মোর কম্প লজ্জা ক্ষয় পরাজয়
হারায়ে আশ্রয়, যাক ঝরকে ঝরকে টুটে লুটে
সর্ব্বভুক্ রজনীর ব্যয়কুণ্ঠ রহস্যসম্পুটে,
বিস্মৃতির গুহাগর্ভে।

পশ্চিমের শ্মশান-অঙ্গনে

যে-চিতা নির্ব্বাণমুখ অনাঙ্গিক পঞ্চভূতসনে
মূর্ত্ত পঞ্চ বৎসরেরে একাকার করিয়া বিষাদে
স্তিমিত অরুণ তেজে এখনও জ্বলে ভস্মাচ্ছাদে,
সৃজনবেদনাস্ফীত পীত তার উর্ব্বর জরায়ু
আবার কি জন্ম দিবে ক্ষণস্থায়ী অথচ চিরায়ু
অক্ষয় ফিনিক্স্‌সম অভিনব বৎসরপঞ্চকে ?
তাহারাও আসিবে কি বিজয়ের শূন্য প্রপঞ্চকে
অর্গলিত দুর্গ মম অবরোধ করিতে আবার ?
সঙ্কীর্ণ আকাশ মোর উদ্ভাসি সদর্পে পুনর্ব্বার
তাহাদের বৈজয়ন্তী আস্ফালিবে বহুবর্ণচ্ছটা ?
আসিবে কি পুনর্ব্বার স্বার্থসিদ্ধি, কুহকী কুলটা,
মিসর সাম্রাজ্ঞীসম বিলাসের অপাঙ্গ ইঙ্গিতে
ভাঙিতে উদীর্ণ ব্রত ; তনিমার সলীল ভঙ্গীতে
আত্মদান-বিনিময়ে করিবে কি স্মিত অঙ্গীকার
সে-তপ্তকাঞ্চন দেহে নিমেষের মত্ত অধিকার ?
মনোজ্ঞ মৃত্যুরে পুন লয়ে তারা আসিবে কি সাথে
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যাম কান্তি, বাঁশের বাঁশরী বাঁকা হাতে
করুণ তরল হাসে নির্ব্বাণের নিঃশঙ্ক আশ্বাস ?
পথাশ্লিষ্ট-শূন্য-আঁখি, ক্ষিপ্র-পদ, সঘন-নিঃশ্বাস,
আসিবে দুরন্ত প্রেম, টঙ্কারিত কুসুম-কার্ম্মুকে
অলক্ষ্যসন্ধানী শর সংস্থাপিয়া চপল কৌতুকে
হানিতে নিখিলব্যাপী দুরারোগ্য দুর্ব্বিচার ক্ষত ?

৩

এ-জীষ্ণু সেনার পাছে, জানি জানি আজিকারি মতো,
ভ্রমিবে কবন্ধযূথ, অন্ধকার ত্রষ্ণু বিভীষিকা,
নৈর্ব্যক্তিক হাহাকার, ভ্রান্তিসার শূন্য মরীচিকা,
মড়ক কঙ্কালশেষ, বিকলাঙ্গ গতানুশোচনা,
অক্ষম ক্রোধের দাহ, নিষ্কারণ অতৃপ্তিযন্ত্রণা,
ক্ষুব্ধ আত্মধিক্কারের ধূমাঙ্কিত খিন্ন তুষানল।
পলক ফেলার আগে এ-নবীন বিজেতার দল
পঞ্চ বৎসরের শেষে বিনাবাক্যে হবে অন্তর্দ্ধান
আসন্ন আঁধারে পুন। দুর্নিবার তাদের প্রয়াণ
সময়ে হবেনা লক্ষ্য। সেদিনেও অশ্রুনত চোখে
অচপল ব'সে রবো, অবলুপ্ত অতীতের শোকে
উপেক্ষিয়া স্থূলগন। তার পরে কেটে গেলে বেলা,
হঠাৎ পড়িবে মনে, করিয়াছি পুন অবহেলা
দ্বারাগত অতিথিরে। আরবার শিরে কর হানি,
অসম্পূর্ণ অভ্যর্থনা, অসমাপ্ত পরিচয়খানি
বেদনাবিলাসী বক্ষে বর্ম্মসম ধরিবো গৌরবে।
পুন মোর বন্ধ দ্বারে বসন্তের বৈতালিক যবে
উচ্চারিবে আবাহনী, নিবৃত্তির আত্মপরসাদে
রুদ্ধ ক'রে রবো শ্রুতি। সেদিনেও অন্ধ পরমাদে
ব্যর্থতারে শ্রেষ্ঠ ব'লে মনে মনে করিবো নিশ্চয় ;
ভাবালু সঙ্গীতে পুন পরাস্তের দুর্জ্জেয় বিজয়
চাহিবো ঘোষিতে মর্ত্ত্যে ; স্বেচ্ছাপঙ্গু ঘৃণ্য নিরাশারে
অসঙ্কোচে দিবো নতি ; নিশ্চেষ্ট বাচাল অহঙ্কারে
কৃতীর পবিত্রাসনে করিবো ক্লীবের অভিষেক ;
রত্নগর্ভা-প্রতি হানি বিষতিক্ত বিদ্রূপ শতেক
ভাবিবো মহৎ বুঝি নিরিন্দ্রিয় বন্ধ্যার সংযম ;
ভবিষ্যের মৈত্রীবাহী অধুনা-দূতের সমাগম
হেলায় নিষ্ফল ক'রে, সহ্যশীল অদৃষ্টের পরে
অর্পিবো সমস্ত দোষ, রুদ্র যবে রুষ্ট মূর্ত্তি ধ'রে
হানিবে নিষ্ঠুর বজ্র।
এই ভাবে কেটে যাবে কাল।
জরান্ধ নির্ণয়হারা নিয়তির বাহুর আড়াল,

নির্ব্বল নির্ভরশীল নিরুপায় দুলালের মতো,
আমারে বেষ্টন করি দূরে দূরে রাখিবে নিয়ত,
পতন ও অভ্যুদয়ে যেই পন্থা হয়েছে বন্ধুর,
সে-পথের প্রান্ত হতে। গৃহকোণে ব্যর্থশ্রমাতুর,
ক্ষতির সহিত ক্ষতি, অপচয়-সনে অপচয়
যোগ দিতে দিতে মোর সুদীর্ঘ জীবন হবে ব্যয়
অখ্যাতির অবচ্ছায়ে। ঘটিবেনা কোনোখানে ত্রুটি।
বিদ্রোহের ঝঞ্ঝাবাতে বিজ্ঞতার সতর্ক দেউটি
হবেনা নির্ব্বাণ কভু নপুংশের নির্ব্বিঘ্ন ভবনে।
যে-অতীত চুপে চুপে আয়ুটুকু কাটায়ে ভুবনে
অকীর্ত্তির অন্তরালে অবশেষে লভিছে বিশ্রাম,
নগণ্য দুষ্কৃতি যার অবজ্ঞেয় নশ্বর দুর্নাম
ঐতিহ্যের স্মৃতিস্তম্ভে কোনো কালে নাহি হবে লেখা
গভীর অক্ষরে, তারি নিভৃত পদের ভৃগুরেখা
শুধু মোর হৃদয়ের ক্রমশুষ্ক ফলকে গোপন
হয়ে রবে সদা পূজ্য, হয়ে রবে চির চিরন্তন ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অনুবাদ

[শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায় শেলির 'One word is too often profaned' শীর্ষক কবিতার অনুবাদ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে সংশোধনের জন্ম পাঠান। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও পত্র প্রেরণ করেন তাহা মূল অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ

একটি কথা লোকে এত করে কলুষিত,
অমি তাহা করিব না আর ;
একটি অনুভূতি এত বৃথাই হেলিত,
তারে হেলা অযোগ্য তোমার ;
একটি আশা নিরাশার এ-হেন আত্মীয়,
বিবেচনা রোধে না ক তায় ;
তব অনুকম্পা মোর তারো চেয়ে প্রিয়,
প্রেম যদি দেয় অপরায়।

লোকে যারে প্রেম বলে নাহি দিব আমি ;
করিবেনা তুমি কি গ্রহণ
হৃদয়ের যে-অর্চ্চনা উর্দ্ধলোকগামী,
দেবতাও করেনা বর্জ্জন ;
দূর তারকার লাগি পতঙ্গের তৃষা,
উষা লাগি নিশার কামনা,
বেদনিত বিশ্ব হতে বহু দূরে মিশা
যে-মাধুরী তার আরাধনা ?

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও কবিতা

.........রেলগাড়িতে বসে নাড়া খেতে খেতে শেলির সেই তর্জ্জমাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করচি। তুমি যে লাইন কটি দিয়েছিলে তার উপর ভূমিকম্প হয়ে গেল—তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু তার ছন্দটির বহর খাটো বলে তার মধ্যে পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া গেল না। মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা

অনুরূপ হয়েচে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সে জন্যে আমি বা বাংলা ভাষাই যে একমাত্র দায়ী তা মান্‌তে পারিনে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেক জনের কেদারার হাতার উপরে বসেচে। —সময় আয়ত্তে নেই অতএব ইতি জুলাই ২০ (?) ১৯৩১।

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা,
তাহারে লঘু করিবনাকো আর।
দিনে দিনেই সয়েছে হেলা একটি মনোব্যথা,
অবমাননা কোরোনা তুমি তার।
একটি আশা নৈরাশেরি নিকট আত্মীয়,
তারেও দলি' করিবে খান্ খান্ ?
তোমার অনুকম্পাটুকু যেমন মোর প্রিয়
তেমন নহে আর কাহারো দান ॥

প্রেমের নামে লোকে যা দেয় দিব না তাহা আমি,
লবে না কিগো আমার নিবেদন—
নিম্ন হতে যে-অর্চ্চনা উর্দ্ধলোকগামী—
দেবতা যারে করেনা বর্জ্জন ;
তারার লাগি পতঙ্গ যে-আশায় মরে ঘুরে,
উষার লাগি নিশার যে-সাধনা—
পীড়িত এই মর্ত্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
তাহারি লাগি যে-পূজা আরাধনা ?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রির প্রতি

(শেলি হইতে)

১

অস্ত-সাগর পার হ'য়ে এস চপলপায়,
হে নিশীথিনী !
পূর্ব্ব-অচলে গুহা তব ঢাকা কুহেলিকায় ;
দীর্ঘ দিবস নির্জ্জনে সেথা, হে মায়াবিনী,
বুনিলে কি শুধু হর্ষ-ভীতির স্বপন-জাল ?
প্রিয় তুমি তাই, তাই তব রূপ এত করাল,
চল-চারিণী !

২

তারকা-দীপ্ত অম্বরে দেহ দিয়োগো ঢাকি,
মসী-বরণা !
ঘন কুন্তলে অন্ধ করিয়া দিনের আঁখি,
চুম্বনে তারে করিয়ো বিবশ, হত-চেতনা ;
যেয়ো তারপর ভূধর সাগর নগরী বন,
ঘুম-পাড়ানিয়া কাঠি দিয়ে ছুঁয়ে সারা ভুবন,
চির-কামনা !

৩

উষার আলোকে না দেখি' তোমারে, দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর,
রবিকরাঘাতে টুটিল ধরার শিশির-বাস,
ফুলে পল্লবে মধ্যদিনের ঘনালো ঘোর,
ম্লান হোলো ক্রমে ক্লান্ত রবির প্রখর ভাস,
তবু কই, হায়, দিন না ফুরায় ! দীর্ঘশ্বাস
বহিল মোর।

৪

তব সহোদর মরণ আসিয়া কহিল ডাকি',
"চাহ আমায় ?"
শয়ন-শিয়রে আসিল সুপ্তি ধূসর-আঁখি,
তোমারি দুলালী, মধ্যদিনের মধুপ-প্রায়,
মৃদু গুঞ্জনে প্রশ্ন করিল, "চাহ কি মোরে ?"
"তোমার পাশে কি হবে মোর ঠাঁই ?" কহিনু, "তোরে
চাইনা, হায় !"

৫

আসিবে মৃত্যু চিরতরে তুমি যাবে যখনি,
তড়িৎ-গতি ;
আসিবে সুপ্তি তুমি পলাতকা হ'লে, রজনী।
তাদের কারেও জানাবনা কভু মোর মিনতি !
শুধু তোমারেই করি নিবেদন বাসনা মম,
এস ত্বরা করি', এস মোর কাছে হে প্রিয়তম,
তূর্ণগতি।

বিস্মৃতি

(এ-ই হইতে)

তিমির-গহন শূন্যে মিলালো শৈল-শ্রেণী,
অন্ধ যামিনী দিশাহারা,—তার নাই যে আঁখি
আমারো নয়নে আঁধারের ঘোর ! কালের মসী
ঘন কালিমায় যুগ-যুগান্ত দিয়েছে ঢাকি'।

কে জানে কি ছিল সে-সব যুগের তিমির-মাঝে ?
সে কোন্ মাধুরী ? কোন্ সে কামনা দুর্নিবার ?
এই জানি শুধু, সমাধি তাদের ঐ সুদূর
বেদনা-বহ্নি-দীপ্ত অস্ত-সাগর পার ॥

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

কলহ

(একটী অজ্ঞাত ইংরেজ কবির ছায়াবলম্বনে)

আধো-ফোটা কুঁড়ি আর একগাছি
ফোটা গোলাপের হার,
প্রেমিক প্রেমিকা করে কোলাহল
কোন্‌টি হইবে কার।
হাসিল প্রেমিক, রাঙিল প্রেমিকা,
কথা হল শত-বার ;
স্থির নাহি হয় কে লবে কুঁড়িটি,
কে লইবে ফুলহার।
অধরে অধরে হইল সন্ধি,
মিটিল কলহ তবে—
গোলাপের হার পাইবে প্রেমিক,
প্রেমিকা কুঁড়িটি লবে।
ধীরে ধীরে হল সুখনিশি ভোর
সুনিবিড় বাহুপাশে।
গোলাপের মালা ঝরেছে কখন,
ফুল হয়ে কুঁড়ি হাসে॥

অশেষ

(শেলি হইতে)

কথা সুমধুর থেমে যায় যবে
সুর কেঁপে ফিরে মনে,
বকুলের মালা শুকালে গন্ধ
শিহরে মরমকোণে ;
গোলাপ মরিলে গোলাপেরি পাতে
বাসর সাজান হবে,
দয়িত পলালে, তারি স্মৃতি পরে
প্রণয় ঘুমায়ে রবে॥

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ

উত্তুঙ্গ

(বোদলেয়র হইতে)

অতিক্রমি' হ্রদহ্রদি, অধিত্যকা, কান্তার, কানন,
দুস্তর কন্দর, গিরি, নদ, নদী, জলধি, জলদ,
উত্তীর্ণ হইয়া রবিশশীকক্ষ, দূর জ্যোতিষ্পথ,
তারাস্তৃত অগণন মণ্ডলেরে করিয়া লঙ্ঘন,

ধাও প্রাণ চির-অভিসারী ! বেগে তরঙ্গে তরঙ্গে—
চলোর্ম্মি-বিহারী যথা ধায় স্রোতে পুলকমূর্চ্ছিত ;
সীমাহারা শূন্যতার বক্ষ চিরি' ধাও উল্লসিত
অবর্ণ্য পৌরুষ-দর্পে—উর্দ্ধায়িত বিলাস-বিভঙ্গে

হইতে বিধৌতগ্লানি শুভ্রতর সমীরণধারে—,
বসুধার বিষবাষ্পে আজি প্রাণ ! দাও হে বিদায় ;
যেই উদ্ভাসিত হুতাশন স্বচ্ছ ব্যোমব্যাপ্তি ছায়
পূত দিব্য সুধাসম—কর পান সে দীপ্ত আসারে।

অতৃপ্তির অন্তরালে, লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণামলিন,
ভারাক্রান্ত মুহ্যমান মেঘাচ্ছন্ন জীবনের পারে
শান্তোজ্জ্বল সৌম্যলোক ভায় ; সুখী সেই যে বিস্তারে
তেজস্বান্ প্রাণপক্ষ সে-নির্জ্জর লোকে অনুদিন।

সুখী সেই—মুক্ত বিহঙ্গমসম লক্ষ্যি নীলাম্বর
নির্ব্বারিত চিন্তা যার ধায় নিত্য উষসীসঙ্গমে,
সঞ্চরি' জীবন-উর্দ্ধে—শুনে নিত্য সহজ মরমে
কুসুমের মূকভাষা, নিখিলের গূঢ় মৌন স্বর॥

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পুস্তক-পরিচয়

“লঘু-গুরু”—প্রণেতা শ্রীজগদীশ গুপ্ত, প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়, নাথ ব্রাদার্স, ২৩-সি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, পৃষ্ঠা ১৫৬, দেড় টাকা।

যে-বই পড়ার জবাবদীহি আছে সে-বই পড়তে সহজে রাজি হইনে। আমার বয়সে কর্ত্তব্যের চেয়ে অবকাশের মূল্য অনেক বেশি। বিশেষত যে-কর্ত্তব্য আমার অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে।

তবু লেখকের অনুরোধ রক্ষা করেচি, তাঁর “লঘু-গুরু” বইখানি পড়ে দেখেচি। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে এ কথা পূর্ব্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েচি।

লেখবার ক্ষমতা আছে বললে বোঝায়, লেখক যেটা লেখেন সেটাকে পাঠ্য করে তুল্‌তে পারেন, সেটা পথ্য না হলেও। সাহিত্য-সম্পর্কে পথ্য কথাটা বলতে এ বোঝায় না যে, জ্ঞানের দিক থেকে সেটা পুষ্টিকর, বা নীতির দিক থেকে সেটা স্বাস্থ্যজনক। যেটাকে মন সম্পূর্ণ সায় দিয়ে গ্রহণ করতে পারে সেটাই পথ্য। মন যেটাকে বিশ্বাস করতে পারে সেটাকেই গ্রহণ করে। এস্থলে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল্‌লে তো কোনো কথাই নেই, নইলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দরকার। সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে কিন্তু তাতে সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই ব'লে হলফ করে, আমার কথা যতই মিথ্যা হোক্ তবু সেটা সত্য।

লঘু-গুরু গল্প-সম্বন্ধে যদি জজিয়তী করতেই হয় তাহলে গোড়াতেই আমাকে কবুল করতে হবে যে, এই উপন্যাসে যে-লোকযাত্রার বর্ণনা আছে আমি একেবারে তার কিছু জানিনে। সেটা যদি আমারই ত্রুটি হয় তবু আমি নাচার। বলে রাখি এ-দেশে লোকালয়ের যে-চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল কাটালুম এই উপন্যাসের অবলম্বিত সমাজ তার পক্ষে সাত সমুদ্র পারের বিদেশ বল্‌লেই হয়, দূর থেকেও আমার চোখে পড়ে না। লেখক নিজেও হয়তো বা অনতিপরিচিতের সন্ধানে রাস্তা ছেড়ে কাঁটাবন পেরিয়ে ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেচেন।

আমার এই সন্দেহের কারণ হচ্চে এই যে, লেখক আমাদের কাছে তাঁর রচনা দাখিল করেচেন কিন্তু তার যথেষ্ট সমর্থনের জোগাড় করতে পারেননি। যেটা দেখাতে চেয়েচেন, তিনি নিজে তার সবটাই যে দেখেচেন এমন লক্ষণ অন্তত লেখা থেকে পাওয়া যাচ্চে না।

গল্পের প্রথম নায়ক বিশ্বম্ভর তার ভগিনীপতি লালমোহনকে নিয়ে দেখা দিল। তারা লেখকের কাছ থেকে কোনো একটা বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র নিয়ে আসে নি। তাই ধরে থাক, গোড়া থেকে ঠিক করে নিলুম আমাদের দেশে সচরাচর যাদের ভদ্রলোক ব'লে থাকে, দেখা হলেই যাদের ব'লে থাকি, এই যে মশায়, ভালো আছেন তো, এও তাদেরই একজন। অতএব চৌকিটা এগিয়ে দেবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করবার দরকার নেই।

আরো খানিকটা গিয়ে যে পরিচয়টুকু পেলুম তাতে জানা গেল, মদের আসরের উপকরণ জোগাতে আলস্য করেছিল ব'লে বিশ্বম্ভর তাড়া করাতে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী পড়ে গিয়ে সাংঘাতিক আঘাতে মারা যায়। যাদের আমরা চৌকি এগিয়ে দিই তাদের মধ্যে কেউ কেউ এর চেয়ে গুরুতর অপরাধ করেচে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অতএব বিশ্বম্ভরকে ভদ্দর শ্রেণীর লোক ব'লে মেনে নিতে এখনো সন্দেহের কারণ ঘটল না।

তারপরে হঠাৎ শুনি বিশ্বম্ভর খেয়া পার হবার সময় “উত্তম” নামধারিনী এক বেশ্যাকে দেখে মুগ্ধ হোলো। এটাও ভদ্দর লোকের লক্ষণে বাধে না। কিন্তু বেশ্যাকে যখন নিজের শিশু মেয়ের বিমাতা পরিচয় দিয়ে ঘরে তুলে নিলে এবং পাড়ার মেয়েরা প্রথমটা ছি ছি করেও অবশেষে একদিন সয়ে গেল তখন মনে ভাবনা এল এই যে, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ অপরাধ ভদ্দরলোকের পক্ষে মার্জ্জনীয় বটে তবু বেশ্যাবিবাহের মতো সমাজবিরুদ্ধ অপরাধ তো তেমন চুপেচাপে সমাজে পার হয় না। তখন মনে হোলো, যে, নায়কের যে-পরিচয়ে এটা সম্ভব মনে হতে পারত গল্পের গোড়া থেকেই সেই বিশেষ পরিচয়টা সাজিয়ে রাখা উচিত ছিল। সেটা না হওয়াতে মানুষটার প্রতি নেহাৎ অবিচার করা হয়েচে। হয় তো অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে লোকটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-যোগ্য—তবু আমরা যে ওকে কিছুমাত্র সন্দেহ করতে পারলুম বিশ্বম্ভরের দোহাই মেনে সেই তার প্রতি সন্দেহের সম্ভাবনাটুকু চুকিয়ে রাখা উচিত ছিল।

তার পরে ভাবে ভঙ্গীতে বোধ হচ্চে এককালে উত্তমের সমাজ বিশ্বম্ভরের সমাজের চেয়ে শিক্ষায় আচরণে উপরের স্তরেই ছিল। সেটাও লেখকের জবানবন্দীর উপর বিশ্বাস করে ধরে নিতে হয়। উত্তমের এইদিককার ছবিটা একেবারে বাদ দিয়েই শুরু করা হয়েচে। উত্তম যদি সাধারণ বেশ্যার মতোই হত তাহলে পাঠকের কল্পনার উপরে বরাৎ দিয়ে ইতিহাস অসম্পূর্ণ রাখলে কোনো অসুবিধা ঘটত না। কোনো এককালে তার পতন হয়েছে ব'লেই যে সে মেয়ে একেবারে নষ্ট হবে এমন কথা নেই, কিন্তু সেটা প্রমাণের দায় লেখকের পরে। অর্থাৎ পতনের ইতিহাসটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখলে মনে হয় যে, পতিতা নারীর মধ্যেও সতীত্বের উপাদান অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে এই তত্ত্বটাকে একটা চমক-লাগানো অলঙ্কারের মতোই ব্যবহার করা হয়েচে। সাধুতাকে ভাবরসের বর্ণবাহুল্যে অতিমাত্র রাঙিয়ে তোলায় যত বড়ো অবাস্তবতা, লোকে যেটাকে অসাধু বলে তাকে সেন্টিমেণ্টের রসপ্রলেপে অত্যন্ত নিষ্কলঙ্ক উজ্জ্বল করে তুল্‌লে অবাস্তবতা তার চেয়ে বেশি বই কম হয় না। অথচ শেষোক্তটাকে রিয়ালিজ্‌মের নাম দিয়ে একালের সৌখীন আধুনিকতাকে খুসি করা অত্যন্ত সহজ। যেটা সহজ সেইতো আর্টের বিপদ ঘটায়। দেশাভিমানকে রচনায় প্রশ্রয় দিয়ে কালবিশেষে মোহ উৎপাদন করা সহজ এই জন্যেই দেশাভিমানী কাব্যে গল্পে আর্ট জিনিষটা প্রায়ই বেকার হয়ে থাকে। দুঃখে অপমানে উত্তমের প্রায়শ্চিত্তই এই আখ্যানের প্রধান বস্তু এইজন্যেই উত্তমের চরিত্রকে সুস্পষ্ট সপ্রমাণ করা আবশ্যক ছিল। বেশ্যাবৃত্তিতে যে-মেয়ে অভ্যস্ত সেও একদা যে-কোনো ঘরে ঢুকেই সদ্‌গৃহিণীর জায়গা নিতে পারে এই কথাটাকে স্বীকার করিয়ে নেবার ভার লেখক নিয়েচেন, কিন্তু ধরেই নিয়েচেন আমরা নিজেরাই এগিয়ে গিয়ে স্বীকার করব। তারো কারণ আধুনিক রিয়ালিজ্‌মের সেন্টিমেন্টালিটিতে এই কথাটির বাজার দাম বাঁধা হয়ে গেছে।

এই গল্পে দুইজন পুরুষ নায়ক, বিশ্বম্ভর ও পরিতোষ। একজন স্বভাবসিদ্ধ ইতর, আর একজন কোমর-বাঁধা সয়তান। বিশ্বম্ভরের ছবিটা ইতরতার নোংরারঙে বেশ মূর্ত্তিমান। মানুষটি অকৃত্রিম ছোটো লোক, সম্পূর্ণ অসঙ্কুচিত। ইতরতা পদার্থটা সংসারে সুলভ, তার নানা পরিচয় নানাবেশে নানাভাবে চারিদিকেই দেখা যায় কিন্তু

খাঁটি সয়তানী এত সামান্ত নয়, খাঁটি সাধুতার মতোই সে দুষ্প্রাপ্য। সয়তানী পাঁচফোড়নে সাঁৎলিয়ে তৈরি মানুষ হাজার হাজার আছে কিন্তু হাড়ে মাসে ষোলো আনা সয়তানীতে যাদের ক্ষণজন্মা বল্লেই হয় ভাগ্যক্রমে পথেঘাটে তাদের দর্শন মেলে না। অতএব তাদের বিশ্বাসযোগ্য ছবি বিশেষ যত্ন করে না আঁকলে বাস্তবতার মূর্তি পাওয়া যায় না। বিশ্বম্ভরের পালার পটপরিবর্ত্তনের পরেই এল পরিতোষ, [illegible] অন্তরে সাধ্বী বাহিরে অসতী যেন তাকেই শাস্তি দেবার জন্তে ধর্ম্মরাজ ঐ জীবটিকে টাট্‌কা বানিয়ে পাঠিয়েচেন, শাস্তির প্যাঁচকলে একটা পাকের পরে আরো একটা পাক দেবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের দলিল চাই। একথা কেউ যেন মনে না করে যে রবিবাসরিক খৃষ্টান স্কুলের হেড মাষ্টার লোকশিক্ষার জন্তে ওকে [illegible] সাজিয়ে পাঠিয়েচেন।

যাই হোক্ একথা মানতে হবে রচনা-নৈপুণ্য লেখকের আছে। আধুনিক আসরে রিয়ালিজ্‌মের পালা সস্তায় জমাবার প্রলোভন যদি তাঁকে পেয়ে বসে তবে তাঁর ক্ষতি হবে। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে বাস্তব্-প্রবণতা বা ভাবপ্রবণতা নিয়ে জাতি-ভেদের মামলা তোলা প্রায় আধুনিক কম্যুনালিজ্‌মের মতোই দাঁড়িয়েচে। অথচ সাহিত্যে ওর মধ্যে কোনোটারই জাতিগত বিশেষ মর্য্যাদা নেই। সাহিত্যে সমান অধিকার বহির্নির্দ্দিষ্ট শ্রেণী নিয়ে নয়, অন্তর্নিহিত চরিত্র নিয়ে। অর্থাৎ পৈতে নিয়ে নয়, গুণ নিয়ে। আধুনিক একদল লেখক পণ করেচেন তাঁরা পুরাতনের অনুবৃত্তি করবেন না। কোনোকালেই অনুবৃত্তি করাটা ভালো নয় একথা মানতেই হবে। নবসংহিতাসম্মত ফোঁটা-তিলককাটা আধুনিকতাও গতানুগতিক হ'য়ে ওঠে। সেটার অনুবৃত্তিও দুর্ব্বলতা। চন্দনের তিলক যখন চল্‌তি ছিল তখন অধিকাংশ লেখক চন্দনেরি তিলকধারী হ'য়ে সাহিত্যে মান পেতে চাইত। পঙ্কের তিলকই যদি সাহিত্য-সমাজে চল্‌তি হ'য়ে ওঠে তাহলে পঙ্কের বাজারও দেখ্‌তে দেখ্‌তে চড়ে যায়। বঙ্গবিভাগের সময় দেশী চিনির চাহিদা বেড়ে উঠল। ব্যবসায়ীরা বুঝে নিলে বিদেশী চিনিকে মাটি মিশিয়ে দেশী করা সহজ। আগুন জ্বালিয়ে রসে পাক দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা রসিকেরা মাটির রং দেখ্‌লেই অভিভূত হবে। সাহিত্যেও মাটি মেশানোই রিয়ালিজ্‌মের রং ধরবে এই সহজ কৌশল বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি। মানুষের এমন সব প্রবৃত্তি আছে যার উত্তেজনার জন্তে গুণপনার দরকার করে না। অন্তরে সহজ ব'লেই মানুষ সেগুলোকে নানা শিক্ষায় অভ্যাসে লজ্জায় সঙ্কোচে সরিয়ে রেখে দিতে চায়, নইলে বিনা-চাষেই যে-সব আগাছা ক্ষেত ছেয়ে ফেলতে পারে তাদের মতোই এরা মানুষের দুর্মূল্য ফসলকে চেপে দিয়ে জীবনকে জঙ্গল করে তোলে। এই অভিজ্ঞতা মানুষের বহুযুগের। কিন্তু সাহিত্য বিচারে এ-সম্বন্ধে নৈতিক তর্কের কথা তুল্‌তে চাইনে। আমার বলবার কথা এই যে, যে-সকল তাড়ী-খানায় সাহিত্যকে জমানো শস্তা ক'রে তোলে, রিয়ালিজ্‌মের দোহাই দিয়ে তার ব্যবসা চালানো কলার দুর্ব্বলতা ঘটাবে। এ-রকম শস্তা মাদকতা সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েচে, সমাজেও। আজকের য়ুরোপ তার প্রমাণ। সেখানে অন্ত যুগেও ক্ষণে ক্ষণে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিদ্যাসুন্দর ও সেই জাতের সাহিত্য এককালে বাংলা দেশে প্রচুর বাহবা পেয়েছিল। তখনকার বাবুয়ানাও ছিল ঐ ছাঁদের, নাগরিকদের কাছে বলা হত তার ইংরেজি প্রতিশব্দ সিটিজ্‌নশিপ্ নয়। হতুম প্যাঁচার নক্সায়

তখনকার আবহাওয়ার একটা আমেজ পাওয়া যায়। একটা বাঁধন-ছেঁড়া মাতামাতি, তার মধ্যে বৈদগ্ধ্য ছিল না, কেবলমাত্র ছিল বেআব্রুতা। কিন্তু তবু সেটা টিঁকল না। সেই নব কলিকাতার নবীন যুগের কাদা-গোলা জলে সাহিত্যিক হোলিখেলা দেখতে দেখতে মরে পড়ল। তার কারণ, ফ্যাশানের চড়ি-মন্দির উপরেও যে-একটা বিলাসের পসরা আছে, বাজারদর যতই বাঁক ফিরিয়ে চলুক, তারই আমদানী হয় বারে বারে ফিরে ফিরে, বস্তুত সেই হচ্চে নিত্য আধুনিকের সামগ্রী। আজ এই কথাটাকে অবজ্ঞা করা সহজ কিন্তু কালকের দিন আজকের দিনের এক প্রহরের পায়ের তলায় কাদা-চাপা পড়েনি।

একটা কথা বলা উচিত, প্রসঙ্গ ক্রমে রিয়ালিজ্‌ম্ নিয়ে যে-কথাটা উঠে পড়ল তার সমস্তটা "লঘু-গুরু" বইটি-সম্বন্ধে খাটে না। এই উপাখ্যানের বিষয়টি সামাজিক কলুষঘটিত বটে তবুও কলুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার উৎসাহ এর মধ্যে নেই। পূর্ব্বেই বলেচি যে, গল্পের চেহারাটি নিঃসন্দিগ্ধ সত্যের মতো দেখাচ্চে না এইটেতেই আমার আপত্তি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—(বৈদিক ও লৌকিক)—শ্রীজাহ্নবীচরণ ভৌমিক, বি-এল্। প্রকাশক—দি বুক্ কোম্পানী লিমিটেড, ৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৪২২। মূল্য ৩৲ টাকা।

সাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে ঐতিহাসিক দৃষ্টির যে কতদূর প্রয়োজন, তাহা শিক্ষিতমাত্রেই ভালরূপে জানেন। কিন্তু ভারতের এমনি দুর্ভাগ্য যে সংস্কৃত-সাহিত্যের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস অদ্যাপি রচিত হয় নাই। এই অসম্পূর্ণতার প্রধান কারণ এই যে, সংস্কৃতসাহিত্যের গ্রন্থকারগণ প্রায়ই আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিতেন না। সে জন্ত তাঁহারা অনেক স্থলেই আত্মপরিচয় গোপন রাখিতেন। ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য শিলালিপি, তাম্রশাসন ও কোন কোন গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃতসাহিত্যের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস যে গঠিত হইতে পারে না তাহা নহে। তবে এ কার্য্য বহুসময়সাপেক্ষ ও বহু লোকের সমবেত চেষ্টার ফলে সম্পন্ন হইতে পারে। অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রায় এক শতাব্দীর উপর পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের একটী সুসম্বদ্ধ ইতিহাস খাড়া করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা যে নাই তাহা আমরা বলিতে পারি না। বিশেষতঃ, বৈদেশিকগণ বিদেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে বসিলে অনেক সময়েই সে সাহিত্যের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা ও উপযুক্ত সহানুভূতির ভাব দেখাইতে পারেন না। এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য জাতির যতগুলি সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস রচিত হইয়াছে, তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই এ অভাব লক্ষিত হয়। অথচ দেশীয় লোকের লিখিত একখানি নিরপেক্ষ সমালোচনাপূর্ণ ইতিহাস এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। জাহ্নবীবাবুর বইখানিতে এ অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

জাহ্নবীবাবুর বইএর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। দ্বিতীয় বিশেষত্ব তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা। অবশ্য তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্তের সহিতই যে আমরা একমত, এমন কথা বলিতে পারি না। ভট্টিকাব্যের সময় নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "বল্লভীপুরী ধ্বংসের পূর্ব্বেই যে উহা বল্লভীনগরীতে রচিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বল্লভীপুরীর ধ্বংস ৫২০ খৃষ্টাব্দে হয়।" তাহাই যদি হইল, তবে,—"এরূপ অবস্থায় ভট্টিকে দ্বিতীয় শ্রীধরের সময়ের (৫৭১-৫৮৯ খৃঃ) পরে স্থাপন যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না"—এ সিদ্ধান্তটী সম্পূর্ণ অবান্তর বলিয়া মনে হয়। (পৃঃ ১৭২-৭৩)। আবার, সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকারচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "তিনি বালকদিগের বোধসৌকর্য্যে ইহার একখানি সরল বালমনোরমা নামক টীকা ও প্রৌঢ়মনোরমা নামক একখানি বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করেন।" (পৃঃ ৩৪৩) প্রৌঢ়মনোরমা ভট্টোজির রচিত হইলেও বালমনোরমা তাঁহার লিখিত নয়। উহা বাসুদেব দীক্ষিতের রচনা। আবার ২৬২ পৃষ্ঠায় জাহ্নবীবাবু বলিয়াছেন, "দণ্ডী দশকুমারচরিতে 'ন্যায়স্থিতিমিব উদ্দ্যোতকরস্বরূপম্' ,এই বাক্যদ্বারা স্পষ্টরূপে উদ্যোতকরের উল্লেখ করিয়াছেন।" উক্ত বাক্যটী সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তাতেই আছে বলিয়া আমরা জানি। তিনি নিজেও ১৯১ পৃষ্ঠায় ঐ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

তবে এ সকল অতি সামান্য ক্রটি সত্ত্বেও তিনি যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যুক্তিগুলিকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করিয়া আপনার স্বাধীন মতের পরিচয় দিয়াছেন, এইটুকুই প্রশংসনীয়।

পুস্তকখানি এক হিসাবে প্রায় সম্পূর্ণ। প্রথমে ৯৯ পৃষ্ঠায় বৈদিকসাহিত্যের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর দ্বিতীয় খণ্ডে—ক্রমশঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, মহাকাব্য, গদ্যকাব্য, নাট্যসাহিত্য, তন্ত্র ও দর্শন সম্প্রদায়গুলির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে Scientific Literature অর্থাৎ স্মৃতি, ব্যাকরণ, গণিত, বৈদ্যক, সঙ্গীত, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতির সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার মত বহু উপকরণ সংগৃহীত আছে। এ অংশটীর ঠিক ইতিহাস বলা যায় না, ইহা অনেকটা পুস্তক তালিকার মত। পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার একটু বিস্তৃতি করিতে পারিলে পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Son of Woman : The Story of D. H. Lawrence by JOHN MIDDLETON MURRAY (Jonathan Cape).

মিড্‌লটন্ মারির সঙ্গে পরলোকগত ডি, এচ, লরেন্সের বন্ধুত্ব ছিল। এই পরিচয়ের ফলে লরেন্স্-সম্বন্ধে কবিতা, উপন্যাস ও সমালোচনা-লেখক মারির লেখা মূল্যবান হওয়াই উচিত। এ বইয়ে বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার সাহিত্যিক সমালোচনা করা মারির উদ্দেশ্য নয়। সে আশা করাই অন্যায়। মারি ব'লেই দিয়েছেন যে তিনি মুখ্যত লরেন্সের রচনাবলী থেকে ও তদুপরি তাঁর ব্যক্তিগত

পরিচয়ের সাহায্যে লরেন্সের জীবনী লিখেছেন। এ জীবনীতে অবশ্য শুধু লরেন্সের জীবনের সেইটুকু আছে, যা জানলে তাঁর রচনার ও জীবনের সার্থকতা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়, যেমন হয় মাইকেলের কবিতা তাঁর জীবন জানলে।

একথা স্বীকার্য্য যে লরেন্সই একমাত্র আধুনিক লেখক যিনি এত গভীরচিত্তে জীবনের অসম্পূর্ণতার ও ব্যর্থতার সমাধান করতে চেয়েছেন। এবং লরেন্সের নিছক শিল্পশক্তির চেয়ে তাঁর এই একাগ্র অন্বেষণ ও গভীরতা বা passionই আমাদের বেশী বিচলিত করে। এই আবেগের সূত্র, এই অন্বেষণের প্রয়োজন লরেন্সের জীবনে ছিল। সেই জীবনের নাটকীয় গল্পটী মারি আমাদের বল্‌তে বসেছেন।

৩৮৯ পৃষ্ঠার বইয়ের সারমর্ম্ম দেওয়া অসম্ভব। তা ছাড়া, লরেন্সকে নিয়ে লেখা বাংলা ভাষায় নিরাপদ নয়। মোটামুটি যে তথ্য আমরা লরেন্সের গ্রন্থাবলী পড়ে জানতে পারি ও যে তথ্য মারি সবিস্তারে প্রকাশ করেছেন, এক কথায় সে তথ্য হচ্ছে, বৃদ্ধ টলষ্টয়ের মতো লরেন্সের মধ্যে দুটী বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব তাঁকে প্রায় উন্মাদ ক'রে দিয়েছিল। লরেন্সের হওয়া উচিত ছিল The man who had died কিন্তু তা না হয়ে তিনি রয়ে গেলেন Lady Chatterley's Lover ও খৃষ্টের তিক্ত শত্রু। উজ্জীবন তাঁর আর হল না, লরেন্স র'য়ে গেলেন crucified into sex। লরেন্সের মধ্যে জিসাসের ও জুডাসের বিরোধ আজীবন চলেছিল। এবং যেহেতু তিনি ছিলেন অসাধারণ, তাই তাঁর জীবনের এই গতি মানবসমাজের কাছে মূল্যবান।

লরেন্সের ট্রাজেডির প্রথম ও প্রধান কারণ হলেন তাঁর মা—Son of Woman নামকরণ তাঁরই জন্য। কয়লাখনির মজুরের স্ত্রী, মাতাল অসভ্য স্বামীর চেয়ে শিক্ষিত ও স্বামীর সম্বন্ধে হতাশ, তিক্ত। লরেন্সের অনাকাঙ্ক্ষিত জন্মের পরে লরেন্সের প্রতিই তাঁর অতৃপ্ত হৃদয়ের ভালোবাসা পড়ল। লরেন্স তাঁর মায়ের হৃদয়-জীবনের কেন্দ্র হলেন। এর ফলে কি হ'ল, তা Sons and Lovers, Fantasia of the Unconscious ইত্যাদিতে লরেন্স নিজেই আভাস দিয়েছেন :

"The unhappy woman beats about for her insatiable satisfaction, seeking whom she may devour. And usually, she turns to her child. Here she provokes what she wants . . . . . . But as a matter of fact, a man never leaves his first love, once the love is established. He may leave his first attempt at love. Once a man establishes a full dynamic communication at the deeper and the higher centres, with a woman, this can never be broken . . . . what is he actually to do with his sensual, sexual self? Bury it? Or make an effort with a stranger? For he is taught, even by his own mother, that his manhood must not forego sex. . Yet he is linked up with ideal love already, the best he will ever know." "A man finds it impossible to realise himself in marriage. He recognises the fact that his emotional, even passional, regard for his mother is deeper than it ever could be for a wife. This makes him unhappy, for he knows that passional communion is not complete unless it be also sexual. He has a body of sexual passion which he cannot transfer to a wife. He has a profound love for his mother. Shut in between the walls of tortured and increasing passion, he must find some way of escape or fall down the pit of insanity or death." ইত্যাদি।

এই Son and Lover-এর অন্তর্বিরোধ লরেন্স্‌কে সারা জীবন ভুগিয়েছে। আসলে প্রেমের ব্যাপারে তাঁর মন ছিল শিশুর মতো। কিন্তু আহত পৌরুষে তাঁকে বরাবর করতে চেয়েছে সবল দৃঢ় বর্ব্বর পুরুষ, the dominant male। কিন্তু নারীকে যে fulfilment দেওয়া dominant male-এর কর্ত্তব্য সে ক্ষমতা লরেন্সের ছিল না। তাঁর অন্তর্বিরোধ এর একটা কারণ। আর একটা কারণ লরেন্সের মধ্যে dominant male-এর স্বাভাবিক প্রবল যৌনপ্রবৃত্তির অভাব ও তাঁর সন্তানহীনতা। মারি সেইজন্য তাঁর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন The Sexual Failure। এর পরেও লরেন্সের মুক্তির উপায় ছিল। তখনও তিনি মারি-অনুমোদিত খৃষ্টধর্ম নিতে পারতেন। কিন্তু চরিত্রই ভাগ্য। ব্যর্থ পৌরুষের আঘাতে লরেন্সের ধারণা হয়েছিল যে Spirit ও Flesh-এর মধ্যে দেহের সার্থকতাই বেশী এবং দেহধর্মকে অস্বীকার ক'রে খৃষ্ট ফাঁকি দিয়েছেন। কাজেই লরেন্সের যাত্রা চল্‌ল ইন্দ্রিয়ের নিরানন্দ বন্ধুর পথেই—যে পথে পাওয়া যায় Women in Love এবং যে পথের শেষ দুঃস্বপ্নের মতোই কষ্টকর, ভয়ানক।

এই সময় থেকেই লরেন্সের ভাঙন ধরা আরম্ভ হ'ল। তিনি হলেন পলাতক—উপলব্ধি-প্রাপ্তির আশায় সংসারত্যাগী শ্রীচৈতন্য নয়; ব্যর্থ, হতাশ পলাতক। কিন্তু যে 'হোলি গোষ্ট্' তাঁকে সভ্য য়ুরোপে শান্তি দেয় নি, সেই মানবাত্মাই অন্য মনোমতো নূতন সমাজ-গঠনে তাঁর প্রতিবন্ধক হ'ল। সিসিলি, সার্দিনিয়া, এমেরিকা, মেক্সিকো, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া বৃথাই ঘোরা হ'ল। সিসিলিয়ান বা আজটেক্ কেউ তাঁর half-brother হ'ল না। শরীর-সর্ব্বস্ব আদিম জীবন কল্পনাতেই রয়ে গেল। নিঃসন্তান নারীবিতৃষ্ণ লরেন্স্ নিজহাতে মানুষ করবার জন্যে কাউকে জোটাতে পারলেন না —Aaron's Rod-এ যার কল্পিত (ও কিছু বিকৃত) কাহিনী আছে। (প্রসঙ্গত, মারির একটা লাইন উদ্ধৃত করা গেল—He avoided India, for India might have understood him too well ; but he touched at Ceylon...)

মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত, মারির মতে যা ছিল লরেন্সের স্বধর্ম্ম, সে স্বধর্ম্ম লরেন্স স্বীকার করেন নি। এবং ট্রাজেডি তাঁর এই যে তাঁর স্বভাবের ভিতরেই এই স্বধর্ম্ম পালনের বাধা ছিল। আর যদিচ লরেন্স্ ছিলেন যাকে বলে ম্যান্ অফ্ জিনিয়াস্ এবং তাঁর স্বভাবে ছিল গভীর আবেগশক্তি ও অনুকম্পন, এই বাধা তাঁর পঁয়তাল্লিশ বৎসরের জীবনকে রসহীন ও কঠিন ক'রে দিয়েছিল।

লরেন্স্ নীলকণ্ঠ ছিলেন না সত্য; কিন্তু He lived through this experience for us : we owe him homage।

কথা উঠ্‌তে পারে লরেন্সের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? এর উত্তরে কাগজ ও সময় বেশী লাগবে। কিন্তু একথা বলা যেতে পারে যে লরেন্সের সমস্যা মানুষেরই সমস্যা, অতিসভ্য সহৃদয় বুদ্ধিমান মানুষের সমস্যা। লরেন্সের জীবনে এইসব সমস্যা বিশেষ রূপ ধরেছে, তার কারণ অবশ্য তাঁর প্রতিভা ও অবস্থাচক্র। কিন্তু আসলে সমস্যাগুলির কিছু না কিছু আমাদের জীবনেও আছে।

তা ছাড়া, যে জগতে এখনও বার্ণার্ড শ, চেষ্টার্টন্ রাজত্ব করছেন, সে জগতে গভীরচিত্ত, গভীরতাবাদী, চৈতন্যবাদী লরেন্সের সার্থকতা প্রচুর। সে সার্থকতা যাঁরা অন্তত Fantasia পড়েছেন, তাঁরা মানবেন।

মারি এই বইয়ে সেই সার্থকতার পরিচয় দেবার প্রথম চেষ্টা করেছেন। মারির মূল বক্তব্য হচ্ছে লরেন্সের এই ব্যক্তিগত পরিচয় দেওয়া। এই পরিচয়ে আমাদের আস্থা হয়। তার কারণ, এ Son of Woman-এর প্রকৃতির আভাস অস্পষ্টভাবে আমাদের মনে ছিল—সাহস ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাবে স্পষ্টতা পায় নি। মারি সে অভাব পূরণ করেছেন। এবং তাঁর অস্পষ্ট ভগবৎক্ষিপ্ততা ও স্পষ্ট জার্ণালিষ্টিক্ হিষ্টিরিয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আর তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের মিল না হ'লে মনে রাখা উচিৎ যে সে দায়িত্ব মারির চেয়ে লরেন্সের ভাগ্যবিধাতারই হয়ত বেশী।

শ্রীবিষ্ণু দে

The Collected Poems of Edith Sitwell (Duckworth).
The Collected Poems of Robert Frost (Longmans).

শুনেছি ভালেরির মতে আধুনিক জগতে নাকি সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। কথাটা প্রথমে হেঁয়ালি ব'লে ঠেকলেও, একটু ভাবলেই দেখা যাবে ওটা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত উক্তিরই প্রতিধ্বনি। সঙ্ঘর্ষের প্রথম প্রতিক্রিয়া চীৎকার, এই চীৎকারকে শ্রুতিমধুর করতে হ'লে অনেকখানি স'রে যাওয়া অনিবার্য্য। সুদূর থেকে রেলগাড়ির বজ্রনির্ঘোষেও যে স্বরসঙ্গতির অভাব ঘটে না, সে-অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। শ্রীমতী ইডিথ্ সিট্‌ওয়েলের অত্যুগ্র আধুনিকতা এই প্রাচীন প্রবাদটিকে প্রত্যাখ্যান করলেও, তাঁর ভূচর কবিতাবলী এই বৈজ্ঞানিক নিয়মটিকে লঙ্ঘন করতে অক্ষম। ফলে পৌনে তিন শ পাতা ব্যাপী কাব্যসমষ্টির ভিতরে পাঠকের উৎকর্ণ মন শুধু সেই কবিতাগুলির সান্নিধ্য সইতে পারে, যেগুলির প্রবর্ত্তনায় বর্ত্তমানের যন্ত্রঝঞ্ঝনা নেই, আছে কেবল অতীতের মন্ত্রমূর্চ্ছনা। শুধু অতীত জীবনকে অবলম্বন ক'রে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ যদি কবিতা লিখতেন তাহলে তাঁর কাব্যের পরিসর অবশ্যই সঙ্কীর্ণ হতো। কিন্তু সঙ্কীর্ণতার কোনো স্বভাবগত দোষ নেই, স্বল্পতা বরং অনেক ক্ষেত্রেই গুণ। আয়তন ক্ষুদ্র হ'লে উপাদনকে আয়ত্তে আনা সহজ; এবং কলাবিচারে সম্পূর্ণতাই যেহেতু একমাত্র মানদণ্ড, তাই কাব্যের ভূগোলেও চীনের মতো অসীম অরাজকতায় অন্যতম দিক্‌পাল হওয়ার চেয়ে জাপানের মতো সূচ্যগ্র ভূমির একচ্ছত্র অধিপতি হওয়াই শ্রেয়ঃ। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ ইতিহাসের এই চাক্ষুষ উপদেশটুকু অঙ্গীকার ক'রে নিলে, ইংরেজি কাব্যের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে তাঁকে মুখ্যপাত্রী বলতে আমার কোনো দ্বিধা থাকতো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের প্রকৃতি অতীতধর্ম্মী হ'লেও, তাঁর কবিপ্রতিভা এতই ওজোময়ী যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী কূপমণ্ডূকত্বে তুষ্ট থাকতে পারেননি, আপনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে লাফ দিয়ে উঠেছেন তটের বিপন্ন প্রতিযোগে। ফলে তাঁর কবিতামালা দিশাহারা উল্লম্ফনে পরিপূর্ণ। এই উল্লম্ফন বৈশিষ্ট্যময় তাতে সন্দেহ নেই, এই ভঙ্গীর অন্তর্নিহিত চালনীশক্তিও প্রশংসনীয়; কিন্তু নীচের লেখাটি যে কাব্য নয়, তাও নিতান্ত নিশ্চিত।

When
 Don
Pasquito arrived at the seaside
Where the donkey's hide tide brayed, he
Saw the banditto Jo in a black cape
Whose slack shape waved like the sea—
Thetis wrote a treatise noting wheat is
 silver like the sea; the lovely cheat
 is sweet as foam; Erotis notices
 that she
 Will
 Steal
 The
Wheat-king's luggage, like Babel
Before the League of Nations grew—
So Jo put the luggage and the label
In the pocket of Flo the Kangaroo.

অবশ্য এ-লাইন কটা একেবারে নিরর্থ, তা বললে অন্যায় হবে। এমন কি আমি এত দূর পর্য্যন্ত স্বীকার করতে রাজী আছি যে ও-গুলোর অসঙ্গতি ও দুঃস্বাচ্ছন্দ্যের প্রসাদে ইউরোপীয় প্রমোদকেন্দ্রগুলির যে-অতিরঞ্জিত ব্যঙ্গচিত্রখানি ফুটে উঠেছে সেটি একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু পশ্চিমদেশের উৎসবউন্মুখর সার্থক সহরগুলোকে বর্ণনা করার এইটাই একমাত্র উপায় ব'লে আমার মনে হয় না। উপায়ান্তরের অবকাশ রাখলে হয়তো লেখকের ন্যায়পরায়ণতার প্রমাণ মিলতে পারে, কিন্তু তাঁর রূপনৈপুণ্যের পরিচয় নিশ্চয়ই পাওয়া যায় না। উপরন্তু এই কবিতাটি কিছু আগে যখন উদ্ধৃত পঙক্তি কটাকে দেখি :

Said Il Magnifico
Pulling a fico—
With a stoccado
And a gambado,
Making a wry
Face: " This corraceous
Round orchidaceous
Laceous porraceous
Fruit is a lie!
It is my friend King Pharaoh's head
That nodding blew out of the Pyramid........"

এবং একটু পরেই পড়া যায় :

That hobnailed goblin, the bob-tailed Hob,
Said, " It is time I began to rob."
For strawberries bob, hob-nob with the pearls
Of cream (like the curls of the dairy girls),
And flushed with the heat and fruitish-ripe
Are the gowns of the maids who dance to the pipe.
Chase a maid?
She 's afraid!

" Go gather a bob-cherry kiss from a tree,
But don't, I prithee, come bothering me!"
She said—
As she fled.

তখন সিদ্ধান্ত ক্রমশই দৃঢ় হয় যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের ছন্দ তাঁর হৃদয়াবেগের প্রতিবিম্ব নয়, তাঁর হৃদয়াবেগ এই ছন্দকুশলতার প্রতিধ্বনি। অর্থাৎ প্রসঙ্গটি তাঁর রচনার উপলক্ষ মাত্র, শ্রীমতীর কলম আসলে উধাও আত্মশ্লাঘার তাড়নে। এতাদৃশ মনোভাব লেখকের ঐকান্তিক বিশিষ্টতা পরিস্ফুট করার পক্ষে অনুকূল হ'লেও, ও দিয়ে রূপসৃষ্টির কোনই সুবিধা হয় না। কারণ রূপ রসিকমাত্রের মনেই লুকিয়ে থাকে, কবির কাজ হচ্ছে অহঙ্কার.ছেড়ে সেই লুপ্ত রূপের সন্ধানে পাঠকের কল্পনাকে জাগ্রত করা।

এইখানে বলা ভালো যে আমি যে-পাঠকের কথা বলছি, কাব্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ আছে, রচনার দুরূহতাকে সে বাধা ব'লে ভাবে না, বরং কঠিন কথার ধাক্কায় তাঁর দরদী কল্পনা অত্যধিক রকমের সজাগ হয়ে ওঠে। কিন্তু পাঠক যতই অনুকম্পায়ী হোক, কবি যদি ছুৎমার্গের আড়ালে নিজেকে পৃথক ক'রে রাখেন, তাহলে তাঁর নাগাল পাওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ অন্তে যদি অমরাবতীর সন্ধান মিলে তবে পাঠককে পর্ব্বতলঙ্ঘন করতে বলায় দোষ নেই, কিন্তু ইন্দ্রধনুর অনধিগম্য প্রান্ত প্রদর্শনের লোভ দেখিয়ে তার কাছে অষ্টসিদ্ধি প্রত্যাশা করা অমার্জ্জনীয়। এমন কবি আজকের দিনে বিরল নয় যাদের লেখা শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের লেখার চেয়ে লক্ষগুণ শক্ত। ভালেরি অথবা এলিয়টের মর্ম্মে পৌছতে হ'লে যত বিঘ্নবিপত্তি জয় করতে হয়, যত বিশেষজ্ঞানের প্রয়োজন ঘটে, তার উপযুক্ত সময় হয়তো অনেকের হাতেই নেই; কিন্তু এঁদের নিমন্ত্রণ এতই উদার, এঁদের অন্বেষণ এতই সার্ব্বিক যে 'ল সের্‌পাঁ'র কিম্বা 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ডে'র সর্ব্ববাদীসম্মত দুর্ব্বোধ্যতা ও-কবিতা দুটির রসগ্রহণের প্রতিবন্ধক হয় না। বুদ্ধির অনুমতি পাবার বহু পূর্ব্বেই আমাদের মুগ্ধ চৈতন্য নিঃসঙ্কোচে মেনে নেয়, কবিতা দুটি মহৎ।

এ-দুজনের পাশে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ জলবৎ সরল, ভাবের মারপেঁচ নেই, ভাষা বেশ প্রাঞ্জল, উপলক্ষণগুলি অসাধারণ রকমের প্রাণবন্ত। কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও উদ্ধৃত লাইন কটার দুরূহতা দুর্জ্জেয় :

Roads whose dust seems gilded binding
Made for " Paul et Virginie "
(So flimsy-tough those roads are), see
The panniered donkey pass.........

দশ-বিশখানা বিশ্বকোষ উল্‌টে পরিশ্রমী পাঠক যখন আবিষ্কার করে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের বালিকা-বয়সে 'পল এ ভিরজিনি'-নামে একটা ভাবালু শিশুপাঠ্য প্রেমকাহিনীর খুব কদর ছিলো, তখনো রাস্তাগুলোকে উক্ত পুস্তকের মলাটের সঙ্গে তুলনা করার সার্থকতা সে বোঝে না। আরো কিছুকাল গভীর গবেষণার পরে হয়তো এটুকুও তার বোধগম্য হয় যে সকল মামুলি ফরাসী পুঁথির মতো, ও-বইখানার পাতাও ছিলো সস্তা ও অস্থায়ী এবং তার মলাট ছিলো মহার্ঘ ও অবিনশ্বর, কিন্তু তখনো পাঠকের মনে সমবেদনা জাগে না। তবে এতক্ষণে সে হয়তো নিকুণ্ঠ চিত্তে

স্বীকার করতে পারে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের লেখা শূন্য কলসীর সমান, ভিতরে কিছু নেই ব'লেই বাইরে অত আওয়াজ।

এ-মতটি অবশ্য অতিশয়োক্তির কোলঘেঁসা। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের কবিতার সঙ্গে সুপরিচিত হবার পরে সকলেই মানতে বাধ্য হবেন যে এই কবির দৃষ্টি প্রখর বটে।

Green wooden leaves clap light away
From the young flowers as white as day
* * *
And eyes that seemed the dancing sound
Of waves upon enchanted ground
* * *
The snow dies, that was cold as coral
Or a fairy-story's moral

ইত্যাদি পঙক্তিগুলো কোনো উন্মনা লেখকের কলম দিয়ে বেরুতো না। কিন্তু পরবর্ত্তী লাইনগুলো লেখার প্রতিভা যে-কবির আছে :

Changing the light in eyes to heavy tears,
Changing the beat in hearts to empty years
* * *
............Vast years
Pile mountain-high above, and the last tears
Freeze to gigantic polar nights of ice
Around the heart through crumbling centuries.
* * *
Across the thick and the pastel snow
Two people go .... "And do you remember
When last we wandered this shore?"..............."Ah no!
For it is cold-hearted December."
"Dead the leaves that like asses' ears hung on the trees
When last we wandered and squandered joy here;
Now Midas your husband will listen for these
Whispers—these tears for joy's bier."
And as they walk, they seem tall pagodas;
And all the ropes let down from the cloud
Ring the hard cold bell-buds upon the trees—codas
Of overtones, ecstacies, grown for love's shroud.

তিনি যে কেন নূতনত্বের লোভে নিম্নোক্ত ধরণের লেখায় তাঁর শক্তির অপচয় করেন, তা বোঝা শক্ত :

" Madame la Marquise,
If you please,
When I must play with old ladies, ombre
In Hades' shady bocage sombre—
Let me, though I am old,
Still perceive your gold
Fruit-sweet cheeks' brocade,
Smiling among that peaceful shade........."

But the Marquise in the bocage,
Laughs like the sharp rockage
Of her gallant grottoes, cold as water-wells,
And shakes her curls, as pearly as their shells!

এই ধরণের রচনার সাহায্যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ যদি তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রমাণ করতে চান, তাহলে বলতে হবে আধুনিক কাব্য-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অতিশয় অল্প। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আজকের দিনে অন্তত দশ বারো জন এমন কবি আছেন যাঁরা ছন্দের তীক্ষ্ণতায় ও উপমার অভিনবত্বে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের জ্যেষ্ঠ না হলেও, তাঁর সমকক্ষ বটে। ককতো, জুল্ সুপের্‌ভিল্, মারিয়ান্ মুর্, কামিঙস্ ইত্যাদি সকলেই এই দলের। কিন্তু এঁদের কথাও যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তবু শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের বিশিষ্টতা আজকে আর বিশিষ্ট নয়, আর কারুর অনুকরণ না করলেও, তিনি এখন নিজের অনুকরণে ব্যস্ত। প্রথমে যেদিন 'মরাল পৃষ্ঠ' দীঘির কথা পড়েছিলুম, সেদিন বিশেষণটাকে শুধু নতুন নয়, জাজ্বল্যমান ব'লে বোধ হয়েছিলো; কিন্তু যখন আগুনমাত্রেই রোমশ হয়ে দেখা দেয়, গাছপালা, ঘরবাড়ি, রৌদ্রবৃষ্টি সকলেই একজোটে পেরুপাখীর নকল করতে লেগে যায়, তুষার হয় প্রবালশীতল এবং তৃণপল্লব ধাতুনির্ম্মিত, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর feathered race-কেও অভিনব ব'লে ঠেকে, তখন বাঙলা কবিতার বংশীলুব্ধা চন্দ্রাবলীর কদমতলা দিয়ে যমুনায় জল আনতে যাওয়ার ছলটাতেও প্রাথমিক সত্তা ফিরে আসে। কারণ বিধিবদ্ধ মৌলিকতা আর প্রথাসিদ্ধ ভাবালুতা, এ-দুইই এক আগাছার গোড়া আর চূড়া। উভয়ই সমান বর্জ্জনীয়, কিন্তু যদি একান্তই নির্ব্বাচন করতে হয়, তবে শেষোক্তটিকেই পছন্দ করা ভালো, কেননা তার পিছনে অন্তত বয়সের গুণে কিছু অনুষঙ্গ এসে জমেছে। যুগযুগান্তের সংস্কারের ফলে চন্দ্রাবলীর নাম আমাদের বুদ্ধিকে বিচলিত না করলেও, অনুবোধকে বেশ একটু নাড়া দেয়। এই উত্তেজনার ধাক্কা শ্রোতার মনে কল্পনার পথ দিয়ে পৌঁছতে পারে না বটে, কিন্তু অভ্যাসের সুড়ঙ্গ বেয়ে পৌঁছয়। অবশ্য এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে সময়বিশেষে, কোনো নাতিসামান্য আবেগের খাতিরে, সূর্য্যকে কাফ্রিকালো আখ্যা দেওয়া শুধু সঙ্গত নয়, সার্থক; কিন্তু স্থানকালপাত্র-নির্ব্বিচারে সূর্য্য যদি ওই পোষাকী কালো কোর্ত্তা না-প'রে লোকসমক্ষে আসতে অসম্মত হন, তবে অতি বড় ব্রাত্য পাঠকও স্বীকার করবে যে শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ অপরিহার্য্য বাক্যের সন্ধানে বেরিয়ে ও-উৎপ্রেক্ষায় উপনীত হননি, ওটাকে অবশ্যম্ভাবী ব'লে ভেবেছেন আত্মবিজ্ঞাপনের গরজে। কোনো কবির সম্বন্ধে এর চেয়ে মারাত্মক নিন্দা আমার জানা নেই।

শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের উদ্ভট-কল্পনার আসল ব্যাখ্যা ওইটাই। তাঁর লেখার ভঙ্গী নৈর্ব্যক্তিক হলেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তাঁর কাব্যের প্রাণ। অর্থাৎ জগৎ-সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য শুধু মৌখিক, বস্তুত তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের নেশায় এতই বিভোর যে, বহির্মণ্ডলের দিকে চাইবার প্রবৃত্তি বা অবসর, কোনোটাই তাঁর নেই। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে একটা স্বপ্নসুলভ অসামঞ্জস্য এসে জোটে যার কারণ জানতে চাইলে মনস্তাত্ত্বিক দেবেন আশাভঙ্গের নাম। আমার বিশ্বাস যে শৈশবের সুখস্মৃতির সঙ্গে যৌবনের বঞ্চনাব্যথার সঙ্ঘাতেই শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের অধিকাংশ কবিতার উৎপত্তি।

তাঁর চাকচিক্য এই নিষ্ঠুর সঙ্ঘর্ষের পরিণাম। কবির পক্ষে অশ্রুমোচন করা যদি আজকের দিনে এত অশোভন ব'লে গণ্য না-হতো তাহলে আমরা হয়তো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলকে গ্রাম্য প্রহসনের খোঁজে গোষ্ঠে গোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে দেখতুম না, তাঁর সাক্ষাৎ পেতুম কৈশোরের প্রতিধ্বনিমুখর শিশিরসিক্ত তেপান্তরের মাঠে। এই ভিক্টোরীয় প্রবৃত্তিটা নিন্দনীয় ব'লেই তিনি কাষ্ঠহাসির তলায় কান্না চাপা দেন। কিন্তু ওই উপায়ে আর্ত্তনাদ ঢাকা গেলেও কৃত্রিমতা ঢাকা যায় না, ফলে অতিশয়োক্ত বৈহাসিকতা তিক্ত হয়ে ওঠে। এই প্রচ্ছন্ন ট্রাজিডি আমাদের কাছে অব্যক্ত, তাই শ্রোতারা স্তম্ভিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "ফাসাডে"'র উদ্দাম হাসির ফাটলে ফাটলে অত উচ্চণ্ড দুরুক্তির আভাস মিলে কেন। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের অতীত জীবন-সম্বন্ধে আমরা স্বভাবত উদাসীন, সেই জন্যেই "গোল্ড্ কোষ্ট্ কাষ্টম্‌স্"-এর দারুণ দুঃসহ আমাদের স্পর্শ করে না। স্বপ্রধান সাহিত্য এই কারণেই নশ্বর ও নিষ্ফল। আমার নিজের বাড়ির পরিচারিকাকে নিয়ে কাব্য লিখলে চক্‌চকে তক্‌তকে চিত্রাঙ্কনে হয়তো পাঠককে তাক লাগিয়ে দিতে পারি, কিন্তু পাঠকের অন্তরতম লোকে প্রবেশ-প্রার্থনা করলে আমার কবিতার পিছনে থাকা চাই পরিচারিকাজাতির অনুক্ত সমর্থন। এ-কথায় যাঁদের আস্থা নেই তাঁরা যেন "বিউকলিক্ কমিডিস্"-এর "ওবাড্"-শীর্ষক তিন লাইন কবিতাটির বাক্‌ডম্বর কানে থাকতে থাকতে এলিয়টের "মর্ণিঙ্ এট্ দি উইন্‌ডো"-নামক নিরাভরণ কবিতাটি প'ড়ে দেখেন।

আমার অভিমতটির স্বপক্ষে আরো দৃষ্টান্তের দরকার হ'লে রবার্ট্ ফ্রস্টের নাম করতে পারি। শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ আর ফ্রস্টের মধ্যে এমন মূলগত বৈসাদৃশ্য আছে যে প্রথমার কাব্যবিচার যদি ঠিক হয়, তাহলে ফ্রস্ট্‌কে কোনোমতেই কবি বলা চলবে না। তবু আমার বিশ্বাস, রসিকমাত্রেরই মন ঝুঁকবে ফ্রস্টের দিকে। অথচ ফ্রস্টের কবিতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামগন্ধ নেই, উপমা নূতনত্বহীন, প্রসঙ্গ নির্ব্বাচন সনাতনপন্থী, ভাষা এতই সরল, শব্দবিন্যাস এতই সহজ যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আদর্শ একমাত্র এই কবির লেখাতেই বাস্তব হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এমন কি প্রতিভার ওজন ক'রে দেখলেও শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের জয় অনিবার্য্য। তবু এই প্রাকৃত রসস্রষ্টার অদ্ভুত আহ্বানে আমাদের কল্পনা যতটা উন্নিদ্র হয়ে ওঠে, শ্রীমতী সিট্‌ওয়েলের সভা, সামাজিক কবিতাগুলির সলীল নিমন্ত্রণে তার এক চতুর্থাংশও হয় না। ফ্রস্টের এই ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণী-শক্তির কারণ খুঁজলে দেখা যাবে যে এর মর্ম্মে আছে ফ্রস্টের অকপট বিনয়। ফ্রস্ট মনে করেন না যে তাঁর নিজস্ব জীবনের এমন কোনো গরিমা আছে যেটাকে ঢাক পিটিয়ে লোকসভায় জাহির করা উচিত। ফলে তিনি তাঁর আজন্ম সাধনার হৃদয়াবরণ শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত যে—

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I sha'n't be gone long.—You come too.
I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young,
It totters when she licks it with her tongue.
I sha'n't be gone long.—You come too.

এবং বিশ্বস্ত পাঠক এই প্রচ্ছন্ন দিশারীর পদাঙ্কে কত বৃষ্টিঝড়, কত রৌদ্রহিম, অসংখ্য পর্বত, অথবা নদনদী, বনউপবন অতিক্রম ক'রে, কখন যে অমৃতলোকের দ্বারে এসে পৌঁছয়, তা সে নিজেও বোঝেনা।

উপরের মুখবন্ধটি প'ড়ে অনেকে হয়তো ভাববেন, রবার্ট্ ফ্রস্ট্ বুঝি সাবেকি আমলের শুচিগ্রস্ত কবি যার লেখার একমাত্র অনুপ্রেরণা হচ্ছে জ্যোৎস্নাস্নাত মাধবীবিতানে প্রকৃতিদেবীর লীলাখেলা। ফ্রস্টের কবিতা প্রধানত নিসর্গকেই অবলম্বন ক'রে থাকে, এ-কথা খুবই সত্য, এবং স্বভাবের কবি ব'লেই তিনি বিখ্যাত। কিন্তু তাই ব'লে ফ্রস্ট্ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এমন অমূলক ধারণার বিপক্ষে তাঁর অধিকাংশ বড় কবিতাই সাক্ষী হবে। তবে তিনি তাঁর শক্তির সীমা জানেন, তিনি জানেন যে অধুনার বিকৃত বিক্ষোভের মাঝে ধ্রুবতার সুর খুঁজে বাহির করার মতো অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর নেই। তাই তিনি মানুষকে সাধারণত পেতে চান প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মাঝখানে। যারা টেলিফোনে ছাড়া কথা কয়না, পুল্‌ম্যানে ছাড়া নড়েনা, বিশতালার নীচে নীড় বাঁধেনা তাদের বিষয়ে ফ্রস্ট্ নিরুৎসুক নন, কিন্তু তিনি মনে করেন যে বর্ত্তমানের যান্ত্রিক উপসর্গগুলো বাসাবাড়ির অনাত্মীয় আসবাবের মতো, মানুষের পরমসত্তার সাক্ষাৎ চাইলে হয়তো ও-গুলোর সংস্পর্শ বিনাবাক্যে সইতে হবে, কিন্তু ওদের আবেষ্টনের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ তেমন জমবে না। তাই তিনি মনের মানুষকে ডাক দেন পাহাড়ের বিজন চূড়ায়, বনের নিভৃত অন্তরে, গ্রাম্য পথের পুষ্পিত প্রান্তে। তাঁর বিবেচনায় এয়ারোপ্লেন্ অথবা মোটর হয় মানুষের দাস, নয় মানুষের প্রভু, কিন্তু তার প্রকৃত বন্ধু হচ্ছে ঘোড়া। সেই জন্যে তিনি এঞ্জিনের প্রতি দৃক্‌পাত না-ক'রে ঘোড়ার মনোজগতে প্রবেশ করার চেষ্টায় নিবিষ্ট হন; কারণ বন্ধুনির্ব্বাচনের মধ্যে মননের ইঙ্গিত মিলতে পারে, কিন্তু দাসখৎ অদৃষ্টলিপিরই নামান্তর।

ফ্রস্টের নিসর্গনির্ভরতার সম্বন্ধে ভ্রান্তি পোষণ করা সহজ। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে ফ্রস্ট্ প্রকৃতিকে ফেরার আসামীর আশ্রয়স্থল ব'লে ভাবেন না; তিনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করেন আবহমান জীবনের স্থিতিনিরূপকরূপে। সেই জন্যেই রাত্রে নক্ষত্রপঙক্তির পানে চেয়ে তিনি ব'লে ওঠেন:

You'll wait a long, long time for anything much
To happen in heaven beyond the floats of cloud
And the Northern Lights that run like tingling nerves.
The sun and moon get crossed, but they never touch,
Nor strike out fire from each other, nor crash out loud.
The planets seem to interfere in their curves,
But nothing ever happens, no harm is done.
We may as well go patiently on with our life,
And look elsewhere than to stars and moon and sun
For the shocks and changes we need to keep us sane.
It is true the longest drouth will end in rain,
The longest peace in China will end in strife.
Still it wouldn't reward the watcher to stay awake
In hopes of seeing the calm of heaven break
On his particular time and personal sight.
That calm seems certainly safe to last tonight.

এই কবিতাটি থেকে বোঝা যাবে যে ফ্রষ্ট্ স্বভাববিলাসী হ'লেও ওয়ার্ড্স্‌ওয়ার্থের শিষ্য নন। এখানে স্বভাবকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে প্রতিপন্ন করার অথবা মানুষকে অতিমনুষ্যত্বে অধিকার দেওয়ার কোনো চেষ্টাই নেই, আছে কেবল মানুষের সহজ পরিমণ্ডলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে তাকে সহজ ভাবে দেখার প্রয়াস। ফ্রষ্ট্ মানুষকে সত্যই ভালোবাসেন, তাই তিনি তাকে দেবতা বলতে কুণ্ঠিত; তিনি জানেন সে নশ্বর, কিন্তু তা সত্ত্বেও মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিমেয়, কেননা মানুষ ক্ষণস্থায়ী হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের পটভূমিকা চিরন্তনী। স্বভাব ও মানুষের মধ্যে বৃন্দাবন আনতে পারা আজকের দিনে এতই শক্ত যে শুধু এইটুকু সিদ্ধির জন্যেই ফ্রষ্ট্ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

উপরে যা বল্‌লুম তা দিয়ে ফ্রষ্ট্‌কে মানুষের কবি ব'লে প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। স্বভাবের কবি ও স্বভাবকবি ব'লেই তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি শুধু এইটুকুর উপরে জোর দিতে চাই যে প্রকৃতির টীকাকার-হিসেবে তিনি অদ্বিতীয় হ'লেও, মনুষ্য-সম্বন্ধে তাঁর প্রক্ষিপ্ত ভাষ্যগুলি নিতান্ত নগণ্য নয়। নীচের কবিতার পটে ছুটি বনপথের ছবি অঙ্কিত হয়েছে বটে, কিন্তু ওটির তলায় তলায় যে জৈবিক অভিজ্ঞতা অন্তঃশীলা হয়ে আছে বর্ত্তমান মনুষ্যপন্থী কাব্যে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে:

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I couldnot travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I—
I took the one less traveled by,
And that has made all the difference.

আরো উদাহরণ উদ্ধৃত করার লোভ সামলানো সহজ নয় এবং সময় ও স্থান থাকলে নমুনার পরে নমুনা গেঁথে দশবিশ পাতা ভরিয়ে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার মতের সমর্থকরূপে ওই কটাই বোধ হয় যথেষ্ট। উপরন্তু প্রবচন চয়নের পক্ষে ফ্রষ্টের লেখা অনুকূল নয়। এঁর তন্বু কবিতাগুলির তনিমা এমনি সুসম্বদ্ধ, এমনি প্রাণবন্ত যে অঙ্গচ্ছেদের পরে তাদের বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য। এইখানেই ফ্রষ্টের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক কবিদের গভীর পার্থক্য ধরা পড়ে। আজকালকার—না, শুধু আজকালকার নয়, গত দেড় শ বছরের একাধিক বিখ্যাত কবিতাকে সমষ্টিহিসেবে বিচার করা চলে

সেগুলোকে ভাবতে হয় ব্যষ্টির সংগ্রহ-হিসেবে। অবশ্য এ-কথা না-মানলে মূর্খতা হবে যে এই ধরণের ছিন্ন কাব্যকলি আজও আদর পায়, তার অধিকাংশ অনুপম ব'লেই। কিন্তু অনুপম ব'লেই মনে খটকা লাগে, সন্দেহ হয় এগুলো বুঝি আপতিক, অসার্থক। বস্তুত এগুলোর সাহায্যে সমস্ত কবিতাটির রূপ পূর্ণতর হয়ে তো ওঠেইনা, বরং অসামঞ্জস্যদোষে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। অখণ্ড অন্ধকারের মধ্যে একটিমাত্র প্রদীপ যেমন দিশাহারা পান্থকে আরো উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে, স্থিরলক্ষ্য পতঙ্গের পথচ্যুতি ঘটায়, তেমনি একটি অলোকসামান্য পদ সম্পূর্ণ কবিতার রসপ্রতিপত্তির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণ-স্বরূপ শেলির স্কাইলার্কের নাম করা যেতে পারে। একটা কবিতার মধ্যে এতগুলো অপূর্ব্ব লাইনের সমাবেশ অন্যত্র খুবই বিরল, তবু অত ঐশ্বর্য্যের মোহ কাটিয়ে পাঠক যখন কবিতাটির সীমান্তে পৌছয় তখন হয়তো শেলির অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্বন্ধে তার অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না, কিন্তু স্কাইলার্কের বক্তব্য যে কি, সে-বিষয়ে তার অজ্ঞানান্ধকার বেড়েই চলে।

বলাই বাহুল্য ফ্রষ্ট্‌কে শেলির চেয়ে বড় কবি মনে করার মতো পাগলামি আমার নেই। এখানে ও-মহাকবির নাম অবতারণা করার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে শেলির সমান সাত্ত্বিক কবিও যেখানে আপনার অসাধারণত্ব ঘোষণা করার লোভ সামলাতে পারেননি, সেখানে ফ্রষ্ট্ অদ্ভুত আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য এই দুর্ব্বলতার জন্যে শেলি সম্পূর্ণ দায়ী নন, গলদ ছিলো তখনকার কাব্যের আদর্শে। উনবিংশ শতকের কবিমাত্রেই ঠিক করেছিলেন যে অনাত্ম্য আর অবিশিষ্ট এ-শব্দদ্বয়ের মধ্যে ধ্বনিবৈচিত্র্য থাকলেও অর্থে ও-দুটি এক। সেই জন্যেই তাঁরা প্রসঙ্গের দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সমস্ত মন অর্পণ করেছিলেন কাব্যকে কবিপ্রধান ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টায়। গত শতাব্দীর কাব্য-ভাণ্ডারে স্মরণীয় লাইনের প্রাচুর্য্য এই প্রাণপণ অধ্যবসায়ের একটিমাত্র শুভ ফল। ওর অন্য ফলটি শোচনীয়, কারণ তখনকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্ররোচনাতেই কাব্য কল্পনার কারবার ছেড়ে দিয়ে বিবেকের ব্যবসায়ে নেমেছিলো। আজকের কবিরা হয়তো সর্ব্বনাশের ধাক্কায় চোখ মেলে সবে দেখতে পাচ্ছে যে অত সহজে পৈতৃক পেশা পরিবর্ত্তন করা নিরাপদ নয়, কিন্তু তাহলেও আত্মরতির মোহ এখনো ভালো ক'রে কাটেনি; তাই আজো শ্রীমতী সিট্‌ওয়েল্ একটি চমকপ্রদ উপমার জন্যে একশ লাইন ছড়া কাটতে পারেন, রোগীর জগৎ দুষ্প্রবেশ্য ব'লে গ্রেভেস্ রোগনিদানের নামে নীড়বিরাগী হন এবং সত্য-বলাকে বেণেপনার পরাকাষ্ঠা ভেবে, হাক্স্‌লি করেন পাইলেটের প্রতিধ্বনি। এঁরা সত্যকে চাননা, শিবকে চাননা, সুন্দরকে চাননা, চান শুধু স্বতন্ত্রকে, এবং যেহেতু পক্ষপাতেই স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ, তাই এঁরা কাব্যকে রসসৃষ্টির কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে নিযুক্ত করেন স্বমত-প্রচারের বাহনরূপে। এঁরা জানেন না অথবা জেনেও মানেন না যে অনাত্ম্য কাব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হ'তে পারে, কিন্তু ব্যক্তিস্বরূপের পরম সুহৃদ। কারণ এ-ধরণের কাব্যে কবির নিজস্ব ক্ষীণপ্রাণতা অমরত্বের ব্যর্থ চেষ্টায় উপহাস্য হয়ে ওঠেনা, তার নিজের অভিজ্ঞতা সার্ব্বত্রিক অভিজ্ঞতার সহযোগে সত্যই অবিনশ্বর মূর্ত্তিতে দেখা দেয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Erstes Erlebnis Von Stefan Zweig. (Insel Verlag)

রাত্রিদিবার সন্ধিক্ষণের মত মায়াময়, প্রথম প্রেমজাগরণপূর্ণ আলো আঁধার বেদনার সুস্নিগ্ধ ছায়াভরা, অজানিত গোপন আনন্দের আস্বাদন সম্ভাবনার আন্দোলনপূর্ণ, অসম্ভবস্বপ্নপূর্ণ, যৌবনদ্বার-সম্মুখে প্রতীক্ষমান কৈশোরের দ্বন্দ্ব-বেদনার সুন্দর সরস কাহিনী বিশ্বসাহিত্য খুব বেশী নেই। সেজন্য অষ্ট্রিয়ান লেখক ষ্টেফান ৎসয়াইগের "প্রথম অনুভব" (Erstes Erlebnis) নামে কিশোর জীবনের প্রথম প্রেমের অনুভূতিকম্পন-বিহ্বলতাভরা গল্পের বইখানির পৃথিবীর সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান আছে।

জীবনের এই পর্ব্বের মনস্তত্ত্ব বড় বিচিত্র। কিশোর আপন নিরালা চিত্তে কত স্বপ্নের কত বেদনার জাল বোনে। সে একা, শৈশবের খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলার বয়স তার নেই, বয়স্ক-সমাজে তার এখনও স্থান হয় নি। বয়স্কদের জগতের সামনে সে রহস্যাকুল তৃষিতভাবে চেয়ে থাকে, সে-জগৎ হতে কত মোহময় স্পর্শ, কত আনন্দময় গান তার কাছে ভেসে আসে,' সে সচকিত হয়ে ওঠে; সব অর্থ সে বোঝে না, কিন্তু অজানা সুখে অন্তর দোলে। ভোরের স্ফুটোন্মুখ পদ্মের মত তার প্রেম-চেতনা কোন বয়স্কা নারীর প্রেমের ক্ষণিক স্পর্শে হৃদয়ে উদ্দীপিত হয়, ক্ষণিক মিলনে পৃথিবী চিরন্তন স্বর্গ, প্রেমের অনাদরে জীবন অর্থহীন।

বইখানির মুখপত্ররূপে ৎসয়াইগ্ একটি ছোট কবিতা লিখেছেন:

শৈশব, তোমার সঙ্কীর্ণ কারাগারের গবাক্ষজালের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার কত অশ্রুধারা ঝরেছে, যখন আমাকে অজানা পাখী নীল সোনালী ঝলমলরূপে ডাক দিয়ে চলে গেছে বাহির হতে।

হায় রাত্রির অসহিষ্ণুতা, দ্বারের অর্গলে করাঘাতের পর করাঘাত করেছি, রক্তপাত হয়েছে, কোন অপরিপক্ক বাসনা রক্তে গর্জ্জন করে উঠেছে, সমস্ত দেহমন বিহ্বল করে—তার পর দ্বার ভেঙ্গে ফেলে সকল বাধা দূর করে বাহিরে মুক্ত দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু সে মুক্তিতে মাঝে মাঝে দুঃখ হয়। হায়, প্রথম উষার মধুর উতল ব্যাকুলতা!

"উষাতে" নামে প্রথম গল্পটি এইরূপ:

একটি কিশোর ছুটিতে স্কট্‌লণ্ডে তার এক আত্মীয়ের বাড়ী বেড়াতে গেছে—স্কট্‌লণ্ডের পাহাড়-বনের মধ্যে একটি সুন্দর দুর্গ-প্রাসাদ। সেখানে তার সঙ্গী নেই, বয়স্কেরা তাকে আমল দেয় না। সন্ধ্যাবেলা যখন খাওয়া শেষ হয়, সবাই ড্রয়িংরুমে চুরুটের ধোঁয়ার মধ্যে কফি খায়, তাস খেলে, গল্প করে, তাকে তখন শোবার ঘরে যেতে হয়। অথচ অত শীগ্‌গীর ঘুমোবার বয়স তার নয়। বাড়ীর উপবনে সে বেড়াতে বাহির হয়; মৃদু জ্যোৎস্নালোক, গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায় জড়ামড়ি হয়ে কোথাও সঙ্কীর্ণ বক্র পথ সঘন অন্ধকারময়। সেই অন্ধকার কিশোরের বড় ভাল লাগে—ওপরে চাঁদের আলো ঝরছে, তলায় গাছের পাতা-ছাওয়া বীথিতে অজানা অন্ধকার।

এক সন্ধ্যায় অন্ধকার বন-পথে যেতে যেতে সে পেছনে কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে, কোন নারীর চলার ছন্দ। কে তার দিকে পেছন থেকে এগিয়ে

আসছে, ঝরাপাতার খস্‌খস্‌ শব্দ মধুর, পথের ছোট পাথরগুলি মৃদু আন্দোলিত, চকিত চরণের তালে তার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হল; তারপর এক তপ্ত সুকোমল করের কম্পন, দুই শুভ্রবাহুর দৃঢ় আবেষ্টন, মুক্তকেশের রহস্যময় অবারণ, অজানা উষ্ণতপ্ত নিঃশ্বাস, কম্পিত ওষ্ঠের বিহ্বল চুম্বন—বিশ্বের দিশা হারিয়ে গেল! তার শিরায় শিরায় কে যেন অগ্নিধারা প্রবাহিত করে দিলে, এই তার জীবনে প্রথম নারীর চুম্বন! এই নারীর চুম্বন? এমনি মাদকতাময়, এমনি বিহ্বল আনন্দভরা!

কিন্তু যখন সে চোখ মেলে চাইল, অজানা নারী অন্তর্হিতা, দূরে তার চঞ্চল-চরণের আঘাতে চ্যুতপত্রময় ছায়াবীথিকা আকুল। কে এ অজানা? কে তাকে ভালবাসে, অন্ধকারে গোপনে তাকে চুম্বন দিয়ে প্রেমনিবেদন করতে এল? বাড়ীতে যে ক'জন নারী রয়েছেন তাদের কথা সে ভাবলে, ওই যে তিন বোন রয়েছে—কিটি, মার্‌গারেট্, এলিজাবেথ্, তাদের মধ্যে কেউ? চেষ্ট্‌নাট্‌ব্রাউন কিটি অথবা ব্লণ্ড্ মার্‌গারেট্, অথবা এলিজাবেথ্, তার চুল এত হাল্কা রঙের যে অন্ধকারে রূপার মত ঝিক্‌মিক্ করে।

পরদিন সারাদিন কিশোরের মনে এই প্রশ্ন সর্ব্বক্ষণ আন্দোলিত; দিনের বেলা কেউ তাকে আমল দেয় না, সে ছেলেমানুষ।

রাতে সেই আলোছায়াখচিত উপবনে আবার নারীচরণের মৃদুধ্বনি, স্কার্টের খস্‌খস্‌ শব্দ নুড়ির ওপর, তারপর সেই প্রাণ-মাতানো সব-ভুলানো চুম্বন! বিদ্যুতের মত ক্ষণিক; অজানা তরুণী কখন চলে গেল, কিশোর জানতেও পারলে না।

পরদিন সকালবেলা কিশোর বলে উঠল,—মার্‌গারেট্, তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

মার্‌গারেট্ তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—বব্ তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! বাজে বকিস্ না।

দিনের বেলা তাকে অবহেলা, ছোট বলে তাচ্ছিল্য কিন্তু রাতে কেন অজানা তরুণী চুম্বন দিয়ে পাগল করতে আসে। কেন সে ধরা দেয় না, তার সঙ্গে এমন নিষ্ঠুর খেলা করে।

সে-সন্ধ্যায় চুম্বন প্রদীপ্ত অগ্নিধারা, আলিঙ্গন হল উন্মত্তের মত। সমস্ত দিবসের বিহ্বল প্রতীক্ষায় অনিশ্চিত বেদনায় দেহমন মথিত হয়ে উঠল।

অজানা চুম্বনদায়িনী যখন চলে গেল, কিশোর ধীরে ধীরে বনবীথিকায় ঘুরতে লাগল। বাড়ীর কাছে এসে তার চোখে পড়ল, দোতলায় একটি ঘরে আলো জলছে, আলোয় ঝকমক জানলার কাচখানা রূপার আয়নার মত, সেই দীপ্তশুভ্রপটে মার্‌গারেটের মোহিনী মূর্ত্তি আঁকা, দীর্ঘ তন্বীবল্লরী বড় সুন্দর, উন্মুক্ত কেশ এলায়িত, মার্‌গারেটের ব্লণ্ড্ কেশ, সে যেন চাইছে, বাগানের দিকে চেয়ে আছে কার প্রতীক্ষায়!

কিশোরের বক্ষের রক্ত দুলে উঠ্‌ল। সামনে একটি গাছ স্বপ্নের মত দাঁড়িয়ে, তার একটি শাখা মার্‌গারেটের জানলার ওপর গিয়ে পড়েছে। রূপমুগ্ধ কিশোর কম্পিতপদে গাছে উঠ্‌ল, জানলার আলো বড় তীব্র, চোখ-ঝল্‌সানো! গাছে কতদূর সে উঠ্‌ল, সে জানে না, আলো তাকে দিশাহারা করছে, তার সামনে পৃথিবী যেন ঘুরছে। আলোকোজ্জ্বল গাছ থেকে সশব্দে সে অন্ধকার মাটিতে পড়ে গেল। আহত পায়ের তীব্র বেদনা নীরবে সহ্য করে, রক্তাক্ত পা ঘস্‌ড়ে ঘস্‌ড়ে কোনরকমে সে সিড়ি

দিয়ে সামনের ঘরে উঠ্‌ল, তারপর সে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল। ড্রয়িংরুমে হৈচৈ পড়ে গেল, ঘোড়া হাঁকিয়ে লোক ছুটল ডাক্তার আন্‌তে।

রাতের স্বপ্ন শেষ হয়েছে। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ভাঙা পা নিয়ে বিছানাতে শুয়ে কিশোর দিনের আলোয় স্বপ্নের জাল বোনে—মার্‌গারেট্‌ তাকে রোজ দেখতে আসে। কিন্তু কিটি এলিজাবেথ্‌ তারাও ত আসে। তারা বিছানার পাশে এসে বসে, গল্প করে। কিন্তু মার্‌গারেটকে সে ভালবাসে, সুন্দরী মার্‌গারেট্‌, রূপ্‌সী মার্‌গারেট্‌। মার্‌গারেট্‌ আসে হয়ত ক্ষণিকের জন্য, তার দেহে শরতের বনের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস, জেস্‌মিন ফুলের গন্ধ তার চুলে, তার জলজ্বল চক্ষে অগষ্ট-সূর্য্যের দীপ্তি—সেই দীপ্ত রূপ কিশোর ছুই চক্ষু ভরে পান করে, তাকে ঘিরে প্রেমস্বপ্নজাল বোনে।

কিন্তু সে স্বপ্ন একদিন ভেঙে গেল, সে জাল ছিঁড়ে গেল টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে, কিশোর জাগ্‌ল পরমবেদনায়।

এক নিরালা ছুপুরবেলা, বাহিরে রোদ ঝিমঝিম করছে, চারিদিক নিঝুম; কিশোর চোখ বুজে বিছানাতে শুয়ে। অতি ধীরে দুয়ার খুল্লে, পা টিপে টিপে তার বিছানার দিকে কে এল; কিশোর অনুভব করলে তার মুখখানি নত হয়ে পড়েছে তার মুখের ওপর, তপ্ত ব্যাকুল নিঃশ্বাস,—রাত্রির বনবীথিকার বিহ্বল মিলনের সুরভিত নিঃশ্বাস! এ কে? মার্‌গারেট্‌, নিশ্চয় মার্‌গারেট্‌!

সংশয়ে ছুলে কিশোর চোখ মেল্লে, তরুণী চকিত চরণে সরে দাঁড়াল। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্য? এ ত মার্‌গারেট্‌ নয়, এ যে এলিজাবেথ্‌। কিশোরের চোখের ওপর কে যেন একটা কালো পর্দ্দা টেনে দিলে।

এলিজাবেথ্‌ ধীরে বল্লে—বব্‌ তোমার কি ব্যথা করছে? বেদনায় তখন তার অন্তর ভেঙে গেছে। কিশোর ধীরে বল্লে—হ্যাঁ···মানে···না···আমি ভালই আছি। এলিজাবেথ্‌ চলে গেল। ভগ্নস্বপ্ন কিশোরের চোখে অশ্রুর বন্যা এল।

হায় তাকে নিয়ে এ খেলা, এ প্রতারণা কেন? মার্‌গারেট্‌ তাকে চুম্বন দেয় নি, মার্‌গারেট্‌ তাকে ভালবাসে না, আর সে যে মার্‌গারেট্‌কে ভালবেসেছে। এলিজাবেথ্‌ আগে জানায় নি কেন? তাকে কি সবাই খেলার পুতুল ভাবে!

কয়েক বৎসর পরে সে আর কিশোর রইল না, কিন্তু কৈশোরের এই ব্যর্থ প্রেম-ঘটনাটি তার সমস্ত জীবনের ওপর কালো ছাপ মেরে দিলে। মার্‌গারেট্‌ ও এলিজাবেথ্‌ ছু'জনেই বিবাহ করেছে, কিন্তু সে আর কোন দিন তাদের সঙ্গে দেখা করতেও যায় নি। কিশোর বয়সের ভগ্ন প্রেমস্বপ্নের অসহনীয় বেদনার স্মৃতি কালো মেঘের মত তার সমস্ত জীবন ছেয়ে রইল, প্রেম ও নারী তার পক্ষে ছুঃসহ, নারীর সহিত প্রেম তার জীবনে অসম্ভব। সে এখন ভ্রমণবিলাসী, বহুদেশ পর্যটন করে, স্কট্‌ল্যাণ্ডের এক জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্রথম চুম্বনের তপ্ত মদিরাভরা পেয়ালা যে খান খান হয়ে ভেঙে গেছে, তারি ছুরারোগ্য ক্ষত হৃদয় বয়ে বেড়ায়।

কৈশোর যৌবনের কোন তীব্র 'লিবিডো'র নিরোধে যৌন-জীবন বিকৃত অস্বাভাবিক হয়ে যায়, প্রথম নারীপ্রেমের ব্যর্থতার মর্ম্মান্তিক আঘাতে ভবিষ্যৎ জীবনে নারীপ্রেমের প্রতি সন্দেহ বিরাগ ঘৃণা সৃষ্টি করতে পারে, এমন বহু জীবনকাহিনী ৎসয়াইগের স্বদেশবাসী মনস্তত্ত্ববিদ্‌ ফ্রয়েড্‌ ও ষ্টেকেলের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের দপ্তরে পড়েছি। কিন্তু ফ্রয়েড্‌ বা ষ্টেকেল্‌ যে জীবনেতিহাস বৈজ্ঞানিক

মত ব্যবহার করেছেন তাঁদের কোন থিওরি-প্রমাণের মালমসলারূপে, সেই ঘটনা থেকে ৎসয়াইগ্‌ করেছেন রস সৃষ্টি। তিনি কোন বিশ্লেষণ করেন নি, তিনি চেয়েছেন অন্তরের বেদনাকে বাণী দিতে, তাঁর ভাবব্যঞ্জক ভাষার ছন্দময় গতিতে, কথাচিত্রের সৌন্দর্য্যে, রসময় উপমায় তিনি কিশোরমনের সুখছুঃখকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেজন্য তাঁর ঘটনার বর্ণনা হয়েছে সাহিত্য।

বইখানির তৃতীয় গল্প "অগ্নিময় রহস্যকথা" বইখানির শ্রেষ্ঠ গল্প, অসামান্য শক্তির সহিত লিখিত।

গল্পটি হচ্ছে: এড্‌গার্‌ বলে একটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে সেমেরিংতে বেড়াতে গেছে, তাদের হোটেলে একটি ব্যারণ এলেন একা। ব্যারণটি এসে এড্‌গারের সঙ্গে খুব ভাব করলেন। একজন বড় ব্যারণ তার মত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে, এড্‌গার্‌ ত গর্ব্বে সুখে উৎফুল্ল। কিন্তু এড্‌গারের সঙ্গে ভাবের সূত্র ধরে ব্যারণটি যখন তার মায়ের সঙ্গে বেশ আলাপ জমিয়ে নিলেন, তখন এড্‌গার্‌কে আর তিনি আমলই দিতে চান না। এমন কি এড্‌গার্‌কে একা হোটেলে রেখে ব্যারণ ও তার মা বেড়াতে যাবার ফন্দী করতেন, কিন্তু এড্‌গার্‌ বার বার তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিত; তাঁরা বেড়াতে বাহির হলেই সে কোথা থেকে এসে জুটত, মায়ের হাত ধরে চলত।

ব্যারণের ওপর বিদ্বেষে তার প্রাণ জলে যেতে লাগল, তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল, আর মায়ের ওপর তার হল ছুর্জ্জয় রাগ। রাতে খাওয়া শেষ হয়ে গেলে, তাকে ঘরে শুতে যেতে হত, আর তার মা ও ব্যারণ ড্রয়িংরুমে বসে কত হাসাহাসি, কত গল্প করতেন। বিছানাতে শুয়ে তার ঘুম আসত না, যতক্ষণ না তার মা আসতেন ততক্ষণ সে জেগে থাকত।

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে সে মায়ের প্রতীক্ষা করছে, ঘরের বাহিরে করিডরে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, ভীত কণ্ঠস্বর—না, আজ নয়। নিশ্চয় ব্যারণ মাকে কোন বিপদে ফেলবে, বিছানা থেকে লাফিয়ে দরজা খুলে জল্‌জ্বল্‌ চোখে সে দেখলে, অদূরে তরল অন্ধকারে তার মার হাত ধরে ব্যারণ, মাকে বোধহয় কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোন বিপদের মধ্যে! ক্ষিপ্ত সিংহশিশুর মত এড্‌গার্‌ ব্যারণের ওপর ছুটে ঝাঁপিয়ে পড়ল, আঁচড়ে, খিমচে, কামড়ে, ঘুসি মেরে মরীয়া হয়ে সে ব্যারণকে আক্রমণ করলে, বহুদিনের সঞ্চিত বিদ্বেষ হিংসা মুক্তি পেলে। ব্যারণ প্রথমে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তাকে ঘুসি মারলেন, নিরুদ্ধ ক্রোধ তাঁরও অন্তরে জমা ছিল। কিন্তু এই ছোট ছেলের সঙ্গে মায়ের সামনে মারামারি কত লজ্জাজনক বুঝতে পেরে ব্যারণ কিছুক্ষণ পরে ক্ষুব্ধচিত্তে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

পরদিন প্রভাতেই ব্যারণ হোটেল ছেড়ে চ'লে গেলেন। কিন্তু এড্‌গারের মন শান্ত হল না, মায়ের সঙ্গে তার সহজ প্রেমের স্বাভাবিক সম্পর্ক যেন আর নেই। তার চিত্ত চঞ্চল। হোটেল ছেড়ে একা সে বাহির হ'য়ে পড়ল, সে পালিয়ে যেতে চায়, কোথাও চলে যেতে চায়। ষ্টেশনে গিয়ে এক টিকিট কিনে সে ট্রেণে চেপে বসল; সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যেবেলায় তার ঠাকুমার বাড়ীতে এসে হাজির।

এদিকে সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, এড্‌গার্‌ হোটেলে ফিরল না, তার মায়ের মন চিন্তায় আকুল। আশঙ্কায় দিশাহারা হ'য়ে তিনি এড্‌গারের বাবাকে টেলিগ্রাফ করলেন।

ঠাকুমা যখন খবর দিলেন, এড্‌গার তাঁর কাছে এসেছে, মা তখন নিশ্চিন্ত হলেন। বাবা এসে যখন এড্‌গারকে জিজ্ঞাস করলেন, কেন সে অমন একা চলে গেল, তার মনে কি দুঃখ, কি কারণে সে পালাল, এড্‌গার্ কিছুতেই কোন উত্তর দিলে না। তার মা ও ব্যারণের মধ্যে ব্যাপারটা তার বালকচিত্তে সম্পূর্ণ না বুঝলেও সে এটা বুঝেছিল যে এ ঘটনা তার বাবাকে বলা ঠিক হবে না। সে কোন কথা কিছুতেই বল্লে না। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আবার মা ও পুত্রে মিলন হল।

এড্‌গারের অভিমান, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা, হতাশ্বাস, উদাসভাব, বালকমনের সুখদুঃখের দ্বন্দ্ব ছন্দময় কবিত্বপূর্ণ ভাষায় সুন্দররূপে বর্ণিত হয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যে বালকমনস্তত্ত্বের একটি শ্রেষ্ঠ গল্পরূপে স্থান পেতে পারে এই গল্পটি।

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মরুমায়া—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র মোহন বাগচী, ৪৭, মনোহর-পুকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

বালুচর—জসীমুদ্দীন, প্রকাশক ডি, এম্‌, লাইব্রেরী।

"মরীচিকা"র কবি যতীন্দ্রনাথের নতুন বই "মরুমায়া" হাতে নিতেই আমার কানে তাঁর পুরাতন কাব্য-ঝঙ্কারের রেশ বেজে উঠল। সে ঝঙ্কারে যে বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে তা বিশ্ব-সাহিত্যে নতুন কিনা জানিনে, কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে খুবই অভিনব। জীবনের সুখের বীথিতে ও প্রকৃতির মোহন কাননে তিনি কোন কবিতা-কুসুম চয়ন করেননি, দুঃখের বর্ষণ নামিয়ে হাহাকারের বন্যা বহাননি, তিনি বিশ্বের ফাঁকিকে ধ'রে দিয়ে তাকে শ্লেষ-বিদ্রূপের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করেছেন, রুক্ষ নির্ম্মম ভর্ৎসনায় অন্ধবিশ্বাসের খলতা ও ছলনাকে পঙ্গু করেছেন। যাকে সকলে চিরদিন স্তুতি ক'রে এসেছে অথচ যা' শুধু ছায়াবাজি তার মায়াজাল ছিন্ন করবার জন্য তিনি ধর্ণা দেননি দার্শনিকের তর্ক বিতর্কের হেঁয়ালির দ্বারে, তার বদলে স্পর্দ্ধা ক'রে তাদের বেশ স্পষ্ট কথাই শুনিয়ে দিয়েছেন। এই স্পর্দ্ধাই তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই স্পর্দ্ধার আক্রমণ থেকে কোন প্রতারকই বাদ যায়নি; যে ভগবান মানুষ ও তার বাসনা, আশা, প্রেরণা তৈরি ক'রে তাকে আবার নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য সীমায় আবদ্ধ করেছেন যিনি সাড়ে তিন হাত জীব তৈরি ক'রে আড়াই হাত পরিমিত কুঠরির মধ্যে পূরে রেখেছেন, "ঘোড়া পিটাইয়া গাধা" করতে যিনি পাকা ওস্তাদ, সেই ভগবানও তাঁর স্পর্দ্ধার আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাননি। এই স্পর্দ্ধা অভিনব কাব্যরূপে তাঁর কবিতায় মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। তাঁর পূর্ব্বতন লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না:—

জলদগর্জ্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি আঁখি
শোন মোর কথা—ও সবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি!

ও তর্জ্জনের অর্থ বুঝিতে হয়না আমার ক্লেশ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ!

চারিপাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব কারা!
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা;
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাচা, কাদাখোঁচা।

সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি
ঝাওড়া তলায় ফুটে চেয়ে থাকে সখের সূর্য্যমুখী!
বন্ধু আমারে খাট পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা,—বিদ্রূপ ক'রো নাক'।

(মরীচিকা)

এইখানে বলা দরকার এই যে ভণ্ডতাকে কষাঘাত এ শুধু শাসনের খাতিরে নয়, ভণ্ডতা যে ব্যর্থতার ক্ষতকে গোপন ক'রে রাখে,—মায়া যে তৃষিত চিত্তকে শুধু মরু-পথেই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তাই খুলে দেখাবার জন্য।

আকাশ তার আলোগুলি নিত্য ধরে জ্বেলে,
নিবিয়ে রাখে প্রাণের মাঝে আঁধার শত শত।
অগ্নিগিরি পথের সোনা উগরে ফেলে ঢেলে,
দেখায় না যে বুকের মাঝে গভীর কত ক্ষত!

এইরূপে যেমন একদিকে মিথ্যা মায়া ও বিধাতার প্রতারণা কবির চাবুকের ঘায়ে আহত হয়েছে তেমনি তাঁর কবিতার মধ্যে একটি প্রবাহিত করুণার ধারা আর একদিকে জগতের দুঃখ ও বিড়ম্বনাকে, জগতের হীন, হেয় ও তুচ্ছকে অভিষিক্ত করেছে। এইরূপে শ্লেষ-বিদ্রূপের মলিন আবরণের উপরে অনুকম্পার শুভ শুভ্র কিরণ সম্পাত হয়েছে —

ধু ধু করে মরুভূমি যত চলি জীবনে,
  মরীচিকা পিছাইয়া যায়;
শুধু দাহ শুধু তাপ এ মানব ভবনে,…
  কোথা প্রেম নিত্য রস পায়?

টানাটানি ঠেলাঠেলি পথ যায় হারায়ে
  মরণের নাহি মিলে পার;
অসীমের বেড়া দেওয়া নিদারুণ কারা এ,
  কেন প্রেম আনে মিছা ছাড়?

(মরীচিকা)

কিন্তু "মরুমায়া" পড়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হ'তে হ'ল কেননা "মরুমায়া"র কবিতায় তাঁর সেই মারকামারা শ্লেষ ও স্পর্দ্ধা স্তিমিত। যেটুকু আছে সেটুকু যেন কায়াহীন ছায়ামাত্র। "বিভীষণ" কবিতাটির—

ভাই নিয়ে এল হরণ করিয়া পরের পরমা নারী;
প্রজার মাঝারে কামুক রাজার চরম কেলেঙ্কারী!

চুপ কোরে যদি দেখি,
বল তবে আজ, তোমাদের মতে উচিত হইত সেকি ?

অথবা "শরশয্যায় ভীষ্ম"-এর উক্তি—

নির্ব্বাক্ হ'য়ে ভাবিতেছিলাম—কোন্ লজ্জাটা ভারী ?
—পাশা জিনে' রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী,—
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে ?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্ম্মূল।
তাই সহিলাম ফাল্গুনী যবে প্রতি ভুল গুণে' গুণে',—
রোমে রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব্ব শরের বর্ম্ম বুনে'।

এগুলি শ্লেষোক্তির পরিবর্ত্তে আত্মধিক্কারের দিকেই ঝুঁয়ে পড়েছে। আরও অনেকগুলি কবিতা আছে যাতে শ্লেষের ইঙ্গিত স্পষ্ট কিন্তু বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। আমার মনে হয় এটা একটা মস্ত ক্ষতি কেননা আগেই আমি বলেছি যে অন্য কবিরা যেমন বরণ করেছেন জীবনের সুললিত সারটুকু, যতীন্দ্রনাথ বরণ করেছিলেন তার বিড়ম্বিত, ব্যর্থ, ব্যথিত ইঙ্গিতটুকু, তাই তাঁর ভাষায় ছিল এতটা ভৎ'সনা, উপমায় এতটা কটুতা। আজ তাঁর লেখায় এগুলি লুপ্ত হ'তে বসেছে। অপরদিকে কিন্তু তাঁর প্রাণবান করুণাধারা ও অনুকম্পা এখনও আগের মতই স্বচ্ছন্দগতি, বরং তার হয়েছে আগের চেয়েও সুস্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর। যেখানে তাঁর এ স্নেহরস স্পর্শ করেছে সেখানে কবিতা হয়েছে কাব্যরসে পরিপূর, নিটোল।

শ্যাম পাতে ঢাকা শ্বেত কিসলয়, তাহে ঢাকা পীত রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।

এ উদাহরণের পর আর ওকালতির দরকার হয় না। যে কুসুমের ওপর এই কাব্য-গুঞ্জন সে হ'ল "কেতকী"। কেতকী-সম্পর্কে আমার একটু পক্ষপাত থাকতে পারে, কেননা কবির মত আমিও কেতকীর অনুরক্ত ; তাঁর মত আমিও রাস্তার মোড়ে ফিরিওলার কাছ থেকে বর্ষার দিনে কেতকী কিনে এনে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে তার বিরল কিন্তু অনুপম গন্ধে মশগুল হয়ে যাই। কবি কিন্তু আমার চেয়ে বেশী টলেছেন, কেননা কেতকী গন্ধে মাতাল হ'য়ে তিনি একেবারে স্বপ্নের বাহুবন্ধে ধরা দিয়েছেন—

যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে !
আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সর্ব্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি,—
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা !
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্তো !
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে' মৃত কেতকীর গন্ধ !
হাঁকিল পাহারা,—উঠি ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি,—
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি !
কাঁটা বিঁধে' হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমার মনের ভুল ;
দুপ'র রাতের ঘুম মাটি করে দু'পইসে কেয়াফুল !

বক্তব্য-শেষে আমি "মরুমায়া" থেকে আর একটি উদাহরণ দিতে চাই যাতে কবিকৃত কাব্যরস ও করুণার অপূর্ব্ব সন্ধি অপরূপ প্রকট হয়েছে।—

ও শাঁওনের রাতি যেয়ো না !
শঙ্কা-বিকল প্রাণে ক্রন্দনে অভিমানে
ওই গান বই আর গেয়ো না !
র'য়ে র'য়ে সন্ সন্ অশান্ত সমীরণ
চম্ চম্ তড়িৎ চমক !
গর গর গর্জ্জে গুরু দেয়া তর্জ্জে,
চিতে লাগে ভীতির ধমক।
কান পেতে শোন দেখি গগন-অরণ্যে কি
গর্জ্জে শাবক-হারা বাঘিনী ?
ও কোন্ বেদিনী মেয়ে অমন কাঁদুনি গেয়ে
খেলাইছে বিদ্যুৎ-নাগিনী !

এই শেষোক্ত কবিতার ছন্দের ধ্বনি কাউকেই এড়িয়ে যাবে না। কিন্তু এই রকম দু'একটি বাদ দিলে বলতেই হবে মরুমায়ায় ছন্দের দারিদ্র্য রয়েছে। বেশীর ভাগ বিশমাত্রিক বৈচিত্র্যহীন। বাকিগুলির মধ্যে সরসতা লক্ষ্য হয় না ; তারই মধ্যে একটিতে একটু নূতনত্বের আমেজ পাওয়া গেল, সেটি থেকে এইখানে একটু উদ্ধৃত করলুম।

যেতে বাজায়ে উপলঝাঁঝ চপল নাটে
চির- দুরন্ত ঝর্ণাও পা টিপে হাঁটে ;
যেই পথের ধারে
প'ড়ে পথের পাষাণ
চির চোখের ধারে
করে দুখের আসান্ ;
যেই অচল পথ চলায় পিছল অধিক,
সেই পাওটা-পথের এক হ'ব গো পথিক।

জসীমউদ্দীনের "নক্সীকাঁথার মাঠ" কাব্যসাহিত্যে যে আশার সঞ্চার করেছিল, আমার মনে হয়, তা' "বালুচরে" কবি বজায় রাখতে পারেননি। "বালুচরে"র কবিতাগুলি নানা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি প্রায় একই সুরে একই ছন্দে বাঁধা, একই বক্তব্যে নিঃশেষিত। এই সুরটি বিগত বিনষ্ট প্রেমের আরাধনার সুর। কবিতাগুলির নামও এর প্রচুর পরিচয় দেয়—যথা, "কাল সে আসিয়াছিল," "তোমারে ভুলেছি আজ", "দুরাশা", "বিদায়", "কবির সমাধি" —ইত্যাদি। একটি কবিতা পুরোপুরি তুলে দেওয়া যাক, যা' থেকে এ সুরটির স্বরূপ হবে—

শূন্য নদীর কূলে
আমার বেদনা দুটি তট বেড়ি কাঁদিতেছে কূলে কূলে।
উতল বাতাস পাখা নড়িতেছে ব্যাকুল বেণুর শাখে
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধূলি মাখে।

গগন রেখার চক্র ধরিয়া বৃথা কাঁদে দূর বন,
সেই নির্ম্মম কভু পরিল না সবুজের বন্ধন।
মিছে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে বাঁধিয়া ডানা,
সে দূর আজিও পাখার বাসরে আনেনি আকাশখানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটির ধরায় সবুজের আলপনা
কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পরিল না।

—"দুরাশা"

বালুচর ও কাশবনময়ী প্রকৃতি কবির বেদনায় বিধুর, তারই চিত্র "বালুচরে" পরিস্ফুট হয়েছে। এইটিই জসীমুউদ্দীনের লেখার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিকে—বালুচরের প্রকৃতিকে—তিনি একেবারে নিজের করে নিয়েছেন, তার মাঝে তিনি সম্পূর্ণ আত্মহারা —এইখানে তাঁর জয়। আর একটি উদাহরণ দিই,—

কেন তুমি সখা মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি!
বিশ্বজোড়া এ রূপ পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি'!
আমি কাঁদি সখা কেন তুমি নাহি আকাশের মত হ'লে—
যেথানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে।
আকাশের তলে ঘর
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।
তুমি কেন সখা কানন হ'লে না ফুলের সোহাগ পরি'
রঙীন তোমার দেহ-নীপখানি পুলকে উঠিত ভরি'!
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত তৃষা মিটায়ে দিতাম অনন্ত পাওয়া সনে।

রবীন্দ্রনাথ এঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন "অতি সহজে যাদের লিখবার শক্তি নেই এমনতর খাঁটি জিনিষ তারা লিখতে পারে না।" এ কথার সার্থকতার নিদর্শন "বালুচরে" বহুবার পাওয়া যায়, তথাপি একই কথা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার দরুন বইখানির রসাস্বাদ গ্রহণ মন্দীভূত হ'য়ে আসে। কাব্য-সম্পদে সঙ্গতিহীন এ কথা আমার বক্তব্য নয় কেননা বহুতর পদে, বহুতর স্থানে কাব্যরস ভরে আছে কিন্তু অসার করেছে এই কাব্যসম্পদকে কবির একটা অতিমাত্রিক ভাবালুতা। একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রন্দন ও আপশোষের পালাও পরিতৃপ্তিতে বাধা দিচ্ছে। জায়গায় জায়গায় অর্থহানিও হয়েছে। ছন্দ সাধারণতঃ একঘেয়ে, কোথাও বৈচিত্র্য নেই। আজ শুধু এই কথা বলে আমি "বালুচর"কে বিদায় দিলাম যে "বালুচরে"র কবির শ্রেষ্ঠতর লেখার জন্য আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব।

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

Sur les Traces du Bouddha, René Grousset—(Paris, Librarie Plon)

যাঁরা রিসার্চ বা কোন বিষয়ের বিশেষ আলোচনা করেন তাঁরা সব দেশেই অনেকটা কোণঠাসা হ'য়ে থাকেন। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে যে তাঁদের লেখা অতি নীরস এবং তাদের লেখা প্রবন্ধ বা বই এত পারিভাষিক

যে সেগুলি মোটেই সুখপাঠ্য নয়। কিন্তু সব দেশেই কতকগুলি লেখক থাকেন যাঁরা সেই সব বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সরস ভাষায় চিত্তাকর্ষক ক'রে সাধারণের সামনে উপস্থিত করেন; রেনে গ্রুসে (Réné Grousset) হলেন সেই দলের একজন। তাঁর কলমের বেশ জোর আছে—আর্ট ও দর্শনে তাঁর সমান দৃষ্টি। প্রাচ্য সভ্যতা বুঝবার ও নিজদেশবাসীদের তা' ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্যই তিনি অনেকদিন ধ'রে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত ক'রে আস্‌ছেন। তাঁর বইয়ের ভিতর—Histoire de l' Extrême-Orient, Les Civilisations de l' Orient ও Histoire de l' la Philosophie orientale হচ্ছে প্রধান। বইগুলি ইতিহাসের ছাঁদে লেখা হ'লেও মোটেই নীরস নয়—কারণ ফরাসী পণ্ডিতদের মতে ইতিহাস শুধু রাজাদের রাজ্যকাল ও দিগ্বিজয়ের গল্প নিয়ে তৈরি হয় না; রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামোতে দেশের সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশ দেখানোই হচ্ছে তাঁদের মতে ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রুসের ইতিহাসও সেই ধরণের লেখা—সেই জন্য তাঁর সব বইগুলিই চিত্তাকর্ষক।

সম্প্রতি গ্রুসের একখানি নূতন বই বেরিয়েছে—Sur les Traces du Bouddha অর্থাৎ "বুদ্ধের চরণচিহ্ন অনুসরণে"। এ বইখানি যদি আমাদের সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে তাহ'লে খুবই দুঃখের বিষয় হবে; কারণ প্রাচীন ভারতের সব চেয়ে গৌরবের যুগ-সম্বন্ধে এমন বই আর এ পর্য্যন্ত কেউ লেখেননি।

লেখক বুদ্ধের চরণচিহ্ন অনুসরণ ক'রে এসিয়া পরিভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর পথপ্রদর্শক হয়েছেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়ান-চাং (Hiuan Tsang) ও ই-চিং (Yi-tsing)। প্রাচীনকালে এসিয়ার যে যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সেই সঙ্গে ভারতের আর্ট, সাহিত্য ও দর্শন গিয়েছিল, সেই সেই দেশই তিনি চীনা পরিব্রাজকদের চোখে দেখ্‌ছেন ও সেগুলির অধিবাসী, সমাজ, ধর্ম্ম, ভাস্কর্য্য ও সুকুমার শিল্প প্রভৃতিকে জীবন্ত ক'রে আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত করছেন। তাঁর এই বর্ণনায় যে সব দেশ স্থান পেয়েছে তা'র ভিতর মধ্যএসিয়ায় তুর্ফান (Turfan), কুচা (Kucha), খোটান (Khotan), আফগানিস্থানে বমিয়ান (Bamiyan), কপিশা (Kafiritan), নগরহার ও গান্ধার, ভারতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রগুলি. ও পূর্ব্বসমুদ্রপথে শ্রীবিজয়, যবদ্বীপ, কম্বুজ ও চম্পাই প্রধান। এই হচ্ছে বৃহত্তর ভারতের গণ্ডি, তাই আজও মধ্য এসিয়াকে Ser-India এবং ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তের দেশগুলিকে Indo-China বা Further India এবং দ্বীপপুঞ্জকে Insulindia বা Insular India বলা হয়। ভারত তার প্রাচীন গৌরব হারিয়েছে—কিন্তু ঐ সব দেশের সভ্যতার গঠন-কার্য্যে ভারতের প্রভাব আজও বিদ্যমান।

এই সব দেশের সভ্যতার চিত্রাঙ্কনে গ্রুসে যে শুধু চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণের উপরই নির্ভর করেছেন তা' নয়—গত শতাব্দী থেকে আজ অবধি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সব দেশ-সম্বন্ধে যত আলোচনা করেছেন তা'ও কাজে লাগিয়েছেন। এর উপর চিত্রাঙ্কনে তাঁর নিজের বিশিষ্ট প্রতিভাও রয়েছে।

এই সব দেশ অনুপ্রেরণা পেয়েছিল প্রাচীন ভারতের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার কাছে। গ্রুসে মনে করেন যে ভারতের এই প্রতিভা পূর্ণবিকাশ লাভ করেছিল

বৌদ্ধধর্ম্মকে অবলম্বন ক'রে। তাই গ্রুসের মতে বৌদ্ধযুগ হচ্ছে জগতের ইতিহাসে একটা বড় কল্প, আর খৃষ্টীয় সপ্তম শতক হচ্ছে সেই কল্পের সবচেয়ে স্বর্ণীয় যুগ। তখন ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতার সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু এসিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে ভারত ও চীনদেশকে অবলম্বন ক'রে সমস্ত জাতির রাজনৈতিক, [illegible] শিল্প ও ধর্ম্মজীবন অপূর্ব্ব প্রাণসঞ্চারে শক্তিমান হ'য়ে উঠেছে।

এই সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ও চীনদেশের সংযোগ বিধান ক'রে সিংহল থেকে জাপান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে যে এক নূতন humanismএর স্রোত বইয়ে দিয়েছিল, তা'র গতি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতক পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ছিল। [illegible] ধ'রে ধ্যান ক'রে বৌদ্ধ সাধক তা'র আত্মাকে যে স্তরে উন্নীত করতে পেরেছিল তা এখনো আমাদের কল্পনার অতীত।

এই humanismএর ভিতর দিয়েই ভারতীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বে এক নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল এবং তারই অনুপ্রেরণা পেয়ে বৌদ্ধজগতে যে ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সৃষ্টি হয় তা' দেখে আজও সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ। ভারতে অজন্তা, যবদ্বীপে বোরোবোদর (Borobodor), জাপানে হোরিয়ুজী (Höriyuji), চীনে ইউন্-কাং (Yun-kang) ও মধ্যএসিয়ায় তুন-হোয়াং (Tun-huang) তা'রই চরম সাক্ষ্য।

এই অপূর্ব্ব আর্টসৃষ্টির মূলে যে বৌদ্ধসাধকের ভক্তি ও [illegible] নিহিত ছিল তা গ্রুসের ন্যায় পাশ্চাত্য লেখকের অন্তরেও এক অভিনব বেদনা সঞ্চার করেছে—তাই তিনি অজন্তার আর্টে শান্তিদেবের মত ভক্ত কবির বাণীর অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পেয়েছেন। আমরাও শান্তিদেবের সেই অপূর্ব্ব কবিতার অনুবাদ দিয়েই গ্রুসের বইয়ের আলোচনা শেষ করব।

শান্তিদেব বোধিচর্য্যাবতারে বল্‌ছেন—"আমার চিত্তকে সম্যক্ উদ্ভাসিত করবার জন্য তথাগতদের পূজা করব—নির্ম্মল ধর্ম্মরত্ন ও নানা গুণের আকর কুলপুত্রদেরও পূজা করব।

"সারা জগতে যে সব ফুল-ফল ও লতা-পাতা আছে, যে সব রত্ন ও যে সব সুস্বাদু জল আছে, নানা রত্নে পরিপূর্ণ যে সব পর্ব্বত, চিত্তহরণকারী যে সব বনপ্রদেশ, সুশোভন পুষ্পাভরণে মণ্ডিত যে সব লতা, সুকুমার ফল-ভারে নম্রশাখ যে সব বৃক্ষ, দেবলোকের যে সব গন্ধধূপ ও রত্নময় কল্পতরু, নানা বর্ণের কমলে শোভিত যে সব সরোবর, মনোহরণকারী যে সব হংস-কলধ্বনি ও প্রকৃতিজাত যে সব শস্য আছে, এই সব পূজাসম্ভারের মধ্যে যা' এখনও অন্যের লোলুপদৃষ্টিতে মলিন হয়নি—সেই সব দিয়ে আমি তাঁদের মানসপূজা করব। তাঁদের নিকট এসব অর্ঘ্য তুচ্ছ হ'লেও করুণাময় তাঁরা এসব গ্রহণ করবেন, কারণ আমি পুণ্য-দরিদ্র, এ ছাড়া আমার আর কোন অর্ঘ্য নেই।

"যে সব সুগন্ধময় স্নানগৃহ উজ্জ্বল স্তম্ভের উপর স্থাপিত, যা'র বিতানগুলি মুক্তার ঝলকে উদ্ভাসিত, যা'র কুট্টিম স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল স্ফটিকে খচিত, যার [illegible] মনোহারী গন্ধোদক ও পুষ্পপূর্ণ কুম্ভে সজ্জিত—সেই সব স্নানগৃহে আমার [illegible] সুরযোগে তাঁদের স্নান করাব। আমার সেই দেবতাদের তনু অগুরুগন্ধে আমোদিত [illegible] ধৌতধবল দুকূলে মুছিয়ে দেব ও শোভনরাগে রঞ্জিত, সুবাসিত চীবরে [illegible] ক'রে দেব।

"দিব্য মসৃণ ও বিচিত্র বস্ত্র এবং অলঙ্কারে আমি সমন্তভদ্র, অজিত ও মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি লোকেশ্বরদের সজ্জিত করব। সারা ভুবনকে যে গন্ধ আমোদিত করতে পারে সেই গন্ধই আমি তাঁদের স্বর্ণপ্রভ উজ্জ্বল তনুতে লেপন ক'রে মন্দার, উৎপল, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধময় ফুল ও সুগ্রথিত মালা দিয়ে তাঁদের অর্চ্চনা করব।"

বৌদ্ধ চিত্রকর ও ভাস্করের হৃদয়ও এই অনুভূতিতেই উদ্বেলিত হয়েছিল—তাই অজন্তা ও হোরিয়ুজীতে এই চিত্রেরই আনুবর্ণিক প্রতিলিপি পাওয়া যায়—ইউন-কাং ও তুন হোয়াং-এর ভাস্কর্য্যেও এরই প্রতিচ্ছবি। গ্রুসে নিজে আর্টিষ্ট—তাই বৌদ্ধ আর্টের এই চরম অভিব্যক্তি অঙ্কিত করাই তাঁর বইয়ের প্রধান লক্ষ্য হয়েছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী, এম্-এ। শরচ্চন্দ্র এণ্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন, কলিকাতা।

বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য হইতে রবীন্দ্রনাথের, কিম্বা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবান্বিত, রচনাবলী বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা বাংলা ভাষায় বিরল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে লিখিত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথ' বোধ হয় বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে আলোচনার একমাত্র দৃষ্টান্ত। কিন্তু গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে গদ্যে ও পদ্যে রবীন্দ্রনাথের এত রচনা প্রকাশিত হইয়াছে যে অজিতচন্দ্রের ক্ষুদ্র পুস্তকটিকে এখন আর ব্যাপক বলা চলে না। অজিতবাবু ছাড়া আরো কেহ কেহ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। বিশ্বপতিবাবুর এই পুস্তকটিতেও সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নাই। কিন্তু পুস্তকটির নাম দেখিয়া ধারণা হয় যে সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য না হইলেও রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য। যতদূর জানি এই উদ্দেশ্যে বাংলা-ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর একটি পুস্তক রচিত হইয়াছে—কাজী আব্‌দুল ওদুদের 'রবীন্দ্র-কাব্য-পাঠ'।

'কাব্যে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকটির মুদ্রণ ও গঠন-সৌষ্ঠব উল্লেখযোগ্য। মনে হয় মলাটের উপরকার চিত্রটি কবির আকৃতি অবলম্বনে অঙ্কিত; কিন্তু কেহ যেন ইহাকে কবির প্রতিকৃতি বলিয়া ভুল না করেন, কেননা, ইহা প্রতিকৃতি নয়, পরিকল্পনা।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে পাঠকগণের নিকট তাঁহার বক্তব্য নিবেদন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে রসবিচার এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ দুয়েরই প্রয়াস আছে"। 'রসবিচার' অবশ্য বোধগম্য, কিন্তু 'তত্ত্ববিশ্লেষণ'ও কি কাব্যালোচনার অপরিহার্য্য অঙ্গ? কিন্তু বিশ্বপতিবাবু যখন 'দুয়েরই প্রয়াস' করিয়াছেন, তখন কি ভাবে তিনি এই প্রয়াস করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য।

পুস্তকটি তিন ভাগে বিভক্ত—রূপজগৎ, অরূপের পথে, অরূপ। 'রূপজগৎ' অংশটির আবার দুই ভাগ আছে—নিসর্গ ও নারী। এই পাঁচটি বিভিন্ন অং

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের, শুধু পাঁচটি বিভিন্ন ধারা নয়, পাঁচটি বিভিন্ন স্তর নির্দেশ করিয়াছে, পুস্তকটিতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়। এইখানেই আমার প্রথম আপত্তি। কোনো বড় কবির সমগ্র কাব্যকে এইভাবে কতকগুলি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা চলেনা। অবশ্য এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য বিশ্বপতিবাবু নজির দেখাইতে পারেন। নজিরমাত্রই যে মানিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই; কিন্তু যদি নজির মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলেও এই প্রশ্ন উঠে, এই শ্রেণীবিভাগে গ্রন্থকার যে ক্রমপরিণতির ইঙ্গিত করিতেছেন, তাহা কি ঠিক? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কাব্য একদা নিসর্গ ও নারীর বন্ধনে রূপজগতে আবদ্ধ ছিল, তাহার পর একদিন মুক্তিলাভ করিয়া তাহা অরূপের পথে যাত্রা করিল এবং অবশেষে গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়া অরূপের প্রেরণায় তাহা নবরূপ পরিগ্রহ করিল—ইহাই কি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রমপরিণতির ধারা?

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে নারী সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন; 'কড়ি ও কোমল', 'মানসী', 'ক্ষণিকা', 'উৎসর্গ', 'পূরবী', 'মহুয়া' এবং হয়তো 'সোনার তরী', 'চিত্রা' ও 'বলাকা'ও তাহার প্রমাণ। এমন কোনো বয়স নাই যখন রবীন্দ্রনাথ নিসর্গ সম্বন্ধে কবিতা লেখেন নাই। যদি তাঁহার বিপুল ও বিচিত্র কাব্যের কোনো একটি মূল সুর নির্দ্দেশ করা যায় তাহার প্রেরণা নিশ্চয়ই নিসর্গ। কিন্তু একথাও সত্য যে তাঁহার পরিণত বয়সের নিসর্গ-কবিতাগুলির মধ্যে অসীমের এবং অরূপের উপলব্ধি যেটুকু লাভ করিয়াছ, তাহা তাঁহার কৈশোরের বা যৌবনের কবিতায় দুর্ল্লভ। কিন্তু সে যাহাই হউক না কেন, কোনো কবির কাব্যকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে বুঝিতে হইলে, বোধ হয় ইহার স্বাভাবিক ক্রমপরিণতির ধারাকে অবলম্বন করিয়া ইহার আলোচনা করাই শ্রেষ্ঠ উপায়। দুঃখের বিষয়, বিশ্বপতিবাবু তাহা করেন নাই। তাই তাঁহার রচনায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রমপরিণতির উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার ধারণা একেবারে স্পষ্ট হয় নাই।

বিশ্বপতিবাবুর আলোচনা-রীতি কবির বিভিন্ন বয়সে রচিত বিভিন্ন কবিতার অংশ উদ্ধার করিয়া তৎসম্বন্ধে মন্তব্য করা। মন্তব্যের উদ্দেশ্য অবশ্য রসবিচার ও তত্ত্ববিশ্লেষণ। বিচার ও বিশ্লেষণ বিশ্বপতিবাবু প্রাণপণে করিয়াছেন, কিন্তু কবির কাব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে পাঠকের মনে তাহাতে কোনোই ধারণা হয়না। তাহার কারণ, কাব্যালোচনার প্রাণ রসবোধ; বিশ্বপতিবাবুর রচনায় রসবিচারের কঠিন প্রয়াস থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, তাঁহার রসবোধ তত্ত্ববিশ্লেষণের উৎপীড়নে প্রায় লোপ পাইয়াছে। আরও একটি কারণ আছে। কোনো বড় কবির সমগ্র কাব্যের আলোচনা এরূপ খণ্ড খণ্ড ভাবে করা চলেনা। একথা সত্য যে কোনো শিল্পসৃষ্টিকে বুঝিতে হইলে তাহাকে দেশকালের গণ্ডি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার অখণ্ড সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যে তাহার স্বরূপের সন্ধান করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো একটি কবিতার আলোচনা এই রীতিতে করা চলে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার বিশেষ বিশেষ অংশ বাছিয়া লইয়া, কবির জীবনের বিস্তৃত পটভূমি হইতে, কবির তাঁহার কাব্যের ক্রমপরিণতির স্বাভাবিক ধারা হইতে এইগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটি বিশেষ পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিলে এবং এই উদ্ধৃত অংশগুলির উপর নির্ভর করিয়া নিসর্গ বা নারী বা অরূপ রবীন্দ্রনাথের মনকে কি ভাবে স্পর্শ করিয়াছে এই প্রকার কতকগুলি মত প্রচার করিলে, তাহা তত্ত্বালোচনা হইতে পারে কিন্তু কাব্যালোচনা হয়না।

এইবার বিশ্বপতিবাবুর রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের দুই-একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহার পুস্তকের প্রথম অধ্যায় 'নিসর্গ'। এই অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন, "কবির চিত্ত বর্ষার রুদ্ররূপ কোনোদিন অনুভব করে নাই—মনের গঠনও সেরূপ তাঁহার নয়।" রবীন্দ্রনাথ যদি বর্ষার রুদ্ররূপ অনুভব না করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কেননা, রুদ্র বা কান্ত কোনো রূপই আমরা অনুভব করি না, দেখিয়া থাকি। কিন্তু ধরিয়া লইলাম, কোনো নিগূঢ় উপায়ে রূপ অনুভব করা যায়। তাহা হইলেও বিশ্বপতিবাবুর এই উক্তি প্রমাণসাপেক্ষ। আমরা নিম্নে দুই-একটি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম :—

(১) গগন সঘন অব, তিমির-মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর। (মরণ—ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী)

(২) ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা · · · (বর্ষশেষ—কল্পনা)

(৩) তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি,
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরয নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জ্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

* * * *

কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেই মতো তব কম্পিত বাহু তুলি,
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ সন্ন্যাসী কাজ নাই জপেজাপে।
(আষাঢ়—নটরাজ)

উদ্ধৃত কবিতা তিনটির প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের কৈশোরের, দ্বিতীয়টী মধ্য-বয়সের ও তৃতীয়টি পরিণত বয়সের রচনা। এই তিনটি কবিতায় বর্ষার যে রুদ্ররূপের আভাস আমরা পাই, কবির অজস্র গানে ও কবিতায় তাহা বারম্বার মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্তগুলির উল্লেখ করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কিন্তু বিশ্বপতিবাবুর মতে রবীন্দ্রনাথ যে শুধু বর্ষার রুদ্ররূপ দেখেন নাই তাহা নহে, তিনি বরাবরই শুধু 'শান্তরসের সাধক'। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে শান্তরসের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল; বোধ হয় এইগুলি পড়িলে বিশ্বপতিবাবুর উক্ত সরল বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবে।

(১) মর্ম্মে যবে মত্ত আশা সর্প-সম ফোঁসে···
(দুরন্ত আশা—মানসী)

(২) আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ-খেলা
নিশীথ-বেলা!
(ঝুলন—সোনার তরী)

(৩) স্বরসভাতলে যবে নৃত্য করো পুলকে উল্লসি'
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!

ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্তধারা,
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,—
অয়ি অসম্বৃতে! (উর্ব্বশী—চিত্রা)

(৪) রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা,
কঠোর স্বামিনী!
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস্ হ'রে
আমার যামিনী?
(আহ্বান—কল্পনা)

(৫) হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সঙ্ঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।
(হে মোর সুন্দর—বলাকা)

আরো অনেক কবিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে; কিন্তু বোধ হয় প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে রুদ্রের প্রকাশ আছে কিনা সে সম্বন্ধে যদি কাহারও দ্বিধা থাকে তিনি একবার 'বলাকা' ও 'নৈবেদ্য' পড়িতে পারেন। পাতায় পাতায় তাঁহার দ্বিধা ঘুচিবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু রুদ্রের সংহার-মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার দক্ষিণ মুখের আশ্বাস-বাণীও শুনিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন রুদ্রের এক হস্তে উদ্যত প্রহরণ, অপর হস্তে প্রসারিত অভয়মুদ্রা। তিনি দেখিয়াছেন রুদ্রের ললাটনেত্র অগ্নিচ্ছটায় দীপ্ত কিন্তু তাঁহার দুই নয়ন প্রেমে স্নিগ্ধ। তাই একদিকে যেমন নটরাজের প্রলয়-তাণ্ডবের প্রচণ্ড সঙ্ঘাতে তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইয়াছে, অপরদিকে তেমনি এক অলক্ষ্য নটীর নৃত্যমন্দাকিনীর জলধারায় মৃত্যুস্নানপূত বিশ্বজীবনের অপূর্ব্ব শুচিতা ও আকাশ-ব্যাপী নীলিমার অসীম নির্ম্মলতা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে ও তাঁহার চিত্ত হইতে সকল অশান্তি হরণ করিয়াছে।

নিসর্গের পর নারী, কেননা, কবি নাকি "অকূলে তরী ভাসানোর পূর্ব্বে এখানকার এই মাটীর পৃথিবীতে বাস করিয়া দুইটি জিনিষ ভোগ করিয়া গিয়াছেন, একটি প্রকৃতি অপরটি নারী।" তাহার পর বোধ হয় যেই তাঁহার ভোগস্পৃহা মিটিয়াছে, অমনি তিনি অকূলে পাড়ি দিয়াছেন। 'নারী'-শীর্ষক অধ্যায়ের প্রথমেই বিশ্বপতিবাবু বলিয়াছেন, "রবীন্দ্রনাথ প্রেমিক কবি।...অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয়-লালসার দিক্‌টা অত্যন্ত বেশি ফুটিয়াছে। আমার কিন্তু ঠিক বিপরীত ধারণা।" এ কথা সত্য। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাগুলিকে 'নারী-বিষয়ক' কবিতা বলা যাইতে পারে তাহাদের কোনও স্থানে যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির আভাস নাই তাহা নয়, কিন্তু এই অতি-সূক্ষ্ম আভাস কোথাও লালসার উন্মত্ত প্রকাশে পরিণত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যের মধ্যে যে অপরূপ রূপের ইন্দ্রজাল সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার নারী-বিষয়ক কবিতাগুলি তাহারই বিচিত্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন উঠে! রবীন্দ্রনাথকে কি 'প্রেমিক কবি' বলা যায়? 'প্রেমিক কবি' কথাটি অবশ্য খুব সুশ্রাব্য নয়, কিন্তু ভাষার ত্রুটির কথা ছাড়িয়া দিলেও যে-অর্থে বিশ্বপতিবাবু এই বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা কি সমর্থন করা যায়? অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর প্রেম সম্বন্ধে কবিতা কি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের একটি বড় অংশ? রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় নিশ্চয়ই প্রেমানুভূতির আভাস আছে। অনেক কবিতায় এই অনুভূতি অত্যন্ত করুণ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যথা, 'মানসী'র 'ভুল,' 'ভুলভাঙা,' 'বিচ্ছেদের শান্তি,' 'আমার সুখ' বা 'উৎসর্গে'র 'মন্ত্রে সে যে পূত, রাখীর রাঙা সুতো' প্রভৃতি কবিতায় বা 'স্মরণে'র কবিতাগুলিতে। 'বলাকা,' 'পূরবী' ও 'মহুয়া'র এই অনুভূতি আকাশের নীলিমায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে অসীম শূন্য আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং অজস্র মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া নিরবধি কালের মধ্যে অচল-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে 'প্রেমিক কবি' বলা চলে না। কেননা পুরুষ ও নারীর যে-নিগূঢ় সম্বন্ধ জীবনের সহস্র সুখ-দুঃখের আবেষ্টনের মধ্যে অত্যন্ত নিবিড় হইয়া উঠে, তাহার অন্তরঙ্গ অনুভূতি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কোথাও প্রবল হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রেম তাঁহার কল্পলোকের প্রেম। হয়তো এই প্রেম তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কোনো গভীর বেদনার রূপান্তর, এই প্রেমের বিপুল মহিমায় মণ্ডিত হইয়া তিনি হয়তো প্রেমের অমরাবতীতে সম্রাটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন, হয়তো এই প্রেমের সম্পদ তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনকে অনির্ব্বচনীয় ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছে, কিন্তু দুইটি মানব-হৃদয়ের ঘনিষ্ঠ আকর্ষণ যে-প্রেমের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহার আভাস থাকিলেও তাহা কখনো একান্ত হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পটভূমি অসীম বিশ্ব এবং অনন্ত কাল; তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি এই পটভূমির উপর আলোছায়ার ক্ষণিক বিলাসমাত্র। তাই যে-অর্থে আমরা চণ্ডীদাস, ব্রাউনিং, বার্ণস্ বা এলিজাবেথীয় যুগের অনেক কবিকে প্রেমের কবি বলি, সে অর্থে রবীন্দ্রনাথকে কখনোই প্রেমের কবি বলা চলে না।

নিসর্গ ও নারী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়া বিশ্বপতিবাবু 'অরূপের পথে' কবির অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর মতে এই পথের আরম্ভ 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে'; 'খেয়া,' 'নৈবেদ্য' প্রভৃতিতে আসিয়া ইহা প্রশস্ত হইয়াছে এবং 'গীতাঞ্জলি' ও পরবর্ত্তী কবিতাগ্রন্থসমূহে ইহার পরিসমাপ্তি। বিশ্বপতিবাবুর যদি এই বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে নিসর্গ ও নারী কি দোষ করিল যে এই পথ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বতন্ত্র রূপ-জগতে তাহাদিগকে কারাবদ্ধ করা হইল? 'সন্ধ্যা-সঙ্গীতে' কবি প্রথম নিজের সুর আবিষ্কার করেন একথা তিনি নিজে বলিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর মতে "'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' হইতে আরম্ভ করিয়া কবির যে-বিশেষ মানসিক বৃত্তিটিকে আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিতে দেখি, তাহা তাঁহার দুঃখানুভূতি।" যদি দুঃখানুভূতিই কবির বিশেষ মানসিক বৃত্তি হয় তাহা হইলে কি তাঁহার নিসর্গ ও নারী-বিষয়ক কবিতাগুলিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না? বিশ্বপতিবাবু অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন যে যায়। কিন্তু তাহা হইলে এই বৃত্তি কি করিয়া কবির কাব্যের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত

হইয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনা করিতে হইলে বিশ্বপতিবাবু যে-রীতি অবলম্বন করিয়াছেন—অর্থাৎ কবির সমগ্র কাব্যকে রূপজগৎ, অরূপের পথে ও অরূপ, এই তিন ভাগে ভাগ করা—তাহাই কি প্রকৃষ্ট? এই রীতির ক্রটি কি তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশ্বপতিবাবু যে নিসর্গ ও নারীর পালা শেষ করিয়া আবার সন্ধ্যাসঙ্গীত হইতে আলোচনা সুরু করিয়াছেন, তাঁহার আলোচনা-রীতির ক্রটির ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"দুঃখানুভূতি" ব্যাপারটিও আলোচ্য। কবির এই মানসিক বৃত্তি নাকি 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' তাঁহাকে একবারে 'ভূতের মত' পাইয়া বসিয়াছে। এই ভূত নামাইবার জন্য কবিকে ওঝার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল কিনা বিশ্বপতিবাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'প্রভাত-সঙ্গীতে' যে এই ভূতের দৌরাত্ম্যের বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায়না তাহা তিনি স্বীকার করেন। তবু দুঃখানুভূতিই যে কবির বিশেষ মানসিক বৃত্তি তাহা প্রমাণের জন্য তিনি কবির পরবর্ত্তীকালের নানা কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু খুব যে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারিনা। কেননা এই দুঃখানুভূতি বলিতে কি বোঝায় তিনি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে ইহা pessimism নয়। আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন, "এই দুঃখপ্রিয়তা, এই অবসাদ, এই অতৃপ্তি"। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' হইতে 'খেয়া' পর্য্যন্ত নাকি এই দুঃখপ্রিয়তার অবিচ্ছিন্ন ধারা কবির অগোচরে তাঁহার কাব্যের তলে তলে বহিয়া আসিয়া 'খেয়া'তে হঠাৎ তাঁহার নিকট ধরা পড়িয়া গেল। বিশ্বপতিবাবু আশ্বাস দিয়াছেন, একদিন কবি এই দুঃখপ্রিয়তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিবেন। কিন্তু একটু বিস্তারিতভাবে লিখিলেই ভালো, কেননা তাহা হইলে প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা সকলে জানিতে পারিবে।

কিন্তু আপাতত সমালোচকের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' এবং পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলিতে অসীমের যে-উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, খেয়া'তে ও 'নৈবেদ্যে' তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, এবং এই পূর্ব্বাভাস আকস্মিক নয়, 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে' প্রথম যে সুরটি বাজিয়াছিল, তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু এই ক্রমপরিণতির মূল সুর কি দুঃখবোধ? রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ও বার্দ্ধক্যের পরিণত ও অপরিণত নানা কবিতায় দুঃখের উল্লেখ আছে। কিন্তু 'দুঃখবোধ' বা 'দুঃখপ্রিয়তা' 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' ছাড়া আর কোথায়ও বড় হইয়া উঠে নাই। বিশ্বপতিবাবু দুঃখবোধকে এক বিশিষ্ট অর্থে ধরিয়া লইয়া তাঁহার উক্তি হয়তো সমর্থন করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে দুঃখবোধ বলিবার তাৎপর্য্য কি? দুঃখ-দুঃখবোধের মধ্য দিয়া কি কবি তাঁহার জীবন-দেবতার সাধনা করিয়াছেন? দুঃখবোধের মধ্য দিয়া কি তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্ববিরোধকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অখণ্ডের যে অখণ্ড প্রকাশ তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন? ব্যক্তিগত জীবনে কবি বারবার গভীর দুঃখ পাইয়া থাকিতে পারেন এবং তাঁহার কোনো কোনো কবিতার মূলে দুঃখবোধের প্রচ্ছন্ন উৎস থাকিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যে-মানসিক বৃত্তি তাঁহার সমগ্র কাব্যের মধ্য দিয়া স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা যে দুঃখানুভূতি একথা মানিয়া লওয়া যায় না; দুঃখপ্রিয়তা নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যদি কোনো একটি মূল সুর নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা নিসর্গ। প্রকৃতির সহিত কবির যে-অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁহার কাব্যের মধ্যে আমরা

তাহারই স্তরে স্তরে বিকাশ দেখিতে পাই। তাঁহার কৈশোরের কবিতায় এই পরিচয়ের প্রথম স্ফূর্ত্তি প্রথম প্রণয়ের মতোই দীপ্ত ও নবীন; 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'য় ইহা গাঢ়তর হইয়াছে; 'বলাকা' ও 'পূরবী'তে ইহা অসীম জগতের ও অনন্ত কালের মধ্যে বিপুল প্রসার লাভ করিয়াছে। তাঁহার সকল বয়সের কবিতাতেই এই দৃশ্যমান্ জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে মুগ্ধ করে; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁহার গভীর সৌন্দর্য্যানুভূতি ও সুদূরপ্রসারী কল্পনার মধ্য দিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপান্তর লাভ করিয়াছে। তাই তাঁহার সকল বয়সের কবিতার মধ্যেই এক অদৃশ্য ইন্দ্রিয়াতীত জগতের আভাস পাওয়া যায়, যদিও তাঁহার শেষ বয়সের, বিশেষত 'বলাকা' ও 'পূরবী'র, কবিতায় এই আভাস অত্যন্ত পরিস্ফুট হইয়াছে। 'বলাকা' ও 'পূরবী'তে তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন—

.........transcending these
Far other worlds and other seas.

রবীন্দ্রনাথের কাব্যের এই চরম পরিণতি সম্বন্ধে বিশ্বপতিবাবু তাঁহার পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ের তিনি নাম দিয়াছেন 'অরূপ'। নামটি অসঙ্গত হয় নাই। বিশ্বপতিবাবু সর্ব্বপ্রথম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি পুস্তকের কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার তুলনা করিয়া অনেকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার যে-অভিযোগ আনে তাহার উত্তর দিয়াছেন। বিশ্বপতিবাবুর উত্তরের মর্ম্ম এই যে বৈষ্ণব কবিদের ভগবান মানুষের রূপে এবং মানুষের পরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেবতাকে মানুষের রূপে কল্পনা করা চলে না এবং তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে স্থান-কালের সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই। তাহা ছাড়া বৈষ্ণব কবিতার যাহা ভিত্তি তাহা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত। তাই বৈষ্ণব কবিরা জানিতেন যে "ভগবানকে কাব্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা যত নিকটেই আনুন না কেন, তাঁহার আর একটি দিক্ পাঠকেরা পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসংস্কারবশে আপনা হইতে মনের মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথের ভাগবত-উপলব্ধির পশ্চাতে সেরূপ কোনো পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমত নাই।" ইহা সুযুক্তি। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে না বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অস্পষ্টতার অভিযোগ আনেন, বিশ্বপতিবাবু তাঁহাদের সদুত্তর দিয়াছেন। তবে 'ভাগবত-উপলব্ধি' কথাটি অনুমোদন করা যায়না; অরূপের বা অসীমের উপলব্ধি ও ভাগবত-উপলব্ধি ঠিক এক জিনিষ নহে। বিশ্বপতিবাবু কিন্তু আরও একটি কথা বলিতে পারিতেন—যাঁহাদের রসবোধ নাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য স্পষ্ট না অস্পষ্ট তাহা বিচারের প্রয়াস তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র।

'অরূপ' অধ্যায়ে বিশ্বপতিবাবু অতঃপর যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে শুধু রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রয়াস নাই, অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড দ্বারা রবীন্দ্রনাথের পরিণত কালের অনেক কবিতার রসের ও তত্ত্বের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্দ্দেশের চেষ্টা আছে। এই চেষ্টার ফলে বিশ্বপতিবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন যে "গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির মধ্যে একদিকে যেমন প্রথম শ্রেণীর অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি আমরা পাই, অপরদিকে তেমনি এমন অনেক কবিতাও পাই যেগুলি রসসৃষ্টি হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য নয়।" নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্বপতিবাবু যে-উদাহরণগুলি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উক্তি প্রমাণিত হয়না। 'সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন তুই

সহজ হবি', 'মোর মরণে তোমার হবে জয়,' 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে'—এইগুলি কবিতা নয়, গান। তত্ত্ব বা রস এইগুলির মধ্যে কোন্‌টি বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে ইহারা মনকে স্পর্শ করে শুধু কথার ভিতর দিয়া নয়, সুরের ভিতর দিয়া। বিশ্বপতিবাবু বোধ হয় এই গানগুলি শোনেন নাই, তাই রসসৃষ্টি হিসাবে ইহাদের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে চান না; যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন এইগুলি তত্ত্বের ব্যাখান নয়, রসসৃষ্টি। অতএব রসসৃষ্টি হিসাবেই ইহাদের বিচার করিতে হইবে ; ভালো লাগা না-লাগা ব্যক্তির [illegible] কথা।

তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রয়াস যে বিশ্বপতিবাবুর পুস্তকে কিরূপ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণস্বরূপ 'বলাকা'-সম্বন্ধে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধার করা যাইতে পারে। তিনি বলিতেছেন যে বলাকায় দেখা যায় "কবি দুইভাবে তাঁর তত্ত্বটিকে রূপবান করিয়া তুলিতে পারেন,—তত্ত্বটিকে কোনো একটি পরিচিত, সমধর্ম্মী বাস্তবরূপের সাহায্যে ফুটাইয়া তুলিয়া, অথবা এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া যাহার মধ্যে তত্ত্ব আপনা হইতে রূপবান হইয়া উঠে।" অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে কি ভাবে এই আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়, বিশ্বপতিবাবু তাহার একটি রোমাঞ্চকর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

"যেমন যদি কেহ এক ভীষণ ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ রজনীর বর্ণনা করেন এবং তারপর বলেন যে এ হেন দুর্য্যোগের রাত্রে পথ চলিতে চলিতে বিদ্যুতের চকিত আলোকে তিনি এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতে দেখিয়াছেন, অমনি তাঁহার বক্তব্য বিষয় সংবাদের রূপ ত্যাগ করিয়া রসরূপ ধারণ করিয়া বসে"—যেমন করিয়া, ঠিক তেমন করিয়াই নিরাকার তত্ত্ব সাকার হইয়া উঠে।

আর এক স্থানে তিনি বলিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি "আজকাল," অর্থাৎ 'বলাকা' লিখিবার সময়ে, "নিজের চিন্তাধারাটি পর্য্যন্ত উপভোগ করিতে চান, তাই তাঁহার চিন্তাপদ্ধতিটি পর্য্যন্ত কবিতার মধ্যে রূপবান হইয়া উঠে।" বিশ্বপতিবাবু ইহার একাধিক প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছেন। 'বলাকা'র 'বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি' এবং 'এ কথা জানিতে তুমি ভারত-ঈশ্বর সাজাহান' এই দুইটি কবিতায় কবি নাকি '[illegible] চিন্তা করিয়াছেন'। আমার দুর্ভাগ্য কিম্বা কবির দুর্ভাগ্য জানিনা, 'কবির [illegible] চিন্তা' আমার নিকট পরিস্ফুট নয়, এবং বোধ হয় এই কারণেই আমি 'বলাকা' উপভোগ করি, তত্ত্বের যাচাই না করিয়াও।

বিশ্বপতিবাবুর তত্ত্ববিশ্লেষণের ও রসবিচারের যে-নমুনাগুলি উদ্ধৃত হইল, তাহা সব নয়। তাঁহার সমস্ত মতামতের আলোচনা করিতে হইলে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যের আলোচনা করিতে হয়, কিন্তু সাময়িক পত্রের পরিসরের মধ্যে তাহা সম্ভব নয়। তাঁহার সহিত সকল বিষয়েই যে সমালোচকের মত-বিরোধ আছে [illegible] যথার্থ রসগ্রাহিতার পরিচয় তাঁহার পুস্তকে যে একেবারে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে। তাঁহার পুস্তকের প্রধান ত্রুটি এই যে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রম-পরিণতির ধারা অনুসরণ না করিয়া তাহার রসবিচারের ও তত্ত্ববিশ্লেষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার ফল হইয়াছে কতকগুলি অস্পষ্ট, অসম্বদ্ধ মন্তব্যের সমষ্টি। যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সহিত সুপরিচিত নন্, এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কোনো ধারণা হইবে না।

সাহিত্যের বিচার ও বিশ্লেষণ অতি দুঃসাহসিক কাজ। এই কাজে সাফল্যের জন্য যে-দুর্লভ শক্তির প্রয়োজন, বিশ্বপতিবাবুর রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণ না করিয়াও সাহিত্যালোচনা চলে। কেহ যদি কোনো রচনা পাঠ করিয়া আনন্দ পান এবং এই আনন্দানুভূতি যদি নিজের লেখনীর সাহায্যে অপরের মনে সঞ্চার করিতে পারেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্য-সমালোচনা রসসৃষ্টিরই সমান। দুঃখের বিষয়, বিশ্বপতিবাবুর রসবোধ থাকিলেও রসসৃষ্টির ক্ষমতা নাই—তাঁহার রচনাভঙ্গী মনকে স্পর্শ করে না, তত্ত্বের গুরুভারে তাহা ক্লিষ্ট। তাই তাঁহার লেখা পড়িবার সময় বারম্বার মনে হয় যেন গলদ্‌ঘর্ম্ম গুরুমহাশয় নির্ব্বোধ ছাত্রগণকে দুরূহ পাঠ্য বুঝাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Philosophy of a Biologist—SIR LEONARD HILL, F.R.S., (Edward Arnold & Co.), **The Nature of Living Matter**—L. HOGBEN. Professor of Social Biology, London University (Kegan Paul), **Mind at the Crossway**—C. LLOYD MORGAN (Williams Norgate), **The Biological Basis of Human Nature**—H. S. JENNINGS (Faber & Faber), **Science and Religion**—B. B. C. TALKS (Howe, 1931), **The Making of Man—An outline of Anthropology**;—EDITED BY V. F. CALVERTON, (The Modern Library), **Life : Outlines of General Biology**—SIR J. A. THOMASON & PROF. PATRICK GEDDES (2 Vols., Williams Norgate).

কিছুদিন পূর্ব্বে এডিংটন্, জীন্‌স্ ও মিলিক্যান্ পড়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করি—বৈজ্ঞানিকেরা মানুষ ছাড়া অতিমানুষ নন্। তাঁরাও মানুষের মতন নিজেদের পাতিহাঁসকে রাজহংস বিবেচনা করেন, এবং মানুষের মতনই নিজেদের বিশেষ আলোচনার বহির্ভূত বিষয় নিয়ে বক্‌তে গেলেই বেজায় বোকামি করে বসেন। তাঁদের এই 'মানবিক' ব্যবহার দেখে ভারি আনন্দ হয়েছিল। ভেতরে ভেতরে তাঁদের উপর রাগ ছিল। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁদের ব্যুৎপত্তিকে হিংসা করতাম, মনে হ'ত সূত্রগুলো মন্ত্রের মতনই লোক ঠকাবার যন্ত্র মাত্র। প্রায়ই ভাবতাম, অঙ্কের হাত থেকে কি পরিত্রাণ নেই? নানান্ রকমের বিজ্ঞান রয়েছে, নতুন নতুন বিজ্ঞান তৈরি হচ্ছে, সেখানে অঙ্কশাস্ত্রের বিশেষ কোন জবরদস্তী নেই, তাদের বিষয়বস্তু শিশি-বোতলের মধ্যে, বাগানে, চিড়িয়াখানায়, বনজঙ্গলে আত্মগোপন করে রয়েছে, সংখ্যার কবলে পড়েনি, ধ্যানরসিকদের মস্তিষ্কের মধ্যে বন্দী হ'য়ে তাদের পূর্ণসত্তা এখনও বিধ্বস্ত ও বিখণ্ডিত হয়নি, কবে সেগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে, কবে পরীক্ষালব্ধ সিদ্ধান্তগুলি সুসজ্জিত হ'য়ে ভদ্রলোকের পাঠ্য হবে? কবে সেই পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকের সাধনা সম্পূর্ণ হবে, কবে তাঁরা প্রয়োগাগার থেকে বেরিয়ে, মুক্ত হাওয়াতে দাঁড়িয়ে জগতের সম্মুখে নিজেদের বক্তব্য প্রচার করবেন? তাঁদের উপরই সমাজতাত্ত্বিকের ভরসা, কেননা, আমরা না পারি পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিতে, না পারি সাংখ্যিক সূত্র খাটাতে, অথচ জ্ঞানের অভাবে সমাজ রয়েছে অনেক পিছনে

প'ড়ে। আমি জানতাম যে, এই সব বিজ্ঞান বয়সে শিশু, তাদের সাধনা অসম্পূর্ণ, যতটুকু হ'য়েছে তার প্রচারও ভাল রকম হয়নি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতির তুলনায়। আমি জনতাম যে, সাধনার প্রথম স্তরে মন্ত্রগুপ্তির নিতান্ত প্রয়োজন থাকে। আমাদের শিক্ষাও এত একপেশে হয়েছে যে নব্যবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জানবার শক্তি ও ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু মনে মনে আমার ভয় ঘোচেনি, একটা সন্দেহ বরাবরই ছিল যে আজ না হয় কাল এ-সব বিদ্যাও সংখ্যাতত্ত্বের অধীনে আসবেই আসবে। কারণ, ভবিষ্যৎবাণী করাই যদি বিজ্ঞানের চরম সামাজিক সার্থকতা হয়, সমাজের মঙ্গলবিধানই যদি বিজ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য, বিশেষত এই সব নতুন বিজ্ঞানের অব্যবহিত লক্ষ্য হয়, তাহলে ভবিষ্যৎবাণীগুলো সঠিক করার জন্যে সংখ্যা ছাড়া আর কি উপায় আছে? সংখ্যার দৌত্যেই ভবিষ্যৎবাণী সত্যের সখ্যলাভ করে। কিন্তু আবার ঐ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিকেরাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংখ্যামূলক সামান্য জ্ঞানের একটা স্বাতন্ত্র্য ও বড় রকমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও, সত্তার সঙ্গে তার কোন সাম্য কি সাদৃশ্য, সালোক্য কি সাযুজ্য, সাজাত্য কি স্বারূপ্য কিছু নেই, আছে শুধু সার্ষ্টি, অর্থাৎ সত্তার সমান ঐশ্বর্য্য, ও সারথ্য। কিন্তু কায়া বাদ দিয়ে ছায়া নিয়ে পড়ে থাকলে মানুষের চলে না। আমার কারবার মানুষ নিয়ে, মানুষের সমাজ নিয়ে, যেখানে মানুষ বিচিত্র ও খেয়ালি, বিশেষ ক'রে যেখানে একটা গড়পড়তা গতির বিবরণ ও ইঙ্গিত দেওয়া ছাড়া নিয়মের অন্য অর্থ ও মূল্য নেই। আমার কারবার সমাজতত্ত্ব নিয়ে, যার তত্ত্বকথা হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্বন্ধের ভেতরে ও অন্তরালে, সংস্কারের ব্যাপ্তিতে যে ব্যক্তিস্বরূপ থাকে তাকে বোঝা ও ফুটিয়ে তোলা। অথচ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অবিশ্বাস করার মতন যৌগিক দুঃসাহস আমার ছিল না। আমি জানতাম যে, পদ্ধতি জিনিষটাই একটা সামাজিক ব্যবস্থা, অতএব ইতিহাসে তার একটা স্থান ও কর্ত্তব্য আছে। যেমন পূর্ব্বে ম্যাজিক ছিল, এখন তেমনি সায়েন্স হয়েছে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে নানা রকমের সুবিধা ও অধিকতর সমস্যার সমাধান সম্ভব হ'য়েছে, অতএব তার প্রতিপত্তি অস্বীকার করবার স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা আমার কখনই ছিল না। এ-যুগে জন্মে, এ-যুগের পদ্ধতিতে বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। বোধহয়, বিশ্বাসের মাত্রাধিক্যটুকু যুক্তিতর্কের দ্বারা মার্জ্জনাও করেছি। যে-পদ্ধতিতে নানা কারণে বিশ্বাস করতাম, সেই পদ্ধতির মূলে সংখ্যা থাকার জন্য পূর্ব্বে কোন সন্দেহই উঠ্‌ত না। যখন সংখ্যার কারচুপিতে সংশয় এল, তখন ঘট্‌ল বিপদ। এ-বৎসর সন্দেহের দোলাতেই দুলছি। এক-একবার ইচ্ছে হয়, এডিংটন্, জীন্‌সের বৈজ্ঞানিক মন্তব্যগুলি যাচিয়ে নিই, অথচ সে বিদ্যা নেই। তাই মনে হ'ল, যে-বিজ্ঞান সংখ্যার ওপর পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত নয় তারই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক্। জীবতত্ত্বকে বেছে নিলাম প্রধানত ঐ কারণে। তা ছাড়া আমার ধারণা ছিল এই, যে-কালে তত্ত্বটির গোড়ায় জীব কথাটি রয়েছে, আর আমরা যখন জীববিশেষ, অর্থাৎ আমাদেরও যখন অন্যান্য জীবের মতন জীবন রয়েছে, তখন পদার্থবিজ্ঞানের চেয়ে জীবতত্ত্বের কাছে জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করাই সঙ্গত হবে। সেইজন্য খানকয়েক নামজাদা জীবতাত্ত্বিকের নতুন বই পড়লাম। বলা বাহুল্য, সমস্যার বিশেষ কোন সমাধান হ'ল না। জীবতত্ত্বের বই পড়ে ভাল ক'রে জীবন চালাবার বিশেষ কোন

সুবিধা হয়নি। কেন হ'ল না তাই লিখছি। গোটাকয়েক কারণ মাত্র নির্দ্দেশ করতে পারব।

প্রধান কারণ এই যে বর্ত্তমান জীবতত্ত্ব সংখ্যার নাগপাশে জড়িয়ে পড়েছে, দেখলাম। এতদিন ধরে জীববিজ্ঞান একটা না একটা মতের আশ্রয়ে বেড়ে উঠছিল, এবং সেই মতের যুক্তি খোঁজবার ভার নিয়েছিলেন এমেচারের দল। সেই জন্য অতিপ্রাকৃতবাদের প্রভাব এত বিস্তীর্ণ হয়েছিল। ডারুইন্ সাহেবের প্রধান কাজ ছিল শ্রেণীভাগ ও শ্রেণীর ভৌগলিক বিভাগ করা। শ্রেণীর উৎপত্তির ইতিহাসটা তাঁর অব্যবহিত অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞানের সীমার বাইরে ছিল। তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন তাঁর মতটা উৎপত্তির ইতিহাসে খাটাতে লাগলেন, তাঁর বই-এর নামের দোহাই দিয়ে, তখন নানা বাধা-বিঘ্ন এসে হাজির হ'ল। একটি মত সত্য কি মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না, অন্য একটি মতের দ্বারা। সেইজন্য যে-লামার্কিয়ান মতের খানিকটা ডারুইন্ নিজেই গ্রহণ করেছিলেন সেটার উজ্জীবনে জীববিজ্ঞানের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হ'ল না। অ-বৈজ্ঞানিকের হাত থেকে জীবের মুক্তি বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। এই সময় আবিষ্কৃত হল মেণ্ডেলের বইটা। তারই সহায়তায় জীবতত্ত্ব প্রয়োগাগারে প্রবেশ লাভ করলে। "ত্যজ আশা প্রবেশি এ দ্বারে।" কিন্তু বারব্যাঙ্কের মত empiricist-এর দল ভারী ছিল না, তাই জীবতত্ত্ব পড়লো অধ্যাপকের হাতে এসে। সে হাতে এলে আর রক্ষা নেই। মেণ্ডেলের পাঠিগণিত হ'য়ে উঠল বীজগণিত—টম্‌সন্, গেডিস্ বলছেন আইনষ্টাইনের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা জীবতত্ত্বের যথেষ্ট রয়েছে। লিওনার্ড হিল্ বিশদভাবে দেখালেন যে, পরমাণুর সঙ্গে জীবকোষের গঠন-সাদৃশ্য খুব বেশি। অন্যধারে আবার, পদার্থবিজ্ঞানের দিক থেকে, হোয়াইট্‌হেড্ চাইছেন যে, পরমাণুর আন্তর্জাতিক (interatomic) সম্বন্ধটি বীজকোষের পরস্পর ব্যবহারের সঙ্গে তুলনা করা হোক্। হগ্‌বেন্ বলেন, জীবতত্ত্বে physico-chemical reaction-এর দ্বারা যতদূর ব্যাখ্যা চলে তার মধ্যে প্রাণবাদ আনবার কোন দরকার নেই। তাঁর মতে, বাঙ্‌ময় জগতে, সামাজিক আলোচনার আসরে, mechanistic পদ্ধতিই একমাত্র উপায়; সাধারণের আদান-প্রদানের হাটে, ব্যক্তিগত গোপন কথা, গোপন ব্যথা প্রকাশ করা আগে যেমন ছিল অভদ্র রুচি, এখন তেমনি হ'য়ে উঠেছে অবৈজ্ঞানিক, অযুক্তিসঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকদের মত এতদূর পর্য্যন্ত বলতে তিনি রাজি নন যে, যা প্রকাশ্য নয় তার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু অব্যক্তের আপেক্ষিক মূল্য নিশ্চয়ই কম এতটা পর্য্যন্ত তিনি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয়—বিশেষত ধর্ম্ম ও আর্টের আবেদনের আলোচনা প'ড়ে। যদি জীবতত্ত্বকে প্রয়োগাগারের পরীক্ষার ওপর দাঁড় করান যায়, তাহলেও mathematical physicist-এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় রয়েছে মনে হয় না। পরীক্ষা করতে গিয়েই অধ্যাপকেরা জীবতত্ত্বকে উচ্চাঙ্গের অঙ্কে এনে ফেলেছেন। এখন জীবের সৃষ্টিকর্ত্তাকে অঙ্কশাস্ত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বলেই মানতে হবে। সব বিজ্ঞানই কি শেষে আইনষ্টাইনের দাসত্ব করবে, যেমন উনবিংশ শতাব্দীতে ডারুইনের এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউটনের দাসত্ব করেছিল? আইনষ্টাইনের মৃত্যুর পর জগৎ কিছু পিছু হটবে না। Corpuscular theory-তে ফিরে যাবার কথা শুনলে ছুট্ ঘোড়ার দৌড়বার সময় চাট মারার কথা মনে হয়। ওটা বিজ্ঞানের retroactive action, back-kick, কাজের কথা নয়, কাজের কাজ হচ্ছে এগিয়ে চলা।

দ্বিতীয় কারণ এই,—একদল বৈজ্ঞানিক বলছেন, বিশ্বটা হ'ল [illegible] সাবানের বুদ্বুদের মতন বাড়তে বাড়তে কোনদিন ফেটে যাবে। এক [illegible] অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, বিশ্বটা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে, আবার আর একজন [illegible] দেখিয়েছেন যে, কড়াভাজা রুটির মতন তার ধারগুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। আবার একজন 'বিশ্ব-রশ্মির' সন্ধান পেয়ে অভয় দিচ্ছেন যে, বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষতিপূরণ [illegible] এই ঝগড়ার মিটমাটের উপর জীববিজ্ঞানের প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাস [illegible] নির্ভর করছে। যদি বিশ্বই যায় নষ্ট হ'য়ে, তাহলে অভিব্যক্তি নিরর্থক হ'ল, [illegible] মানুষে গীতার ধর্ম্মানুসারে নিষ্কাম হ'য়ে 'মা ফলেষু কদাচন' মন্ত্র জপ করে। [illegible] আশ্বস্ত হওয়া আমাদের মতন দূরদর্শী লোকের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের ঘুম [illegible] রাবণ দশটা মাথা নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় পাশ ফিরিতেন কি ক'রে, তাই ভেবে। [illegible] বিকীর্ণ শক্তির পুনঃসঞ্চয় সম্ভব হয়, তাহলে জীবতাত্ত্বিক উল্লসিত হ'য়ে অভিব্যক্তির অবিশ্বাসীকে জেলে দিতে পারবেন, খুন করতে পারবেন এই এক আশা ও [illegible] রয়েছে। কিন্তু আজতারিখ পর্য্যন্ত ঝগড়া মিট্‌ল না, অবিশ্বাসীরাও বেঁচে [illegible] গণৎকারঠাকুর ঠিকুজি দেখে, যে-ছেলের অল্পবয়সে ফাঁড়া আছে বলেছেন, [illegible] স্কুল পাঠশালে পাঠাতে ইচ্ছা না হওয়াই বাপ-মার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই [illegible] মাদুলী শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানতে হয়।

তৃতীয় কারণ,—দেখতে পাচ্ছি যে, জীবতাত্ত্বিকের মধ্যে দু'টি দল [illegible] উঠেছে। তাঁরা নিজেদের অন্য আখ্যা দিলেও তাঁদেরকে mechanist ও vitalist বলা যেতে পারে। আজকালকার বাজারে বিশুদ্ধ mechanism ও বিশুদ্ধ vitalism-এর খাতির কমেছে। হগ্‌বেন্ নিজেকে বলছেন mechanist publicist, [illegible] মর্গ্যান্ নিজেকে emergent evolutionist পূর্ব্ব থেকেই বলেছেন, সেই [illegible] একটু অদল-বদল করে সেনাপতি স্মাট্‌স্ নিজেকে হোলিষ্ট (Holist) [illegible] জে, এস্ হল্‌ডেন্ ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে এসে, respiratory pigment-এর রিসার্চ্চ ছেড়ে দিয়ে, বেতারের মারফৎ জগৎকে জানালেন যে, হোলিজম্ মানা [illegible] জীবতাত্ত্বিকের কোন উপায় নেই। জেনিংস, যে জেনিংস নিতান্ত [illegible] ঠাণ্ডা লোক, তিনিও emergent evolution-এর তরফদারি ক'রে [illegible] পুস্তক সমাপ্ত করলেন। মোদ্দা কথা এই দাঁড়িয়েছে, লয়েড্ মর্গ্যানের [illegible] নেবো, না নেবো না। তাঁর প্রধান বক্তব্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করেছেন, এবার [illegible] জগতে সে মতটি প্রয়োগ করেছেন একটু বিস্তৃতভাবে। তিনি বলছেন, দেখা যাচ্ছে যে জগতে গোটা কয়েক পরিষ্কার স্তর রয়েছে, অজীব, জীব, মন, প্রত্যেকটার মধ্যে ব্যবধান, সান্তরতা রয়েছে যেটা পার হ'তে গেলে লাফাতে হয়, প্রত্যেক [illegible] এমন একটি নতুন গুণের আবির্ভাব হচ্ছে যার সম্বন্ধে পূর্ব্বের ধাপ থেকে কোন প্রকার ভবিষ্যৎবাণীই করা যায় না। এখন মজা হ'ল এই যে, এ-ধরণের উদ্‌গতিবাদে বিশ্বাস করলে অনেক সুবিধা হয়। অজীব, জীব, মন—বিবর্ত্তনের এই মোটা ধারাটি মানলে আত্মতৃপ্তি আসে—কেননা, যেটি শেষে প্রকাশিত সেইটিই সব চেয়ে উন্নত, আর [illegible] উন্নত, অনুন্নতের উপর একটা স্বাভাবিক দাবী তার থেকেই যায়। তবু উপর, [illegible] রক্ষাও হয়। যদি মন পর্য্যন্ত এসে থাকে তাহলে মনের ওপারে যাবে না কেন! আর ওপারে গেলেই ধর্ম্ম, আত্মা, ভগবান প্রভৃতির মধ্যে একটা কিছুতে পৌঁছোতেই হবে।

দার্শনিকের সেরা দার্শনিক আলেক্‌জাণ্ডার এই বিশ্বাস করেন। আমরা ত বিশ্বাস করবই, তাঁর মাত্র একটা deity, আমাদের ত্রেত্রিশ কোটি ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যার চেয়ে মাত্র কিছু কম, অহিন্দুদের দেবতা নেই কিনা! ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুদের লয়েড্ মর্গ্যান্ ভারী সুবিধা ক'রে দিয়েছেন। শুধু কি তাই? যাঁরা মানুষ নিয়ে কারবার করেন, যেমন কবি ও সমাজতাত্ত্বিক, তিনি তাঁদেরও পূজার্হ। মানুষ আগে ছিল জীব, এখন হ'য়ে উঠল এক আজব চীজ। তার মনুষ্যত্বই হ'ল তার নতুনত্ব, তার বৈশিষ্ট্য, তার খেয়ালই হ'ল তার সব, তার কোন নিয়ম-কানুন নেই, অতএব আর অঙ্ক কষতে হবেনা, শুধু মজার মজার বিবরণ দিলেই চলবে, তার ভয় ভাবনা, আশা ভরসা, আদর্শ অভিলাষ যখন তাকে জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবেই পৃথক্ করেছে, তখন আর তাকে পায় কে? আর একটি লাফ আর দেবত্ব হাতে হাতে। সেই জন্য বলি, এই নতুনত্বের ওপর জোর দিতে গিয়ে, এই বড় বড় ফাঁকগুলো আরো বড় ক'রে দেখাতে গিয়ে, স্থিতি ও গতি থেকে মতির পার্থক্য ফোটাতে গিয়ে, মানুষের দাম্ভিকতা লয়েড্ মর্গ্যান্ বাড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যৌক্তিকতার সাতত্য রক্ষা করতে পারেননি। এ-সব মত শুনলে মানুষের মতিগতি ফিরে আসে, আত্মার দিকে। লোকায়তারকে পরিত্যাগ করে চণ্ডীদাসের বুলি আওড়ান যায়; মানুষই হ'য়ে ওঠে মানুষের একমাত্র আলোচ্য বিষয়, অর্থাৎ gossiping চলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি school for scandal-এ প্রকাশ্য ভাবেই পরিণত হয়; এতদিন পরে mechanistic ও vitalistic ব্যাখ্যার প্রকৃত সমন্বয় হয়। যে প্রাকৃতিক সমাবেশে পৃথিবী উৎপন্ন হ'য়েছে, যে দুর্ঘটনায় মানুষের মত মানুষের 'সহসা উদয়' হ'য়েছে, তার পুনরাবৃত্তির যখন তিলমাত্র সম্ভাবনাও নেই, যখন মানুষের মনটা একেবারে আজব চীজ, যখন প্রত্যেক স্তরে নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার তৈরি হ'তে হ'তে চলেছে, তখন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের সব গোলমাল চুকে গেল, প্রকৃতিদেবীর পূর্ব্ব হ'তেই রচিত সিংহাসনে মানুষ স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হ'ল। তার পর শুধু 'জয় মা' ব'লে লাফ দেওয়া। Mind is an emergent বলাও যা, মানুষকে দেবতা বলাও তা।

কিন্তু কেমন যেন ভয় হয়, কোথায় যেন খট্‌কা লাগে। ধরলাম লোকায়তার, এডিংটন্, জীন্‌স্ ভুল বলেছেন। তবু খট্‌কা থেকেই যায়। অবশ্য লয়েড মর্গ্যানের মত গ্রহণ করলে বিজ্ঞানকে বাদ দিতে হয় না। বরঞ্চ বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের ওপর আস্থাবান হ'তেই তিনি বলছেন। শুধু নতুন অবস্থান, নতুন গঠন, নতুন শৃঙ্খলা, নতুন গুণ, নতুন ব্যবহার সৃষ্টি হচ্ছে মানলেই যে পূর্ব্বাবস্থার ঘটনা ও নিয়মাবলীর উপর পরের অবস্থার নির্ভরশীলতা অস্বীকার করতে হবে, তাও নয়। জেনিংস্ এই কথা বলছেন। বলছেন খুবই ভাল ক'রে, কিন্তু তবু প্রশ্ন ওঠে।

প্রথম প্রশ্ন ওঠে 'নতুন' কথাটির মানে নিয়ে। যেটা আগে ছিল অথচ জানতাম না তাকে নতুন বলা হয়। বলা বাহুল্য, লয়েড্ মর্গ্যান্ এ অর্থে কথাটি ব্যবহার করেননি। অন্য অর্থ হচ্ছে আগে ছিল না এখন হয়েছে। হয়েছে, অর্থাৎ ফুটে উঠেছে, এক নতুন গঠনে, নতুন সজ্জায়, নতুন শৃঙ্খলায়। এ-রকম আকৃছার হয়। কিন্তু কি হয়, নতুন fact হয়, নতুন event হয়, না নতুন relation হয়? নতুন সম্বন্ধই হয়। লয়েড্ মর্গ্যান্ বলছেন, সব কিছুই নতুন হয়। সব কিছুই নতুন হয়, স্বীকার করা চলতে পারে, যদি relation-কেই fact ও event গণ্য করা হয়। তাতে আপত্তি থাকতে পারে না—যদি সেই সঙ্গে মানা হয় যে, fact কিম্বা event-

রূপী relation-টারও, অন্যান্য fact ও event-এর মতনই, একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব ; অর্থাৎ যদি সেই সঙ্গে মানা হয়, জীবজগতের নতুনত্ব, মনোজগতের নতুনত্বটা, অজীবজগতের নতুন ঘটনার মতনই, সেই একই উপায়ে বুঝতে হবে, অন্য উপায়ের প্রয়োজন নেই। লয়েড্ মর্গ্যান্ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিশ্বাসী হ'তে পারেন, কিন্তু সে পদ্ধতির ধারাবাহিকতা তিনি মানেন না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, তাঁর হাতে যুক্তির মালা ছিঁড়ে গিয়েছে। নতুনত্ব ও নতুন যদি এক না হয়, যদি 'নতুনত্ব' হয় এক প্রকারের সম্বন্ধ, আর 'নতুন' হয় ঘটনা, তা হ'লেও ন্যায়ের ধারাবাহিকতা মানতে হবে। তাও তিনি মানছেন না। বিজ্ঞান যুক্তির বাইরে নয়, যুক্তিতর্ক পূর্ব্বাপর পরম্পরা মেনে চলে—তাও [illegible] নয়, জোর ছুটি আগের ধাপ, যার থেকে 'নতুন' emerge করেছে, এবং প্রত্যেক ধাপটি অন্যের সঙ্গে সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা। অতএব সেই ধাপের ফাঁকে অশ্বত্থ জন্মাচ্ছে শুনলে সিমেন্টেরই দোষ মনে হয়। সে সিমেন্ট ফেটে গিয়েছে, সে ফাটলের মধ্যে অশ্বত্থগাছের বীজই পড়েছে, তার মধ্যে কোন emergent quality-র বীজ পড়েনি।

অন্য প্রশ্ন ওঠে। নতুন কি হিসাবে পুরাতনের চেয়ে বড়? নতুনত্বই কি তার একমাত্র দাবী? এক যদি নতুন পুরাতনের অপেক্ষা বহুলাঙ্গ হয়—তাহলে দাবী খাটে। কিন্তু গঠনচাতুর্য্যের দিক থেকে অণু পরমাণু জীবকোষের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই, এই ত শুন্‌ছি। লয়েড্ মর্গ্যানের মনস্তত্ত্বে নীতিশাস্ত্রের বীজ রয়েছে। সেটা কতদূর বাঞ্ছনীয় বুঝতে পারি না।

সন্দেহ আবার ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি physico-chemical method মনের রাজ্যে এতই অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে হল্‌ডেন্-স্মাট্‌স্-সংবাদের পূর্ব্বে কোন পদ্ধতির সাহায্যে হল্‌ডেনের রিসার্চ্চে এত নাম হ'ল, যার খাতিরেই তিনি গিফোর্ড লেকচারার, বেতার-বক্তা হলেন? তিনি কি কখনও physiology-তে physico-chemical method অবলম্বন করেননি? তাঁর চোখের সামনে কি প্রত্যেক সমগ্রতা ল্যাবরেটারীতে যাবার পূর্ব্বেই ফুটে উঠত? জগদীশবাবুর ঐ রকম ফুটে ওঠে [illegible], বক্তৃতামঞ্চে ও লেখাতে তাইবলেছেন, কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটারীতে গেলে তাঁর চোখ দেখে ত তা মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টি reagent ও তার প্রতিক্রিয়ার ওপর নিবদ্ধ থাকে। ফিজিয়লজির প্রথম উপদেশ, ভাল ক'রে খেয়ে আত্মরক্ষা করা—সেটা তিনি পালন করেন না। আবার মজা এই যে, হল্‌ডেন্‌সাহেব লয়েড্ মর্গ্যানের মতকে অশ্রদ্ধা করেন। তিনি Holism-এর প্রতি নিতান্তই আস্থাবান। কিন্তু whole-টাই যদি একটা emergent quality হয়? হওয়া খুবই সম্ভব, তাঁর তর্কপদ্ধতি অনুসারে, রিসার্চপদ্ধতি অনুসারে নয়। ব্যাপারখানা এই—হল্‌ডেন্ ও মর্গ্যান্ দুজনেই সাধারণ যুক্তির ধারাবাহিকতা মানে না।

ইতিপূর্ব্বে প্যাভ্‌লভ্ পড়ি, বুঝতে পারিনি সব কথা, শেষে তার সম্বন্ধে দু-একটি বই পড়লাম। ওয়াট্‌সন্ বোঝা যায়। তাঁদের লেখা পড়ে আমার লয়েড্ মর্গ্যান ও হল্‌ডেনের বিপক্ষে আপত্তি জোর পেয়েছে। প্যাভ্‌লভ্ হচ্ছেন physiologist, অতএব মানুষ জীবজন্তু থেকে কোথায় ও কতটুকু পৃথক ও এক, এইটা আবিষ্কার করাই হ'ল তাঁর কাজ। মানুষের আছে forebrain যার জন্যই সে অন্যান্য [illegible]

মতন জড়প্রকৃতির ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন। মস্তিষ্কের এই সামনের অংশটাই হচ্ছে conditioned behaviour-এর কাঠামো। অতএব মানুষ পৃথক হ'ল এই হিসেবে যে সে অন্যান্য জন্তুর চেয়ে বেশী সংখ্যক conditioned behaviour গ্রহণ করে অভ্যাসে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তিনি মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করেননি—পরীক্ষা করেছেন কুকুর নিয়ে। তাতে তাঁর সিদ্ধান্তের কিছুই আসে যায় না, বরঞ্চ ভালই হয়—জুলিয়ান্ হাক্‌সলি ও ওয়েল্‌স্ অকাট্য যুক্তির দ্বারা দেখিয়েছেন। প্যাভ্‌লভের পরীক্ষার কুকুরটা প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা এই যে, ব্যবহারের কার্য্যকারণ ঠিক হচ্ছে physico-chemical process-এর দ্বারা, এবং পরীক্ষাগারে কুকুরে মানুষে তফাৎ নেই। পরীক্ষার ভেতর তাঁর কোন অসাবধানতা আছে কেউ বলেছেন শুনিনি। গোল বাধে তাঁর সিদ্ধান্তকে সমাজতত্ত্বে খাটাতে গিয়ে। প্যাভ্‌লভের মতে শিক্ষিত হবার ক্ষমতাই যখন মানুষকে পৃথক করে, তখন সমাজের অনেক কর্ত্তব্য জুটল, আমাদের উন্নতিতে আমাদের অনেক হাত আছে ভাবাই আমাদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে উঠল। ওয়াট্‌সন্ একবার বলেছিলেন—আমি যে কোন শিশুকে জোয়াকিমের মত বাজিয়ে ক'রে তুলতে পারি। আমাদের এখনকার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অন্য কথা বলেন। আমেরিকায় কি হয় জানি না, তবে ভারতবর্ষের কোন শিক্ষক conditioning-এ অতটা বিশ্বাসী হ'তে পারেন না। পাকা idiot-কে ওয়াট্‌সনের মতন অধ্যাপকও করা যায় না। মোদ্দা কথা, inheritance মানতেই হবে। হাঁসপাতালের শিশু মা বাপের কোলের খোকাও নয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত আমরা করবই করব, তবে আমাদের ভুল বৈজ্ঞানিকের ঘাড়ে না চাপালেই হ'ল। ওয়াট্‌সনের কথা ছেড়ে দিচ্ছি—তাঁর রিসার্চ্চএর একটা news-value হয়েছে। অভাগা প্যাভ্‌লভ্ রাশিয়ায় জন্মেছিলেন—যে দেশের সবই খারাপ, তাই রক্ষে! সেইজন্য তাঁর কাজে খাদ মিশতে পায়নি, তাঁকে Gifford Lectures দিতেও ইংরেজ ডাকেনি। তাঁর কৃতিত্ব হ'ল এই যে, জীবজগতের ব্যবহারের অনুসন্ধানে তিনি সেই পুরাতন mechanistic রীতি নীতি পদ্ধতি ছাড়েননি, physiological functioning মস্তিষ্কের বিচিত্র ব্যবহারের ব্যাখ্যাতে physico-chemical reaction-এর ওপর নির্ভর করেন, কোন emergent value তিনি লক্ষ্য করেননি, অতএব মানেননি, জীবের আর অজীবের মধ্যে ব্যবধান আছে স্বীকার করেও নতুন পদ্ধতি, নতুন যুক্তি গ্রহণ করেননি, সব যেন একসূত্রে বাঁধা এই ভেবেই তিনি কাজ ক'রে আসছেন। সেইজন্য, যদিও তাঁর কুকুর পোষা, ল্যাজ নাড়ে, মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে, তবুও তাঁর পরীক্ষায় কোন গলদ কেউ পায়নি, এবং তাঁর মতের এতটা সামাজিক মূল্য আছে। কি করে তার মত সমাজে খাটাব—সে কথা হচ্ছে না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে, অন্য বিদ্যা এখনও পেছিয়ে রয়েছে। জীবতাত্ত্বিকের প্রকৃতিভক্তিকে তিনি নাড়া দিয়েছেন, কিম্বা ভাইসম্যানের genetic determinismকে তিনি খণ্ডন করেছেন বলে তিনি মহালোক নাও হ'তে পারেন। আমার তরফ থেকে তাঁর মহান কীর্ত্তি হ'ল এই যে, তিনি, ডারুইনের মতনই, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যের নালাটির ওপর সেতু তৈরি করেছেন। ডারুইন যা করবার সুযোগ পান নি, তিনি এ যুগে বেঁচে তাই পেয়েছেন—তাঁর সেতুটি নিতান্তই mechanistic method-এ তৈরি। এ সেতুর ওপর জোর করে হাঁটা যায়, তার ওপর দিয়ে সৈন্য চালিয়ে অজ্ঞানতার রাজ্য আক্রমণ

করা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের ভৌগলিক সীমা বাড়ান যায়। এই সমালোচনার দিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব হ'ল এই যে, ব্যবহারের mechanistic ব্যাখ্যা ক'রে তার জন্য physico-chemical পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে, লয়েড্ মর্গ্যান্, হল্‌ডেন্ ও স্মাট্‌সের ইমারৎ তিনি ধূলিসাৎ করেছেন।

এ ত গেল ওঁদের বিপক্ষে আপত্তি। পুরাতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির স্বপক্ষে উক্তিও আছে। ধরা যাক, ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, প্রত্যেক স্তরের বিশেষ গুণ প্রকাশ হচ্ছে টের পাচ্ছি, কিন্তু তাই বলে নিম্নস্তরের পদ্ধতি (physico-chemical, mechanistic method) উচ্চস্তরে খাটবে না প্রমাণিত হয় কি ক'রে? Mechanistic ব্যাখ্যাতে কি বলে নতুন কিছু হ'তেই পারে না, কিম্বা যখন নতুন কিছু হয় তখন তাকে সে ব্যাখ্যা ফুঁয়ে উড়িয়ে দেয়, নেই নেই ক'রে, সাপের বিষের মতন? রসায়ন শাস্ত্রে যখন কার্ব্বনের ক্রিয়া বোঝা যায়নি, তখন অর্গানিক কেমিষ্ট্রির জন্য কি ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল? Urea-র ব্যবহারও কি তখন emergent মনে হয়নি? হেনরী সাহেবের মনে হয়েছিল তাই, তবু Wohler তাকে synthesise করবার জন্য তার প্রত্যেক উপাদানটি বিশ্লেষণ করেছিলেন সেই পুরাতন উপায়েই, নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনও অনুভব করেননি।

শুধু তাই নয়, স্তরই যদি মানতে হয়, তাহলে ভাল করেই মানা যাক। অণু ও পরমাণুকেও দুই স্তরে ভাগ করা যায়, প্রত্যেকটি নিয়ে বিশেষ বিজ্ঞান রয়েছে। আবার পরমাণুর মধ্যেও ইলেক্‌ট্রণ, তার মধ্যে প্রোটোন পদার্থ ও তার কত রকম— প্রত্যেকের খেয়াল আলাদা আলাদা সকলে বলেছিল। প্রত্যেকটাই নতুন বলে প্রত্যেকটির ব্যাখ্যার জন্য কি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? তা করা হচ্ছে না। না ক'রেও পদার্থ বিজ্ঞান এত এগিয়ে গিয়েছে। তাহলে দাঁড়াল এই যে, প্রত্যেক জিনিসের একটা বিশেষত্ব আছে,—কে এ কথা অস্বীকার করছে? কেননা, স্বীকার করতে কারুর বুদ্ধিতে টান পড়ছে না। এর মানে, প্রত্যেকের প্রত্যেকত্ব আছে। কথাটা খুব দামী নয়—tautology মাত্র। এই সব কারণেই মনে হয় Emergent Evolution, Holism প্রভৃতি গালভরা নাম নিজেদের অজ্ঞানতা ঢাকবার আবরণ মাত্র। অজ্ঞানতা একটা মানসিক অবস্থা, যেটি fact, ব্যাখ্যা নয়। বিজ্ঞানও ব্যাখ্যার একটা পদ্ধতি মাত্র, এ যুগের সব চেয়ে ভাল ও ব্যাপক পদ্ধতি। সেটা আর কিছু নয়। সৌজাত্য বিত্থার বই খুলে সুপ্রজনন সম্ভব নয়, সোনার চাঁদ ছেলে কোলে আসে না—এলে পরে তার দ্বারা উৎপত্তির ব্যাখ্যা হয় মাত্র।

যদি ব্যাখ্যার বেলা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিতান্তই অসম্পূর্ণ হয়, প্রত্যেক স্তরে নতুন নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় (পদার্থের বেলায় এক রকম, আর মানুষের বেলা dramatic—যেটা বস্তুত animistic ছাড়া অন্য কিছু নয়) তাহলে এতদিন mechanistic ব্যাখ্যার দ্বারা এতগুলি ভিন্ন ধরণের ও গঠনের ব্যাখ্যা হল কি করে—এ প্রশ্ন বৈজ্ঞানিক যদি তোলেন, তাহলে ভাল উত্তর বোধ হয় এঁদের কাছে পাওয়া যাবে না।

বিজ্ঞানের আদৎ কথা logical continuity, পদ্ধতির সাতত্য, অবিচ্ছিন্নতা; দর্শনের গূঢ় কথা, প্রত্যেক বাক্যের assumption-গুলি যুক্তিতে টেঁকে কিনা দেখা। সে জন্য হয়ত নব্য ন্যায়ের দরকার হবে, হয়েওছে। কিন্তু তার পদ্ধতি কি বিচ্ছিন্ন, বিরত, সান্তর? তাও নয়। Mechanistic ব্যাখ্যার জয়জয়কার যুক্তির

সাতত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানে সান্তরতার ছড়াছড়ি হয়েছিল, কয়েকদিন পূর্ব্বে, এখন উল্‌টো সুরও গাওয়া হচ্ছে। সে যাই হোক, ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থাৎ Conceptual জগতে Continuity রাখতেই হবে। আমার এই ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে লয়েড্ মর্গ্যান্, জেনিংস্, হল্‌ডেনের মতের ওপর Occam's razor চালাবার প্রয়োজন রয়েছে।

মোদ্দা কথা এই যে, তর্কের দ্বারা mechanistic explanation-কে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার vitalistic, holistic কি emergent evolution-এর ব্যাখ্যাকেও গ্রহণ করা যায় না। Mechanistic explanation, আর দর্শনের জড়ত্ব কি দেহাত্মবাদ এক নয় মানতে হয়, এবং মানলেই আপাতত বাকীটা বেশ চলে যায়। সমাজতত্ত্বে কিন্তু ঐ প্রকার physico-chemical, কি mechanistic ব্যাখ্যা খাটাতে পারি না। অন্যে যে কারণে খাটাতে রাজি হন্ না, আমি হয়ত ঠিক সে কারণে গররাজি নই। আমার গোলমাল বাঁধে অজ্ঞানতা, সাধনার অসম্পূর্ণতায়। পরে হয়ত সে ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যবহারেও চলবে, কিন্তু ততদিন হয়ত বিশ্ব ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। ততদিন কি করা যায়? এক উপায় আছে—ডি, এল্, রায়ের বুড়োবুড়ীর ঝগড়ার মতন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের কি Humanism-এর কলহকে লঘুক্রিয়া বলে ছেড়ে দেওয়া। বই পড়ে তাও পারি না, সব কিছুকেই গম্ভীরভাবে নিতে হয়, এমন কি বৈজ্ঞানিকের দার্শনিক মতকেও। এ-সব বইএর একমাত্র সমালোচনা হচ্ছে হেসে উড়িয়ে দেওয়া। আর এক উপায়, চুপ করে রিসার্চ্চ করা, তাতে কিন্তু ঘাম ঝরে। সেই জন্য সন্দেহ-দোলাতেই দুলতে হয়।

পাকা মাতালরা সকাল বেলা আর এক চুমুক টেনে গত রজনীর উচ্ছৃঙ্খলতার খোঁয়াড়ি ভাঙে। মহাজনদের পন্থা অনুসরণ ক'রে, Calverton-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি। মতটাকে রীতি নীতি ও মতির মতনই দরকারি মনে করা সমাজতান্ত্রিকের নেশা ও পেশা। লোকে কেন একটি মত ছেড়ে অন্য মত বরণ করে আমাদেরকে দেখাতে হয়। তাই দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক বলছেন Cultural Complex-এর পিছনে যে শক্তি কাজ করে সেটা vested interest-এর। "It is not what has usually been called the truth of their doctrine which makes them so powerful, but their adaptability to other interests, class-interests in the main, which they subserve. It is these other, these more basic, interests that turn these ideas into cultural compulsives." "The cultural compulsive represents the group-interest in its psychological form"। এ মন্তব্যে অনেকটা সত্য নিহিত রয়েছে। বিবাহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়েষ্টারমার্কের মতামত ভিকটোরীয়ান যুগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোমত হয়েছিল বলেই তার বহুল প্রচার হ'ল, আবার ঐ সম্বন্ধে মর্গ্যানের মত সোশিয়ালিষ্টরা গ্রহণ করলো নিজেদের শ্রেণীর আশানুযায়ী সম্পত্তিবিভাগের সমর্থন হয় ব'লে। আজ যদি পৃথিবীতে অর্থকষ্ট না থাকত, তাহলে কার্ল মার্কসের ইকনমিক ব্যাখ্যা কেউ গ্রহণ করত কি? মনো-কষ্ট পেলে লোকে ধার্ম্মিক হয়, সে মনোকষ্টের প্রকৃতির উপর ভগবান আকার হবেন কি নিরাকার হবেন নির্ভর করে। তার উপর আবার মানুষের স্বভাবে চরিত্রগত

পার্থক্য রয়েছে। Extravert না হ'লে হগ্‌বেনের publicist point of view গ্রহণ করা যায়? আমেরিকাতেই ওয়াট্‌সন্, মিলিক্যানের optimism, বেলজিয়ামের লেমায়তার-এর pessimism, war weary পৃথিবীতেই এডিংটন্, জীন্সের মত খাপ খায়, আর ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষের মধ্যবিত্তের মধ্যে তাঁদের মতের প্রচলন হওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়। যে কোন মতের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত আগ্রহ, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মতৃপ্তি, ভয়ভাবনা, আশাভরসা, প্রভৃতি বাজে জিনিষের খাদ এত মেশান থাকে যে, তার কতটুকু সত্য, আর কতটুকু মিথ্যা বলা একরকম অসম্ভব। হগ্‌বেনের ভাষায় বলতে গেলে,—কাঠগড়ায় এখনও মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিচার এখনও চলছে, রায় বেরোবার আগে ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা নিয়ে অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করলে Contempt of Reason হবে।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

The Sound and the Fury—WILLIAM FAULKNER (Chatto & Windus), **All Passions Spent**—V. SACKVILLE WEST (The Hogarth Press), **The Grasshoppers Come**—DAVID GARNETT (Chatto & Windus).

উইলিয়ম্ ফক্‌নারের দ্বিতীয় পুস্তক "দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি" একটি [illegible] পরিবারের অধঃপতনের ইতিহাস। বাপ মাতাল, মা চিররুগ্ন স্বার্থপর ও [illegible], এক ছেলে জন্মমূঢ়, আরেক ছেলে আত্মঘাতী, তৃতীয়টি সয়তান, মেয়ে স্বৈরিণী, দৌহিত্রী হট্টচারিণী, আত্মীয়স্বজন পরান্নজীবী, পরিচারকবর্গ নিগ্রোজাতীয়, অশিক্ষিত ও উৎপীড়িত। উপন্যাসখানির মধ্যমণি হচ্ছে মেয়ে ক্যাডি; লোকনিন্দার ভয়ে গর্ভবতী ক্যাডি একটি অভাজনকে বিয়ে করে; কিন্তু বেশিদিন তাকে স্বামী-ঘরে থাকতে হয়নি, কুইন্‌টিনের জন্মের খবর যখন আর ছাপা রাখা গেলো না, তখন সে শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এই মুখ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ওই অসাধারণ পরিবারটির দুর্দ্দশার ইতিবৃত্ত চার পর্ব্বে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ড ক্যাডির অবোধ ভাইটির লালায়িত প্রলাপ। তার মনে কার্য-কারণের শৃঙ্খলা নেই, অতীত আর অধুনা হরিহর আত্মা, আত্মীয় ও পর দু-ই সমান অনিষ্টকারী। এই অসম্বন্ধ প্রাণের উন্মাত্র নির্ব্বুদ্ধিতার একমাত্র আধারবিন্দু হচ্ছে ক্যাডি। তাই বেন্‌জি কিছুতে মানতে চায় না যে, ক্যাডি এখন অজ্ঞাতবাসিনী, ক্যাডি এখন মধ্যবয়সে পা দিয়েছে, ক্যাডি আর কখনো তার পিতৃগৃহে ফিরবে না। সেই জন্যেই সন্ধ্যাবেলা স্কুলের মেয়েরা যখন ঘরে ফেরে, বেন্‌জি তখন বাগানের রেলিঙের ভিতরে মুক্তিকামী পশুর মতো ছুটোছুটি করতে করতে ভাবে, তার বোনও বুঝি ওই মেয়ের দলে লুকিয়ে আছে; সেই জন্যেই গল্‌ফ্‌কোর্সে খেলোয়াড়েরা যখন অনুচরকে 'ক্যাডি'কে ডাকে, তখন তেত্রিশ বছরের বেন্‌জি ককিয়ে কেঁদে ওঠে পাঁচ বছরের ছেলের মতন।

দ্বিতীয়ভাগে ক্যাডির আত্মঘাতী ভাইটির চরমোক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছে। মুমূর্ষুর মনেও কালসংজ্ঞা খুব সতেজ নয়, তাই এ-খণ্ডও নৈয়ায়িক পরম্পরার কোনো ধার

করে না। মৃত্যুর প্রদোষান্ধকারে নিত্যনৈমিত্তিকের সীমাসন্ধি লুপ্ত হয়ে এসেছে, [illegible] ঘটনার স্রোত স্মৃতির উন্মন্থনে আবিল, বক্ষের মধ্যে চলেছে কান্নাহাসির মল্লযুদ্ধ। কুইন্‌টিনের প্রাণও ক্যাডিগত, সেইজন্যে ক্যাডির চরণচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনও শিথিলবৃন্ত হয়ে পড়ে,—এর পরে, মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণতি। কিন্তু একটা কথা এখানে অবশ্যবক্তব্য, কুইন্‌টিনের আত্মহত্যার মূলে অবিমিশ্র ভ্রাতৃভাব না-ও থাকতে পারে।

তৃতীয়কাণ্ডের উত্তমপুরুষ ক্যাডির কনিষ্ঠভ্রাতা জেসন্। এখানেও পিছন ফিরে সিংহাবলোকনের অভাব নেই, কিন্তু মুখ্য ব্যাপারটা সদ্যস্তন। এ-অধ্যায়ের প্রধান পাত্রী আর ক্যাডি নয়, ক্যাডির কানীন কন্যা কুইন্‌টিন্। ক্যাডি এখন সুদূরপরাহত ঝড়ের মতো, তার তর্জ্জনগর্জ্জনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে কানে বাজে বটে, কিন্তু তার বিদ্যুৎবিলাসে চোখ আর ঝলসে যায় না। না, উপমাটা ঠিক হলো না; সে সুদূর হতে পারে, কিন্তু পরাহত কোনোমতেই নয়ঃ যুগযোজনের আড়াল থেকে তারি ছবি এই পরিবারটিকে ধ্বংসপথের পথিক্ ক'রে রেখেছে। ক্যাডির কন্যা কুইন্‌টিন্ উপলক্ষ মাত্র, জেসনের অদ্ভুত প্রতিহিংসা আসলে ক্যাডিকেই আঘাত করতে চায়। এ-পরিচ্ছেদটায় কালের গতি সহজ, সঙ্গতি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবু সমস্ত দুষ্পাঠ্য বইখানার মধ্যে এই অংশটাই বোধহয় সব চেয়ে কষ্টপাঠ্য। জেসনের সমান সয়তান জীবনে তো বিরল বটেই, এমন কি সাহিত্যেও খুব সুলভ নয়, কিন্তু তার হাবভাব-ক্রিয়াকলাপের মধ্যে এমন একটা বাস্তবিকতার ছাপ আছে যে, মনে হয় ও-রকমের মানুষের পরিচয় আমরা পথে ঘাটে প্রায়ই পেয়ে থাকি। পাঠকের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি ভয়ে ভয়ে নিজের অন্তরে অন্বেষণ ক'রে দেখে ওই অমানুষিকতার মূল আপনার মধ্যেও নিহিত আছে কিনা।

আখ্যায়িকার উপসংহার ধ্রুপদী নাটকের মতো নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু শেষাঙ্কের সূত্রধার নিগ্রোপরিচারিকা ডিলসি, তারি কণ্ঠের নেপথ্যে লাঞ্ছিত, নির্জ্জিত ও নির্ব্বল বিশ্ব আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। লেখকের আবেগ সংরক্ত হলেও অসংযত নয়। ফলে তিনি নিগ্রোনিগ্রহের বিষয়ে এখানে ওখানে যে ইঙ্গিত করেছেন, তা কখনো আর্টভ্রষ্ট হয়ে হিতৈষিণার ভাবালু পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি। কারণ এই সকল মন্তব্যের মধ্যে তর্কের কোনো চেষ্টা নেই, আছে কেবল অনুকম্পনের ঝঙ্কার, আছে কেবল আবেগের ছন্দ। এই জন্যেই বোধহয় বইখানার ভিতরে এমন অনেক বচন আছে, যেগুলোকে গদ্য বলা চলেনা, কাব্য আখ্যা দিতে হয়, কারণ মনের দরবারে গদ্যের আবেদন পৌঁছয় যুক্তির মারফতে, কিন্তু কাব্যের দাবি মধ্যস্থের তোয়াক্কা রাখে না, মোক্তারকে ডিঙিয়ে বিচারকের চিত্ততন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

"দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি"র মতো বইয়ের সারসংগ্রহ করতে যাওয়ায় দুঃসাহসিকতা আছে, উপরোক্ত সংক্ষেপ সম্পূর্ণতার গর্ব্ব করে না, ওটা আংশিক, অত্যন্ত আংশিক। মূল গল্পটি ঋজু হলেও, পুস্তকখানি গ্রন্থিল, তাতে শাখা-প্রশাখার অভাব তো নেই-ই, বরং ডালপালার আধিক্যে পাঠক প্রায়ই দিশা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই বাহুল্যকে অবান্তর ব'লে ভাবলে অন্যায় হবে। মণিশিল্পীর হাতে নিটোল হীরে যখন শতমুখী হয়ে ওঠে তখন তার দাম যেমন বাড়ে বই কমেনা, রূপকারের স্পর্শে গল্পের অবস্থাও হয় তেমনি,—শত বাতায়ন দিয়ে সহস্র রশ্মি এসে গল্পের অন্তম ঐক্যটিকে

উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে। উপন্যাসের এই অদ্বৈত সাধিত হয় অবৈকল্যের জন্যে। এই অবৈকল্যের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটির কোনো [illegible] নেই, এটা তার লেখার একটা সাত্ত্বিক গুণ যার আশীর্ব্বাদে অতিবড় [illegible] পাঠকের মনে সত্য ঘটনার পাশে আসন পায়। এই অসাধ্য সাধন যুক্তির [illegible] সিদ্ধ হয় না, সম্ভব হয় আবেগের অনুকম্পনে। ফক্‌নার এই দুর্লভ [illegible] অধিকারী।

আধুনিক বিজ্ঞাপনের দিনে অসাধারণ শব্দটার অপপ্রয়োগ সর্ব্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উইলিয়ম্ ফক্‌নারের লিপিনৈপুণ্যসম্বন্ধে ওইটাই একমাত্র বিশেষণ। এই আপাত-উচ্ছৃঙ্খল বইখানির সংযম ও মাত্রাজ্ঞান সত্যই বিস্ময়কর। লেখকের হাতে কলম কেবল শব্দগঠনের উপকরণ নয়, একেবারে অলক্ষ্যভেদী বাণ। [illegible] নিষ্কম্প নির্ণয়ে অন্তরের নিভৃততম অন্তঃপুর পর্য্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। এই [illegible] প্রথম উপন্যাস "দি সোল্‌জারস্ পে" পড়ে আর্নল্ড্ বেনেট্ বলেছিলেন, [illegible] কথাসাহিত্যের ভাবী সম্রাট্। সে ভবিষ্যদ্বাণী "দি সাউণ্ড্ এণ্ড্ দি ফিউরি"তে হয়তো সফল হয়নি কিন্তু পুস্তকখানির প্রতিঅক্ষরে যে-মহান প্রচেষ্টার পরিচয় আছে, তার সামনে সাহিত্যসেবীমাত্রকেই মাথা নোয়াতে হবে। মানুষের চৈতন্যস্রোতের [illegible] যত উপন্যাস সম্প্রতি অকূলে ভেলা ভাসিয়েছে, তাদের মধ্যে এইখানির গতি [illegible] চেয়ে দ্বিধাবিরহিত। গতির নিশ্চয়তা অবশ্য গন্তব্যে পৌছনোর নামান্তর নয়। উপরন্তু গল্পটি বীভৎস, এত কুৎসিত গল্প গত কয়েক বছরের মধ্যে পড়েছি ব'লে মনে হয় না; এবং রচনারীতির ঐচ্ছিক দুরূহতায় আখ্যানভাগের ভয়ঙ্করতা বেড়েছে বই কমেনি। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, উপন্যাসকে যাঁরা অবসরের সাথী ব'লে নিয়েছেন করেন, কল্পনার বৈচিত্র্যময় রোমহর্ষণে জীবনের নির্ব্বিকার গ্লানিকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে চান, চিন্তার জ্বালা জুড়তে ডুব দেন কথাসরিৎসাগরে, এ-বই তাঁদের [illegible] না-পড়াই ভালো। কিন্তু যাঁরা বিশুদ্ধ চিন্তার ভক্ত, সাধনাকে যাঁরা সিদ্ধির চেয়ে [illegible] ক'রে দেখেন, উপাখ্যানের ঊর্ণাতন্তুর অবলম্বন খোঁজেন জীবনসৌধের কোণে কানাচে, তাঁরা হয়তো মানব-মনের অন্ধকার মহলে এই ক্ষণিক প্রদীপ জ্বালানোর জন্যে উইলিয়ম ফক্‌নার্‌কে ধন্যবাদ জানাবেন।

"দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিউরি" শেষ করার পরে "অল প্যাসন্‌স্ স্পেন্ট্" [illegible] হাতে নেওয়া ঝঞ্ঝাবাতের উন্মত্ত কোলাহল থেকে নিবাত নিষ্কম্প দীপালোকে [illegible] মতো। শ্রীমতী সাক্‌ভিল্ ওয়েষ্টের শেষ উপন্যাসখানিতে একটা প্রচ্ছন্ন প্রজ্ঞার [illegible] মিলে যেটা সত্যসত্যই সমস্ত চিত্তবেগকে অতিক্রম ক'রে গেছে। শুনেছি লেখিকার বয়স খুব বেশি নয়, তবে তিনি এই বানপ্রস্থ-নির্ব্বাণের সন্ধান পেলেন কোথা থেকে? বইখানি একটি অশীতিপর বৃদ্ধার মানসজীবনের ইতিহাস। লেডি স্লেনের স্বামী কর্ম্মবীর ছিলেন। তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার সম্মুখে কোনো দ্বার বন্ধ থাকেনি, ভারতের উপরাজত্ব থেকে সুরু ক'রে ইংলণ্ডের প্রধান সচিবের গদী পর্য্যন্ত সমস্ত পদই তিনি একদিন-না-একদিন অলঙ্কৃত করেছিলেন। ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব পূর্ণ পরিণতি পেলো বটে কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণীর ব্যক্তিস্বরূপ সমাহিত হলো, কারণ লেডি স্লেনের প্রতিভা ছিলো তাঁর স্বামীর বিপরীত, অর্থাৎ ভাবয়িত্রী। বিবাহের পূর্ব্বে লেডি স্লেনের ইচ্ছা ছিলো চিত্রকর হবার; কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষা যখন ভাবী স্বামীর কাছে

পৌছলো, তখন স্লেন উত্তর দিলেন যে, শিল্পনিপুণা মেয়েদেরই তিনি পছন্দ ক'রে থাকেন, এবং তাঁর স্ত্রী যদি তাঁদের পর্য্যটনকালে বিদেশের উধাও স্মৃতিগুলিকে চিত্রার্পিত ক'রে রাখতে পারেন তাহলে স্বামী খুসিই হবেন। এর জবাবে লেডি স্লেন বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তিনি যে-ধরণের ছবি আঁকতে চান, তা দিয়ে সচিত্র ডায়েরি লেখা অসম্ভব; কিন্তু স্লেন হেসে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, অবিলম্বেই অন্য রকমের এত স্বষ্টির ভার তাঁর উপরে অর্পিত হবে, যে আসল কলাচর্চ্চার প্রবৃত্তি বা অবকাশ তাঁর থাকবে না। এর পরে চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিলো না এবং শীঘ্রই সন্তানসন্ততির অবিচ্ছিন্ন পরম্পরায় লেডি স্লেনের শৈশবস্বপ্ন আর মাথা তোলার ফাঁক পেলোনা। কিন্তু বিরতি আর বিলুপ্তি এক কথা নয়, কাজেই বিরাশী বছর বয়সে লেডি স্লেন যখন বিধবা হলেন তখন তিনি মৃত্যুর কবল থেকে চিত্রবিদ্যা শেখার উপযুক্ত সময় ছিনিয়ে নিতে না-পারলেও, পুত্রপরিজনের আগল থেকে আপনার পিঞ্জরিত স্মৃতিকে মুক্তি দিতে ইতস্তত করলেন না। ফলে তিনি খামখেয়ালী ব'লে প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করলেন বটে কিন্তু যে-কটি দুর্লভ বন্ধুর সন্ধান পেলেন তাদের কল্যাণে আজন্মের দুধের পিপাসা না-মিটলেও, ঘোল যে ভূরি পরিমাণে পাওয়া গেলো, তাতে আর সন্দেহ রইলো না।

এই কাহিনীটির পিছনে যদি কোনো মতামতের সূত্র থাকে, তবে তা শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফের "এ-রুম্ অফ্ ওয়ান্‌স্ ওন্"-নামক প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্যের অনুরূপ। এইজন্যেই অনেক সমালোচক এই উপন্যাসটির উপরে শ্রীমতী উল্‌ফের প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু আমার মতে "অল্ প্যাসন্‌স্ স্পেণ্ট্"-কে "এ-রুম্ অফ্ ওয়ান্‌স্ ওন" হতে ব্যুৎপন্ন বলা অন্যায়, কেননা শ্রীমতী উল্‌ফের উক্ত সন্দর্ভ স্বকীয়তার কোনো দাবি করতে পারে না। কয়েক বছর থেকে নারীজাগরণের যে-সাড়া শোনা যাচ্ছে, উভয় পুস্তকই সেই সাড়ার প্রতিধ্বনিতে মুখর। দুই লেখকই সমসাময়িক, সমজাতীয় এবং সমান ভাবে সচেতন; কাজেই এঁদের মনের একটা বাহ্য সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। ভিতরের মিল প্রকাশ পায় অভিব্যক্তির রীতিতে, এখানে এঁদের দুজনের ধরণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তা বোধ করি তর্কাতীত। শ্রীমতী উল্‌ফের মন অধিকরণনিষ্ঠ, কিন্তু শ্রীমতী স্যাক্‌ভিল্ ওয়েষ্ট্ অন্বয়ধর্ম্মী, অর্থাৎ প্রথমা মানসচারিণী কিন্তু দ্বিতীয়া মানুষপন্থী, একজন বিকলনে সিদ্ধহস্ত, অন্যজন সঙ্কলনে অদ্বিতীয়।

আসলে উল্লিখিত পুস্তক-দুখানির মধ্যে অল্পবিস্তর প্রচারবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনো ঐক্য খুঁজে বার করা দুষ্কর। কিন্তু এই অতিরেকটুকু বাদ দিয়ে যদি কেবল আখ্যান-বস্তুটিকে নেওয়া যায়, তাহলে বোধহয় "অল্ প্যাসন্‌স্ স্পেণ্টে"র পূর্ব্বগামীকে আবিষ্কার করা সহজ হয়। আমি যে লেখিকার কথা ভাবছি, তিনি, যত দূর জানি, মাত্র একখানি বই লিখেছেন। কাজেই সেই অখ্যাতকুলশীল ঔপন্যাসিকটির সঙ্গে শ্রীমতী ওয়েষ্টের মতো লব্ধকীর্ত্তি কবির তুলনা করতে সমালোচকেরা সম্ভবত দ্বিধা বোধ করেছেন। কিন্তু লর্ণা রিয়ার 'সিক্‌স্ মিসেস্ গ্রীন্' যিনি পড়েছেন, তিনিই আমার কথায় সায় দেবেন। অবশ্য, শ্রীমতী ওয়েষ্টের হাত আরো পাকা, তিনি ইতিপূর্ব্বে 'এডোয়ার্ডিয়ান্‌স্'-নামক পুস্তকে তার ঔপন্যাসিক প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু তাই ব'লে প্রথম মিসেস্ গ্রীনের সঙ্গে লেডি স্লেনের রক্তের সম্বন্ধ শিথিল নয়। স্লেন-পরিবারের অন্যান্য চরিত্রগুলিও গ্রীন-পরিবারের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মতো অহংসর্ব্বস্ব

বাগ্ জীবন ও উপহাস্ত। এবং লেডি গ্লেনের প্রপৌত্রীর পাশে কনিষ্ঠ গ্রীনের স্ত্রী ভার্য্যাকে বসালে, প্রথমার প্রতি কোনো অবিচার করা হয় না। অবশ্য গার্ণেটের উপন্যাসে "অল্ প্যাসন্স্ স্পেণ্ট"র গভীর দার্শনিকতা নেই, কিন্তু উক্ত লেখিকা তরুণিমাকে একমাত্র আশা ভরসা ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন, এটা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কথাপ্রসঙ্গে উপরে নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুগত রচনার উল্লেখ করেছি। শ্রীমতী স্যাক্‌ভিল্ ওয়েষ্ট্ ও উইলিয়ম্ ফক্‌নার্, এঁরা দুজনেই কাহিনীর পাত্রপাত্রী হতে বিচ্ছিন্ন থাকার চেষ্টা করেছেন এবং মাত্রাভেদে কৃতকার্য্যও হয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ছুটি ধ্রুপদী গুণের পূর্ণ পরিণতি দেখতে চাইলে আজকের দিনে এক ডেভিড্ গার্ণেট ছাড়া গতি নেই। আজকালকার ইংরেজ কথকদের মধ্যে বোধহয় কেবল তিনি তাঁর রচনার আভ্যন্তরিক স্বায়ত্তশাসনে এমন কোনো ছিদ্র রাখেন না, যার ভিতর দিয়ে বহির্বর্ত্তী বুদ্ধির শনি সে-অন্তর্লোকে প্রবিষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ একা তাঁর গল্পই গল্প, গল্পের ছদ্মবেশে আত্মজীবনী অথবা সামাজিক নিবন্ধ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই রকমের পবিত্রতা বর্ত্তমান জগতে এতই বিরল যে, অধিকাংশ সমালোচকই গার্ণেটকে তাঁর প্রাপ্যটুকু দিতেও কুণ্ঠিত। তাঁদের মতে গার্ণেটের প্রথম দুটি গল্প "লেডি ইন্টু ফক্‌স্" ও "দি ম্যান্ ইন্ দি জু"-তে যে উৎকর্ষের সূচনা ছিলো এখনো পর্য্যন্ত তা সিদ্ধিতে পরিণত হয়নি। এঁদের বিবেচনায় "এ সেলার্স্ রিটার্ণ্", "গো শি মাষ্ট", "নো লাভ্" ইত্যাদি পুস্তকগুলির রচনারীতি নিখুঁত ও অনাড়ম্বর হলেও, ও-গুলির আখ্যানভাগ কেমন যেন কুয়াসাচ্ছন্ন, অর্থাৎ তাঁর লেখার চুনকামকরা সাদা দেওয়াল-গুলির পিছনে কি আছে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দুষ্কর। যদি বলা যায় যেখানে মতো ডেভিড্ গার্ণেট্ও সাদা দেওয়ালের অবিকল ছবি আঁকতে পারলেই তুষ্ট, দেওয়ালের পিছনের রূপকথার রাজকন্যার প্রতি তাঁর নজর নেই, তাহলে এঁরা লেখকের প্রথম কাহিনী দুটির দোহাই দিয়ে ব'লে থাকেন গার্ণেট্ রূপকরচয়িতা, অতএব তাঁর শুক্তির ভিতরে যুক্তির মুক্তা থাকতে বাধ্য।

অবশ্য মানতেই হবে যে, কল্পনাপ্রধান সাহিত্যমাত্রেই এক হিসেবে রূপক, অর্থাৎ কল্পনার জাদুতে পারিপার্শ্বিক বস্তুই রূপান্তরিত হয়ে কলাতে পরিণত হয়। এদিক দিয়ে দেখলে ডিফোর "রবিন্‌সন্ ক্রুসো" এবং গার্ণেটের "দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্" এ-দুই গল্পই রূপক। কিন্তু আমার মতে আসল রূপকের প্রবর্ত্তনা আর শিশুমনকে চিনির পাকে নিম খাওয়ানোর ইচ্ছা, ও দুইই এক পর্য্যায়ের জিনিষ। "রবিন্‌সন্ ক্রুসো" অথবা "দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্" ও-রকমের লোকশিক্ষার কোনো তাগিদ নিয়ে জন্মায়নি, এ-কথা আশা করি রসিকমাত্রেই স্বীকার করবেন। পক্ষপাত-ব্যতিরেকে শিক্ষক হওয়া অসম্ভব, এবং গার্ণেটের আর যা-ই দোষ থাকুক, তিনি পক্ষপাতবিবর্জ্জিত, তা-ও বোধহয় সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু এ-গুণটি আজকের দিনে এতই দুর্লভ যে, ওটিকে আমরা বিনাবাক্যে গ্রহণ করতে পারি না। গার্ণেটের স্বচ্ছ উপাখ্যানগুলির আড়াল থেকে একটা গুরুগম্ভীর লোকশিক্ষার প্রবৃত্তিকে টেনে বার করার ব্যর্থ চেষ্টার ব্যাখ্যা বোধহয় এইখানে।

গার্ণেটের রচনা সরল, স্বল্পাঙ্গ ও অহংজ্ঞানশূন্য ব'লে তাতে গুরুত্বের অভাব আছে, এমন কথা ভাবলে খুবই অন্যায় হবে। "দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্" বইখানির গল্প

অবশ্য অত্যন্ত লঘু। একজন স্বল্পমতি নারী স্থির করলেন যে, তিনি বিমানপথে হিন্দুস্থানে যাবেন। ইংলণ্ড থেকে হংকং পর্য্যন্ত উড়ে যাবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি একচক্ষু পাইলট্ নিযুক্ত হলো এবং এই পাইলটের তত্ত্বাবধানে শুভদিনে তিনি ও তাঁর প্রণয়ী বিমানবিহারে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথম রাত্রি বেশ নিরাপদে কাটলো, কিন্তু পরের দিন প্রত্যূষে এনজিনের দোষে এয়ারোপ্লেনখানি ধরাশায়ী হলো। পাইলট্ ওস্তাদ ছিলো, তাই যাত্রীদুটির গায়ে আঁচড়টি লাগলো না। কিন্তু তার নিজের পা গেলো ভেঙে। ভাণ্ডারে খাদ্যাভাব, নিকটে লোকের বসতি নেই, চারপাশে চৈনিক মরুর বিস্তার। কাজেই রমণীটি তাঁর প্রেমিকের হাত ধ'রে লোকালয়ের সন্ধানে চ'লে গেলেন; বিমানপোতে অন্নজলের যেটুকু ব্যবস্থা ছিলো, তা-ও তাঁরা ছেড়ে যেতে পারলেন না। পাইলট্ রইলো একা, বিনাখাদ্যে, আহত পায়ের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছাপন্ন। বলাই বাহুল্য, সে-স্ত্রীপুরুষ দুটির আর কোনো সন্ধানই মিললোনা, এবং পাইলট্টি অনশনে কণ্ঠাগতপ্রাণ হবার পরে, একদল পঙ্গপালের হঠাৎ সমাগমে, জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্টের দৃষ্টান্ত অনুকরণ ক'রে কোনোক্রমে আবার শক্তি ফিরে পেলো। এর অল্প পরেই একটি মাঙ্গলীয় এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে সে আবার মনুষ্যসমাজে ফিরতে পারলো।

এ-গল্প নিশ্চয়ই খুব হালকা। সেই জন্যেই বিস্মিত মন জিজ্ঞাসা করে, এর উপরে এত অভিজ্ঞতার ভর সইলো কেমন ক'রে? কাহিনীর আয়তন এক শ পাতা, আয়ু সপ্তাহ মাত্র, পাত্রপাত্রী তিনটি, অথচ বইখানি শেষ করবার পরে শুধু এই তিনটি ব্যক্তি নয়, জগতের অনেক জিনিসের সম্বন্ধেই পাঠকের অজ্ঞানান্ধকার পাৎলা হয়ে আসে। আর এ-পরিচয় কেবল মৌখিক নয়; গার্ণেটের ভাষা শুধু বস্তুমাত্রাকে জড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু সে-অবেষ্টন এতই নিবিড় যে তার সূত্রে প্রাণের নিগূঢ়তম স্পন্দন শুদ্ধ সঞ্চারিত হয়। একেই বলে অনুকম্পন। এ-অনুকম্পন স্বপ্রধান লেখকের মধ্যে কখনো দেখা যায়না, একে পাওয়া যায় আত্মবিসর্জ্জনের ফলে। দর্শক ও দৃশ্যের মধ্যে যখন সকল ব্যবধান অন্তর্হিত হয়, প্রবৃত্তি আর প্রবর্ত্তকের মধ্যে তিলার্দ্ধ স্থান থাকেনা, তখনই এই অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া যায়, নৈমিত্তিকের ঔরসে তখনই হয় নিত্যের জন্ম। 'দি গ্রাস্‌হপার্স্ কাম্'-এর মতো ক্ষীণাঙ্গ পুস্তক সম্বন্ধে এত বড় কথা না-খাটলেও, তার প্রণেতার মহৎ মনের সম্বন্ধে এ-প্রশংসা নিশ্চয়ই অতিকথন নয়। এ-বইখানি অমৃতের অধিকারী না-হতে পারে, কিন্তু যিনি এটির পরিকল্পনা করেছেন তাঁর ভাণ্ডারে সে-সনাতন ঐশ্বর্য্য লুকানো আছে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

মেঘ-মল্লার—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—প্রকাশক বরেন্দ্র লাইব্রেরী।

গুটিকয়েক ছোট গল্পের সমষ্টি। এঁর লেখা এই প্রথম পড়লাম—এবং একবার প'ড়েই চমৎকৃত হ'তে হয়েছে। উঁচুদরের গল্পলেখার যে প্রতিভা—যা

আমাদের দেশে দুর্ল্লভ,—এই বইখানির মধ্যে তারই সন্ধান পাওয়া গেল। উপর থেকে জানা যায়,—শরৎ বাবু লেখকের মামা। তাঁর ভাষাসম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে হয়তো ইনি পেয়ে থাকবেন,—রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার প্রভাব এবং প্রভাতকুমারের ঘটনা-বিন্যাসের পারিপাট্যও হয়তো গল্পগুলির মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু তা ছাড়াও অনেক নূতন জিনিষ আছে যা অপূর্ব্ব। এঁর ভাষায়, ভাবে এবং বর্ণন-ধারণে এমন একটা উচ্চ অঙ্গের বৈশিষ্ট্য আছে যা একেবারে নূতন, স্বতন্ত্র এবং অননুকরণীয়,—যা অতঃপর দেখবামাত্রেই চিনে নিতে বিলম্ব হবে না, এবং সাহিত্যের নূতন সম্পদ হিসাবে যার বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করা যাবে। এ-কথা বলবার অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ ভাষার উপর এঁর সহজ ও পাকা দখল। যেখানে যে রকম আবহাওয়া, যে রকম সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করতে চান, অনায়াসে তাই করতে পারেন এবং তাতে প্রাণ দিতে পারেন,—কথনো ব্যর্থ হ'তে হয় না। যেখানে যেমন অবস্থা, সেখানে তেমন কথা জোগাবার এঁর অদ্ভুত ক্ষমতা। সময়ের প্রয়োজনমত ভাষা কোথাও সমুদ্র-গর্জ্জনের মত গম্ভীর; কোথাও তটিনীর মত মৃদুগুঞ্জী; কোথাও মহান্ কল্পনার সঙ্গে তুচ্ছ কথার পাশাপাশি অপূর্ব্ব সমাবেশ। ভাষার উপর এমন অধিকার রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং দৈবাৎ হয়তো আরো এক-আধজন ছাড়া আর কারো নেই,—একটি মাত্র বই পড়ে এত বড় কথা বলতেও মনে দ্বিধা হয় না।

এঁর সবিশেষ কৃতিত্ব প্রকৃতির বর্ণনাতে। ওস্তাদ গায়কের গানের মাঝে থেকে থেকে যেমন তান-গিটকিরির দানা ছড়িয়ে সুরের খেলা এবং সেইটুকুই বড় মধুর, গল্পের মধ্যে তেমনি থেকে থেকে বাহ্যপ্রকৃতির অল্প একটু অবান্তর ছবি আঁকার খেলা। কোথাও দু-চার লাইনের বেশী বর্ণনার দরকার হয়নি—অল্প কথায়, অল্প উপকরণে এমন সব মনোরম ছবি স্থানে স্থানে খাপ্ খাইয়ে বসানো যে পড়তে পড়তে শতবার বাহবা দিতে হয়। এক-একটি বর্ণনা থেকে এক-একখানি বিভিন্ন Landscape Painting তৈরি করা চলে। গ্রাম্য ঝোপঝাড়, বনবাদাড়, নদীর ধার এঁর বড় প্রিয়। এই সব দৃশ্য অপর্য্যাপ্তভাবে লেখার মধ্যে এমন ক'রে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, পাঠকের অনুভূতির মধ্যে পল্লীপ্রকৃতির সুপরিচিত স্পর্শ ও গন্ধ প্রত্যক্ষ হ'য়ে ওঠে। পল্লীশোভা ইনি যে চোখে দেখেছেন, সে চোখ দিয়ে আমরা কখনো দেখিনি। যে সব ফুলে সাজি ভ'রে ইনি বাণীর অর্চ্চনা করেছেন, আগে কোনো সাধক সে ফুলে দেবীর পূজা করেনি। দ্রোণ, কাঞ্চন, ঘেঁটু, সজ্‌নে প্রভৃতি যাদের কাব্যে কখনো স্থান ছিল না, তারা যেন আজ নূতনরূপে ধরা পড়লো। শুধু তাই নয়। রসানুভূতির কোনো দিকই বাদ যায় নি। ভাষার মধ্য দিয়ে বর্ণ, গন্ধ, সুর, স্বাদ প্রভৃতি এমন নিপুণভাবে পরিবেশন করেছেন যে, সকলেই তৃপ্ত হবে।

আর এক নূতনত্ব এই যে, নরনারীর যৌনসম্পর্কের কথা, অর্থাৎ প্রেমের কথা এই বইখানির কোনোখানেই নেই। যে ভালবাসার কথা না হ'লে আজকাল গল্প লেখা হয় না,—আর হ'লেও জমে না,—তা এর মধ্যে একেবারেই নেই। কেন এমন করেছেন সে তাঁর অভিরুচি,—কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে, গল্পে তিনি যে নিরামিষ রান্না করেছেন তা চমৎকার। নারীচরিত্রের কামের দিকটা ছেড়ে দিলেও তার মধ্যে যে

মমতা, করুণা প্রভৃতি আরো অনেক কিছু থাকে। মেয়েদের এই সব অনাবিল কোমল মনোবৃত্তি নিয়েও যে উৎকৃষ্ট কাব্য বা কথাসাহিত্য রচনা করা যায় তা ইনি বেশ ভাল করেই দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের "অতিথি" প্রভৃতি কয়েকটি গল্পে এর উল্লেখ আছে, কিন্তু ইনি মেয়েদের এই স্নেহশীলতাটাকে অত্যন্ত বড় ক'রে দেখেন এবং বিশেষ ক'রে দেখাতে চান। এঁর "পথের পাঁচালী"র সমালোচনা পড়ে বুঝেছি তাতেও এই বিষয়ে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে এবং অসমাপ্ত "অপরাজিত" নামক উপন্যাস "প্রবাসী"র দুই-এক সংখ্যাতে পড়েও এই করুণাময়ী নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। প্রেম না হ'লে যে রোমান্স হ'তে পারে না সে কথা ইনিই বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রমাণ করেছেন।

রূপক হিসাবে এই কথাটারই আভাস দিয়েছে প্রথম গল্প "মেঘ-মল্লার"। গায়কের মেঘ-মল্লার গানে মুগ্ধা সরস্বতী আবির্ভূতা হ'য়ে বর দিতে চাইলেন, গায়ক সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনা করলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গী গুণাঢ্য দেবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকেই কামনা ক'রে বসলেন। তাঁকে না পেয়ে তান্ত্রিক গুরুর কাছে বন্ধনমন্ত্র শিখলেন এবং এক তরুণ গায়কের দ্বারা দেবীকে আহ্বান ক'রে তাঁকে সেই মন্ত্রে বেঁধে ফেল্‌লেন। কিন্তু তাঁকে পেয়েও কামনাতৃপ্তির সুবিধা হোলো না। দেবী মোহে আচ্ছন্ন, গুণাঢ্যের মনেও অশান্তি। সুতরাং গুরুর কাছে আবার মুক্তিমন্ত্র শিখতে হলো। তরুণ গায়ক দেবীকে এ-বাঁধন থেকে মুক্তি দিতে বদ্ধ-পরিকর। সে সন্ধান পেয়ে এই মুক্তিমন্ত্রের জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে তাঁকে কামনাবন্ধন থেকে মুক্তি দিলে, কিন্তু তার ফলে নিজে পাষাণ হ'য়ে গেল। তবু তার এই ভেবে সুখ যে, "বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার" সে পেয়েছে। কেউ চায় বাঁধতে, কেউ চায় মুক্তি দিতে। তাতে যদি পাষাণই হ'তে হয়,—তবু পাষাণের বুক থেকে কত যে নির্ঝরিণীর ধারা ঝরে, তার প্রমাণ এই বইয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়।

চরিত্রচিত্রণের দিক থেকেও এঁর বিশেষত্ব কম নয়। যে-সকল চরিত্র ইনি এঁকেছেন, সংসারে জগতে তাদের সাক্ষাৎ নিত্যই পাই, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা তাদের পক্ষে অবজ্ঞাপ্রসূ হয়নি। সুপরিচিত হ'লেও "উমারাণী," "পুঁইমাচা" "খুকীর কাণ্ড" ইত্যাদি গল্পগুলির পাত্রপাত্রীদের সহজে ভোলবার কোনো উপায় নেই, লেখকের দরদ তাদের শাশ্বত সম্ভ্রমের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"উপেক্ষিতা"-সম্বন্ধে লেখক বিনয় ক'রে বলেছেন যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম রচনা ব'লেই ওটিকে বইয়ে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু আমার মতে রসসৃষ্টি-হিসাবে এইটাই শ্রেষ্ঠ রচনা। এ তো গল্প নয়, একখানা ছবি। ভাষার তুলিতে মমতাবৃত্তিকে ফুটিয়েছেন। চিত্র হিসাবে এর নাম দেওয়া যেতে পারে, A portrait study—a life sketch with a perspective background। এ-ছবিতে শুধু একখানি মুখ, বাংলাদেশের পল্লীবধূর। ঘোমটায় মুখ ঢেকে নিত্য পুকুরঘাটে জল নিতে আসেন, তাঁর অন্য কোনো পরিচয় জানা নেই, তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক, কুটুম্বিতা নেই—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"। পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে জড়সড় হ'য়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন, কিন্তু সাহস-ভরে একবার সামনে গিয়ে বলো, "আমি আপনার ছোট ভাই, আপনি আমার দিদি," তাহলেই আত্মীয়তা ঘনিয়ে উঠবে। এঁদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো অতি সহজ, স্নেহ দেবার জন্য এঁরা উন্মুক্ত হ'য়ে আছেন। একবার

পরিচয় হ'য়ে যাক, তার পর ভাইফোঁটা, মিষ্টিমুখ, এমন কি পয়নাকড়ি পর্য্যন্ত হওয়া বিচিত্র নয়।

"উপেক্ষিতা" এমনি একটী দিদির ছবি। ঘোমটা কতকটা সরেছে, তার মধ্যে দিয়ে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাই যথেষ্ট, বাকিটা ঢাকাই থাক। উপনিষদের ঋষি যেমন রুদ্রের দক্ষিণমুখই কামনা করেছেন, বিভূতিভূষণও তেমনি এই পরিচয়টুকু চেয়েছেন, অন্য কিছু দেখতে চান না। এই আধো পরিচয়ের পরে অনেক দিন কেটে গেলো, ইতিমধ্যে নায়ক বিলেত, এমেরিকা, জাপান, কত দেশ ঘুরে এলেন। তার পর একদিন আরব সাগরের উপকূলে বসে সেই লক্ষ্মী, সেই স্নেহময়ী পল্লীবধূর স্মৃতি হঠাৎ মনে জেগে উঠলো। আনন্দের রঙে মাত্র কয়েকটী কথার আঁচড় টেনে সমস্ত জীবনের একটা দিগন্তবিস্তৃত আব্‌ছা পরিপ্রেক্ষিত গড়া হলো। "ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলাম একি মধু! কত নতুন দেশ, কত জ্যোৎস্নারাত্রি, নতুন বনঝোপের নতুন ফুল, কত যুঁইফুলের মত শুভ্র নির্ম্মল হৃদয়, কান্না-হাসির কত সে দূর স্মৃতি।" নায়ক হঠাৎ উদ্বেল হৃদয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে উঠলেন, "তুমি আজও কি আছ, আজও কি সেই রকম ভাঙ্গাঘাটে জল আনতে যাও?" পটভূমি পিছনে ফেলে ছবি উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো। "নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শাঁণবাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠেছে আর্দ্রবসনা তরুণী। মাটির পথের বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত জলসিক্ত পা দুখানির রেখা! স্নেহভরা বুকখানি জগৎসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অজ্ঞানতায় ভরা। তার পর যেন কোন্ খড়ের ঘর…মিটমিটে প্রদীপের আলো…মৌন সন্ধ্যা, শান্ত আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চমূলে মঙ্গলপ্রার্থিনী প্রণাম-নিরতা।"

এ যেন সেই impressionist school-এর ছবি, কয়েকটিমাত্র রেখা, মাঝে অনেকটা ফাঁক। চিত্রকর যত নিপুণ, রেখাও তত অল্প, তার মধ্য দিয়ে ছবিও তত স্পষ্টতর। না, এ শুধু চিত্র নয়। একেবারে দর্পণ। আমাদের মেয়েরা একবার পড়লেই নিজেদের এই দক্ষিণমুখটি দেখতে পাবেন। তা ছাড়া গল্পটির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে যে-দার্শনিকতাটুকু আছে, তাও বড় মর্ম্মস্পর্শী। "জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ-ছায়াশীতল পাখীর গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্ততঃ বর্দ্ধিত অযত্নসম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরি—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্ চিক্ করছে।"

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য

The Foundations of Experimental Psychology—International University series in Psychology. EDITED BY CLARK MURCHISON. Clark University Press, Worcester, Massachusetts. Second Printing.

মার্কিনবাসীদের মত উদ্যমশীল বোধ হয় আর কোন জাতিই নহে। তাহাদের ঐশ্বর্য্যও প্রচুর, সহায়সম্পদও যথেষ্ট। নূতন নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের এতটুকুও ইতস্ততঃ করিতে হয় না। এই International University Series

in Psychology আরম্ভ করা যে কিরূপ সাহসের কাজ তা যাঁরা এদেশে কোন একটা পারিভাষিক মাসিক, ত্রৈমাসিক কি চতুর্মাসিক পত্র চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই অবগত আছেন। কিন্তু Prof. Murchison কাজ আরম্ভ করিয়াই আন্তর্জাতিক মনোবিদদিগের সাহায্যে কয়েকখানি প্রয়োজনীয় ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ইতিমধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য পুস্তক তাহাদেরই একখানি।

মানুষের মন যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অধ্যয়ন করা যাইতে পারে কিছুদিন পূর্ব্বে এই ধারণাই লোকে করিতে পারিত না। এখনও অনেকে সে ধারণাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু অভ্যস্ত চিন্তাধারার বিপক্ষে যাইলেও, ১৮৭৫ সালে জার্ম্মান মনোবিদ্ Wundt লাইপ্‌জিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার স্থাপন করিলেন, তখন এই কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল। সেই অবধি এই বিষয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। কোন মানসিক তথ্য অনুসন্ধানে এই পন্থা কতদূর সাফল্য দান করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কিরূপে অগ্রসর হইলে অধিকতর সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে তাহারই আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে।

ইহাতে ২০টী অধ্যায়ে, বংশানুক্রম, হৃদয়াবেগ, কর্ম্মপ্রবণতা, শিক্ষা, ক্ষুধাতৃষ্ণা, সামাজিক ব্যবহার, সংস্কৃতি, মনোবিকার প্রভৃতি বিষয়গুলি বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই এমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতির অধ্যাপক ও শিক্ষক, কেবল দুইজন Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

মনের সহিত দেহের যে একটা যোগ আছে একথা সাধারণভাবে সকলেই জানেন। কিন্তু এই যোগ যে কত ঘনিষ্ঠ এবং মনোভাবের ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তনের সহিত দেহের স্নায়ুগ্রন্থি প্রভৃতির কিরূপ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন হয় তাহা কেবল মনোবিদ্‌রাই জানেন। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যাঁহারা মনের কার্য্যকলাপ অধ্যয়ন করিতে অগ্রসর হন দেহমনের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাঁহাদের কাছে একটা গোড়ার কথা। দেহতত্ত্বের আলোচনা মনস্তত্ত্বের আলোচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে, কারণ দেহের ভিতর দিয়াই মনের অভিব্যক্তি হয়। কিন্তু তাই বলিয়া দেহতত্ত্ব আলোচনা করাই মনস্তত্ত্ব আলোচনার একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃষ্ট পন্থা, এ-রূপ ধারণা নিতান্তই অসঙ্গত। কিন্তু যে প্রবন্ধগুলি Murchison এই পুস্তকে একত্রিত করিয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনে হয়, তিনি ঐ মতই পোষণ করেন। কারণ প্রায় সমস্তগুলিই "Physiological substrata of mind"-এর আলোচনা। বইখানিকে Foundation of Experimental Psychology না বলিয়া Foundations of .Physiological Psychology বলিলেই অধিকতর সমীচীন হইত। শরীরসংক্রান্ত মনোব্যাখ্যা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মানসিক কার্য্যকলাপের দিক্ দিয়া মনের ব্যাখ্যা করাই প্রকৃত মনোবিদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই পুস্তকে সেই চেষ্টার একান্ত অভাব। Titchener এবং Freud যে দিক্ দিয়া মনোবৃত্তি অধ্যয়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই দিক্ দিয়া কেহই আলোচনা করেন নাই।

কিন্তু যে কল্পনাকে মূলমন্ত্র করিয়া প্রবন্ধ গুলির সমাবেশ সাধিত হইয়াছে সেইদিক্ হইতে বিচার করিলে স্বীকার করিতেই হইবে যে বইখানি মনোবিজ্ঞানের একখানি

মূল্যবান গ্রন্থ। প্রত্যেক প্রবন্ধই নূতন তথ্যের নূতন ইঙ্গিতের এবং নূতন পথের সন্ধান বলিয়া দেয়।

T. H. Morgan বিশদ্‌ভাবে ও বহু উদাহরণের সাহায্যে The Mechanism and Laws of Heredity ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও বংশানুক্রমবিধির সাহায্যে সমস্যার কতদূর সমাধান হইতে পারে তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে কাজ হইয়াছে তাহার বিচার করিয়া সত্য হইতে অসত্যকে ও বাস্তব হইতে কল্পনাকে বিভিন্ন করিয়া আমাদের জ্ঞানের যথার্থ স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Forbes দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়াপ্রণালী বুঝিবার জন্য কোন বিশেষ প্রাণশক্তির কল্পনা অনাবশ্যক। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র-নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে সকল সমস্যারই সমাধান হইতে পারে। শরীরে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উৎপত্তিস্থান কোথায় এবং কোন অঙ্গের কিরূপ অবস্থার উপর উহাদের আবির্ভাব নির্ভর করে Cannon তাহা অতি সুন্দর ও সহজভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

কোন মানসিক আবেগ প্রবল হইলে তাহা শরীরের ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পায়। আমরা দুঃখ হইলে কাঁদি, আনন্দে হাসি। বহুদিন পূর্ব্বে William James এই সম্বন্ধে এক নূতন মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে এ বিষয়ে সাধারণের ধারণা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে ভাবে আমাদের দুঃখ হয় তাই কাঁদি, আনন্দ হয় তাই হাসি কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। আমরা কাঁদি তাই দুঃখ হয়, হাসি তাই আনন্দ হয়। যে জিনিষে আমরা ভয় পাই, সেই জিনিষ প্রথমে আমাদের শরীরের উপর কার্য্য করে, যাহার ফলে হৃদ্‌কম্প প্রভৃতি হয়; তাহার পর সঙ্গাবহা নাড়ীর সাহায্যে এই কম্পন প্রভৃতির খবর মস্তিষ্কে পৌছায়, তখন আমাদের আবেগ জাগে। বস্তুতঃ এই সমস্ত শারীরিক স্পন্দন প্রভৃতিরই নাম Emotion। Philip Bard এই মতের কতকটা সমর্থন করিয়াছেন, কেবল James কথিত স্নায়ুগ্রন্থি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে Thalamus-কে আবেগের ভিত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। Lashley শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনা করিয়া বলিলেন যে 'conditioned reflex'-এর সাহায্যে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক বুঝা যায় না। পরের প্রবন্ধে Hunter দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন conditioned reflex pricnple ধরিয়া লইলে সব শিক্ষাপ্রণালীই হৃদয়ঙ্গম হয়। শেষ কয়টী প্রবন্ধে শিশুজীবন, শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিপরীক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি কিরূপে অধ্যয়ন করা উচিত তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বইখানি মূল্যবান বই কিন্তু মনোবৃত্তি সমূহের যে একটী নিজস্ব সত্তা আছে একথা সময়মত মনে করিয়া সম্পাদক যদি সে-বিশ্বাসের সমর্থকরূপে আরো কয়েকটি প্রবন্ধকে পুস্তকখানিতে স্থান দিতেন তাহা হইলে বইখানির দাম যে আরও বাড়িত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুকন্তর্ত্তী

পাঠকগোষ্ঠী

["পরিচয়" প্রকাশিত প্রবন্ধাদি-সম্বন্ধে পাঠক-গোষ্ঠীর মতামত ব্যক্ত করিবার জন্যই এই পরিচ্ছেদের সূচনা। সমালোচনা পত্রাকারে ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

'পরিচয়'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, আপনাদের পত্রিকা একখণ্ড কিনিয়া পড়িয়া আমার মনোভাব জানাইবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে পারিলাম না। অবশ্য এ-কথাও জানি যে, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির মতামতে আপনাদের কিছু যায় আসে না—তবুও যে তাহা জানাইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ আমি যাহা অনুভব করিয়াছি তাহা আন্তরিকভাবেই করিয়াছি। আপনাদের পত্রিকা কিনিয়া পড়িয়াছি, এ কথা দশজনের সম্মুখে বলিতে আমার কোন কুণ্ঠা নাই—কারণ আমি সে দলের পেশাদার লেখক নয়, যাঁহারা কোন পত্রিকা উপহারস্বরূপে না পাইয়াও তাহা কিনিয়া সমালোচনা করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে পারেন না।

যাহা হউক, আপনারা যদি আমাকে একখণ্ড 'পরিচয়' উপহারস্বরূপ ডাকযোগে পাঠাইতেন তাহা হইলে আমি তাহা সানন্দেই গ্রহণ করিতাম ও কৃতজ্ঞতা জানাইতাম। অম্লানবদনে পত্রিকা গ্রহণ করিয়া কোন মন্তব্য করিতাম না। এই আচরণের দ্বারায় কেহ যে নিজের বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছেন এরূপ ইঙ্গিত করিতেছি না—তবে আমার বন্ধুমহলে দু'একজন ঐরূপ করিতে পারিতেন বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম।

আপনাদের পত্রিকায় অশ্লীলতা আছে, এ-কথাও আমার বন্ধুমহলে উঠিয়াছে, কারণ তাঁহাদের কাহারো কাহারো দৃষ্টি ধূর্জ্জটিপ্রসাদের "প্রেমপত্র" ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় 'বাটি' শব্দের দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। আর্টিষ্ট যখন ছবি আঁকেন তখন সে 'বাটি' তিনি আরও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া থাকেন—তবে কিনা ভাষার আর্টেই তাহার অভিব্যক্তি দোষাবহ। সমালোচক ত আর আর্ট খোঁজেন না, কারণ "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি।"

যাহা হউক, বাংলা সাহিত্যে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সমালোচনা হইতে পারে তাহার প্রমাণ আপনাদের 'পুস্তক পরিচয়ের' প্রতি পত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষায় যত সমালোচনা পড়িয়াছি তাহাতে বড় একটা সুস্থ বিচার-শক্তির পরিচয় পাই নাই—আপনারাই যে ইহার পথ প্রথম দেখাইলেন তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কোন পত্রিকাই এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত পাঠকদের পরিচয় করাইয়া দিবার ভার ল'ন নাই—আপনারা তাহা করিয়া যে বাঙ্গালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

জর্ম্মাণ ও ফরাসী পুস্তকের পরিচয় পড়িয়া দু'একটী কথা মনে হইয়াছে। আমরা জর্ম্মাণ না জানিয়াও মণীন্দ্রবাবুর Karl und Anna পুস্তকের আলোচনা বুঝিয়াছি ও তাহা হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছি। কিন্তু সুধীন্দ্রবাবুর ফরাসী পুস্তক-পরিচয় পড়িয়া মনে হইল তাহা আমাদের ন্যায় মূর্খ পাঠকের জন্য লেখা হয় নাই, কারণ ফরাসী ভাষা শিখিয়া পুস্তকগুলির বিশেষ পরিচয় না রাখিলে সুধীন্দ্রবাবুর

আলোচনা বোঝা শক্ত। আর যদি বলেন যে, আমাদের স্থায় মূর্খ পাঠকের জন্য [illegible] ইহা লেখেন নাই, তাহা হইলে 'ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড়' হইবে—শুধু বাদ [illegible] পরিচয়ের লেখকগোষ্ঠী। সেই লেখকগোষ্ঠীর জন্যই যে আপনারা পত্রিকা [illegible] করিতেছেন এমন কথা বলিতে পারেন না। সেইজন্যই মনে হয়, সুধীন্দ্রবাবু [illegible] আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রতি পুস্তকের একটু বিশদ পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আমরা অল্প আয়াসেই তাঁহার আলোচনা বুঝিতে পারিতাম। তিনি ফরাসী নামগুলি শুধু বাংলা অক্ষরে দিয়া আমাদের আরও বিপদে ফেলিয়াছেন—"জেরোম, উ [illegible] সাঁৎ দেগ্রে লাতিতুদ নর", "লেসম্ (?) দ লা রুৎ", "অঁদ্রে শাঁস", "[illegible] দাম" প্রভৃতি নামের ভিতর অনেক বাংলা শব্দের রূপ দেখিতে পাইয়াই [illegible] 'হরেকরকম্বা'রূপ ধাঁধায় পড়িয়াছি। আর Confidence (পৃঃ ১৩৭) এর উচ্চারণ যদি "কঁফিয়াঁস্ (পৃঃ ১৪১) হয় তাহা হইলে উদ্বাহু বামনের মত ফরাসী [illegible] শিখিবার আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইব।

আপনাদের প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছি এবং সেগুলিতে যে শিক্ষিত পাঠকের [illegible] মাসের খোরাক রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষা যে বাঁধনহীন ও [illegible] বকুনি নয় তাহার প্রমাণ সব প্রবন্ধেই পাইয়াছি, যদিও সুবোধবাবুর "[illegible]-সংবেদ্য-অনুভব-যোগ্যতা-বর্ণনা-প্রসঙ্গে" (পৃঃ ৬৯) প্রথমতঃ ভয় পাইয়াছিলাম—হাইফেনগুলিই সে ভয়ের প্রধান কারণ। তবে সুবোধবাবু যে উদ্ধৃত [illegible] সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ না দিয়া আমাদের শিল্পীর ব্যথা-বোধে ব্যাঘাত [illegible] তাহা বলিতে বাধ্য। প্রবোধবাবু বলিয়াছেন যে "বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও [illegible] প্রভৃতির ভিতর প্রাচীন সহজসিদ্ধদের ভাব ও রূপ পরিস্ফুট" হইয়াছিল (পৃঃ [illegible]) তাহা আরও প্রমাণ সাপেক্ষ। তাঁহার প্রবন্ধে "অসদি" (পৃঃ ২০), "[illegible]" (পৃঃ ২১) ও "উদ্মাডি" (পৃঃ ২৩) মুদ্রাকরপ্রমাদ নয় কি? তাঁহার বিষয় [illegible] হইতেই মনে হইল যে, ঐগুলির বদলে "অসঙ্গ," "অশ্বঘোষ" ও [illegible] হওয়া উচিত।

এইবার শব্দবিভ্রাটের কথা বলিব। আপনারা অনেক ইংরাজী শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ স্থির করিয়াছেন—ইহাতে যে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালী হইবে [illegible] সন্দেহ নাই। তবে আপনাদের ব্যবহৃত সকল প্রতিশব্দই যে চলিবে এ-ভরসা [illegible] না—আপনারাও রাখিতে পারেন না। মুকুটিত (পৃঃ ১১৪) চলিলেই [illegible] (পৃঃ ১১৫) চলিবে কি? অম্লজান উদজান অচল হইয়া চলিলেও ধনাত্মক [illegible] (পৃঃ ৫৬) চলিবে কি? 'হাঁসপাতাল' বলা অভিপ্রেত না হইলেও চলিতেছে—কিন্তু "ষ্টীলনীল" (পৃঃ ১০০) চলিবে কি? অবশ্য কালপ্রবাহই ইহার নিয়ন্তা। [illegible] করিবার হাত আপনাদের, চালাইবার নহে।

বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করিতে হইলে সংস্কৃত হইতেও যে অনেক কথা আমদানী করা আবশ্যক তাহা আপনারা বুঝিয়াছেন ও দক্ষতার সহিত [illegible] করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সংস্কৃত অভিধান নিকটে রাখিয়া আমাদের [illegible] পড়িতে বলেন তাহা হইলে আমাদের উপর অন্যায় করিবেন—বাংলা ভাষার উপর যে ন্যায় করিবেন সে কথা সর্ব্বতোভাবে বলিতে পারি না। 'অতিমর্ত্ত্য,' 'আধিকারিক' (পৃঃ ৬), 'বৈফল্য,' 'অতিবাদ' (পৃঃ ২৮) ও 'ঐতিহ্যবিপ্লব' (পৃঃ ৩১) সহজেই বুঝিতে

পারি কিন্তু 'স্বসম্বেদ্য,' 'সার্ব্বিক' (পৃঃ ৩০), 'অন্বিষ্ট,' 'উল্বণ,' (পৃঃ ৪১), 'প্রত্নতাত্ত্বিক উজ্জ্বনী' ও 'আপতিক ভিত্তি' সহজ কেন—বিশেষ কষ্ট করিয়াও বুঝিতে পারি কি?

যাহা হউক আপনাদের লেখার অবিনীত আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে—সাধারণ পাঠক হিসাবে আপনাদের প্রবন্ধ পড়িতে যে সব বাধা অনুভব করিয়াছি তাহাই জানাইলাম। আপনারা বাংলা সাহিত্যের যে অচিরেই ভাষা ও ভাব সম্পদে শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারিবেন তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আমার জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু, যাঁহার মতামতের মূল্য আছে, তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই। তিনি মনে করেন যে, আপনাদের পত্রিকায় আধুনিক বৈঠকখানার ফ্যাকাসে রং ফুটিয়া উঠিয়াছে (তাঁহার এই মতই নাকি সাময়িক কোন কাগজে এক সমালোচক বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন)। বৈঠকখানায় যে আপনারা বসেন তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি না, তবে তাহার রং ফ্যাকাসে কিনা জানি না। আপনারা বস্তীতে যে বসেন না সে কথা নিশ্চয়, কারণ 'পরিচয়ের' পত্রে কোন বস্তী-কারোর পূতিগন্ধের আঘ্রাণ পাই নাই ও "শনিবারের চিঠিও" এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। দোকানের কেনা চপ্-কটলেটের গন্ধে ভরপুর মাছি ভন্‌ভন্ করা—প্রেসের পাশের এঁদোঘর বা গোচারণের মাঠেও আপনারা যে যান না তাহা জানি—কারণ সেখানে মক্ষিকা, সমালোচক ও 'কবিতা' লেখক ব্যতীত অন্যের গতিবিধি নাই। এ অবস্থায় আপনাদের হয় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় অন্তরালে থাকিতে হইবে—না হয় বৈঠকখানায় বসিয়া দরদ দিয়া এমন প্রবন্ধ লিখিতে হইবে যাহাতে আপনাদের ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। আপনারা যে দরদ দিয়া লিখিয়াই যাইবেন তাহাতে আমার আর সন্দেহ নাই—আমার বন্ধু আপনাদের লেখায় যে রংই দেখুন না কেন। কারণ প্রবন্ধের ভাষায় যদি কোন রংই না ফুটিয়া উঠে তাহা হইলে পাঠকের মন অনুরঞ্জিত হইবে কি করিয়া। ইতি—

বিনীত

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

* * * *

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রীতিভাজনেষু,

গত সংখ্যার 'পরিচয়ে' শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "বন্দীর বন্দনা" সম্বন্ধে সমালোচনাটি বোধহয় রসগ্রাহীমাত্রেই উপভোগ করবেন। বাংলাদেশে শ্রীবুদ্ধদেব বসু আজ খ্যাতিলাভ করেছেন, কিন্তু বোধহয় গিরিজাপতি বাবুর মতন দরদ দিয়ে ইতিপূর্ব্বে তাঁর কাব্যের মূল ধারাটি কেউ বুঝতে চেষ্টা করেন নি। বুদ্ধদেবের মতন অসামান্য তরুণ প্রতিভাকে যে রসিক বাঙ্গালী এতদিন ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেনি (যেখানে তাঁর শতাংশের একাংশও প্রতিভা যাঁদের নেই তাঁদের ঝঙ্কার মাত্র সকল উৎকটতায় দশদিক মুখরিত বললেই হয়) এতে ক'রে রসিক বাঙ্গালীর রসজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় না। বুদ্ধদেবের ত্রুটি সম্বন্ধে আমি পূর্ণভাবে সচেতন—কিন্তু কবির বিচার তাঁর ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা দিয়ে ত নয়—"The greatness of a man is the greatness of his greatest moments"—এবং যেখানে বুদ্ধদেবের প্রেরণা

সত্য, সেখানে তিনি সত্যিই বড়, এই-ই আমার বলবার কথা। গিরিজাপতি বাবু বুদ্ধদেবের এই মহত্ত্বের দিকটা বেশ দেখিয়েছেন, যদিও বড্ড সংক্ষিপ্ত হয়েছে। কেবল একটি প্রশ্ন আমি আপনাদের পত্রাধ্যায়ে করতে চাই, গিরিজাপতি বাবুর ধূলিম সমালোচনাটির সম্পর্কে। সেটি এই যে, বুদ্ধদেব যে ধরণীকে মৃতা জ্ঞান ক'রে এ-ধরণী ছেড়ে অন্য কোনো লোকোত্তর ভাস্করে তাঁর কাব্যাসন পাততে চান, এ ধারণা গিরিজাপতি বাবুর হ'ল কোথা থেকে? বোধহয় বুদ্ধদেব আমাদের এ সুন্দরী ধরণীকে বার বার "মৃতা" ব'লেছেন ব'লেই ক্ষুব্ধ হ'য়ে গিরিজাপতি বাবুর মনে এ ধারণা জন্মেছে। জন্মানো অসম্ভবও নয়। মানে, প্রথম দর্শনে বুদ্ধদেবের আক্ষেপকে নিছক ধরা-ঘৃণা বা নিরাশ হওয়ার দরুণ ব্যক্তিগত ক্ষোভ ব'লে মনে হওয়াটা হয়ত খুব বিচিত্র নয়। কারণ তাঁর অনেক লেখার মধ্যে ব্যক্তিগত ক্ষোভ আছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিরিজাপতি বাবু যদি আর একটু মনোনিবেশ ক'রে বুদ্ধদেবের "বন্দীর বন্দনা" পড়তেন—তাহ'লে দেখতে পেতেন যে "বন্দীর বন্দনা"য় বুদ্ধদেবের যে ধরা-বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছে সেটা ধরণী "as-she-is"-এর 'পরে—ধরণী as-she-could-be বা ought-to-be-র 'পরে নয়, এবং এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ পাতাল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে আমাদের জন্মভূমির দুই মূর্ত্তি দেখিয়েছেন—"মা কি হইয়াছেন" ও "মা কি হইবেন।" সেখানে মার বাস্তব মূর্ত্তিকে দীনা রিক্তা কঙ্কালসারা করেছেন জননীর সঙ্গীতমুখরা সালঙ্করা বিপুলবৈভবা মূর্ত্তিকেই বড় করতে। বুদ্ধদেবও তাঁর 'বন্দীর বন্দনা'য় এই contrast—বৈষম্য—ফোটাতেই চেষ্টা করেছেন, ধরণীর কী (বাস্তব) রূপকে আমরা ভালবেসে থাকি ও কী (স্বপ্ন) রূপকে ভালবাসা উচিত ও কী রূপ ধরণী পরিগ্রহ করবেন—কবির আবাহনে, স্বপ্নে, সাধনায়। একথার স্বপক্ষে অজস্র উদাহরণ "বন্দীর বন্দনা"র প্রতি কবিতা থেকেই উদ্ধৃত করতে পারি। কিন্তু পত্র সংক্ষেপ হওয়ার দরকার ব'লে মাত্র দু-তিনটি উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হব।—

"পৃথিবী গিয়েছে ম'রে মোরা তারে বাঁচাইবো ফিরে
মোদের নয়নে আছে যে বিরল আলোক ভাণ্ডার,
সে-ই মৃত সঞ্জীবনী, তারি স্পর্শে বাঁচিবে ধরণী।" (৩৩ পৃষ্ঠা)

তাঁর "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতাটিতে কবি যে দুটি অপূর্ব্ব প্রেমউচ্ছ্বসিত গান গেয়েছেন, সে দুটির ছত্রে ছত্রে কবির অনুপম বেদনার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে তাঁর এই অভীপ্সা ফুটে উঠেছে যে—

"কোরো না মানা
দুরাশা আমার বুকে দিতেছে হানা,
কবিরা করেছে শোক অশ্রুভারে
ছোঁয়ায়ে আমার চোখ বাঁচাবো তারে
পৃথিবী উঠিবে জেগে চির-অজানা।" (৩৩ পৃষ্ঠা)

বুদ্ধদেব বিশেষ ক'রে তাঁর "কোনো বন্ধুর প্রতি" কবিতাটির বিস্তীর্ণ পটভূমিকায় তাঁর কবিহৃদয়ের স্বপনী-হৃদয়ের দ্রষ্টা-হৃদয়ের নিহিত কামনাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দেখাতে চেয়েছেন কবির স্বপ্ন কত মহৎ। ভূমি ও নারী রাজেন্দ্রেরও কাম্য, কিন্তু

কবির নয়। কবি মর, কিন্তু তাঁর কাব্য-প্রেরণা অমর। এই কাব্য-প্রেরণারই কবির কাছে দাবী এই, যেন কবি বল্‌তে পারেন উচ্চকণ্ঠে সগৌরবে—

"বিধাতার নির্ব্বাচিত মোরা,
কবিতা মোদের প্রিয়া, আমরা চাহিনা সিংহাসন
চাহিনা সহস্র নারী; মোরা চাই উদার জীবন,
উদার জীবন ভরি' ধ্যানের প্রসন্ন একাগ্রতা।"

কেন? না,

"আমাদের তপস্যায় পৃথিবীর নবজন্ম হবে।" (৩৫ পৃষ্ঠা)

কাজেই তাঁর তপস্যা মৃতা ধরণীকে পায়ে ঠেলে যাওয়া নয়, তাঁর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—

"আকাশবিস্তৃত প্রাণ, উদার, উন্মুক্ত অজস্রতা,
স্বপ্নসমুজ্জ্বল পরমায়ু"

যাতে করে

"মোদের তপস্যা ফলে
নূতন গগনাঙ্গনে নবজন্ম লভিবে পৃথিবী।"

এই পৃথিবীর নবজন্মের পরিপ্রেক্ষিতই বুদ্ধদেবকে শিখিয়েছে বাস্তবের সঙ্কীর্ণ দিগন্তকে অবজ্ঞা করতে—বর্জ্জন করতে। কিন্তু তাই ব'লে তাকে দলিত ক'রে দূরে অস্পৃশ্যের মতন বর্জ্জন করতে নয়। তাকে রূপান্তরিত করতে।

তাঁর কবি-স্বপ্ন মনে করিয়ে দেয় শ্রীঅরবিন্দের "The Life Divine"-এর একটি প্রতীতি—

"Not to abandon the lower to itself, but to transfigure it in the light of the higher to which we have attained is divinity of nature."

বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র স্বপ্ন ঠিক সমশ্রেণীর বলিনা—কিন্তু তা স্বপ্নে-ভরা—ঊর্দ্ধ-আরাধনায় ওতপ্রোত—মানুষের দেবত্বে উন্নীত হওয়ার কামনায় দীপ্যমান্, এই-ই আমার বক্তব্য। ছত্রে ছত্রে মুগ্ধ করে তাঁর এই অভীপ্সা, মনে করিয়ে দেয় শেলির কবি-আকূতি,

The desire of the moth for the star
Of the night for the morrow.

মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের—

মোর কিছুধন আছে সংসারে
বাকি সব ধন স্বপনে—নিভৃত স্বপনে

মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষ যে অমৃতের পুত্র একথা সে ভুলতেই পারে না, বাস্তবের গভীরতম অপমানেও না। তাই বুদ্ধদেব গেয়েছেন—

"মানুষ দেখে না কভু যে আকাশ,
আমরা সেথায়
রচিবো অদৃশ্য চক্র দীর্ঘপক্ষ করিয়া বিস্তার"

তাই তিনি লেখেছেন—

"অমাবস্যা পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।" (৫ পৃষ্ঠা)

কিন্তু হায়রে, মানুষ এত সেন্টিমেণ্টাল, এত স্বল্পসুখী এত পূজোপচারবিলাসী। তার প্রতি দুর্ব্বলতা, পিছুটান, কামনার গ্লানি, ভয়, নিষ্ঠুরতা, সাম্রাজ্যবাদ, ঈর্ষার কাড়াকাড়ি—এমন কি ঈর্ষাকেও সে চায় কাব্যে ছন্দে আদর্শে সমর্থন করায় বড় ক'রে দেখাতে। যদি কেউ বলে যে—না, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবতার [illegible] এ-গ্লানির এ-আবর্জ্জনার ও সম্ভ্রমহীনতার মধ্যে নয়; যদি কেউ বলে—

"Ich liebe die groszen Verachtenden, weil sie die groszen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer."*

যদি কেউ অনুপম প্রেরণায় ওজস্বিনী ভাষায় বলে যে, মানুষের সব চেয়ে বড় অপমান,

"বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর
রক্তের আরক্ত লাজে উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি!"

(বন্দীর বন্দনা, ২০ পৃষ্ঠা)

তাহ'লেই লোকে মহাদুঃখিত হ'য়ে বলে, হায়, হায়, হায়,—কবির বাণী ত এ নয়, কবির বাণী হচ্ছে মানুষের চরম গ্লানির কঙ্কালকেও ঢেকেঢুকে রাঙতা দিয়ে মুড়ে, আত্মপ্রবঞ্চনার চণ্ডীমণ্ডপে এনে প্রতিষ্ঠা ক'রে, আত্মপ্রসাদের অগুরু চন্দন দিয়ে পূজা করা। অর্থাৎ এক কথায় আত্মাবমাননাকে দরদ, অনুকম্পা, মানবপ্রেম প্রভৃতি নাম দিয়ে [illegible] ছন্দে মিলে জাহির করা, তর্পণ করা, পুতুলনাচ নাচানো। বুদ্ধদেব বোধহয় বাঙালীর মধ্যে প্রথম "ঘৃণার কবি"—মানে, দীন ঈর্ষার ঘৃণা নয়,—সেই ঘৃণার, যে বলে—

[ঘৃণা কথাটা একটু শুন্‌তে খারাপ, আমি ঘৃণা বল্‌তে বুঝছি, বিতৃষ্ণা, তীব্র বিতৃষ্ণা—অহঙ্কারমূলক অবজ্ঞা নয়।]

"Was ist das Groszte, das ihr erleben Konnt? Das ist die Stunde der groszen Verachtung. Die Stunde, in der euch euer Gluck zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend."†

আশা করি, এ কয়টি কথা পরিচয়ে ছাপ্‌বেন। ছাপ্‌বার প্রয়োজন আছে এইজন্য যে, কাব্যামোদীদের পক্ষে (বিশেষ ক'রে ভাববিলাসী নিস্তেজ বাঙালীর পক্ষে) বুদ্ধদেবকে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই পনেরো আনা। মানুষ চায় তোষামোদের [illegible] অর্থাৎ সহজ সুলভকে বড় করে দেখতে পারে এমন amiable কবির [illegible]। কারণ আত্মাদর (amour-proper) নইলে মানুষ বাঁচতে পারে না; কাজেই যেখানে তার ধূলিপ্রীতি তার অন্তরের দেবতাকে নিত্য অপমান করে সেখানে সে ধূলিকে

---

* "হৃদয় যে তীব্র ঘৃণা বহে—আমি অনুরাগী তারি,
সেই ভাবে মহৎ পূজারী
যাহার আত্মার দূরমুখী শর মর্ত্ত্যে বারম্বার—
ধায় লক্ষ্য অলখ বেলার পার।"
নীট্‌শে—Also Sprach Zarathustra

† "কোন লগ্ন আনে বহি জীবনের শ্রেষ্ঠতম ধ্বনি?—
যে-লগ্নে মানব তার পুঞ্জীভূত ঘৃণাতূরী ধ্বনি
সুলভ সুখেরে গণে—ম্লান দীন হেয়
যুক্তিতর্ক পুণ্য-সম্পদেও গণে—তুচ্ছ অবজ্ঞেয়।"
নীট্‌শে—Zarathustra.

[illegible] ব'লে তার স্তবমুখর হ'য়ে ওঠে, যেহেতু তাতে ক'রে সবচেয়ে কম দরে মেলে [illegible] আত্মাদর।

খুব কম কবিই বিধাতার কাছ থেকে "নাল্পে"-র অভীপ্সা নিয়ে জন্মান—ধূলির গ্লানিকে গ্লানি ব'লে অমৃতের সন্ধানে ছোটেন। যে দু' একজন কখনো কখনো আমাদের মধ্যে এই অমর ধূলি-বিরাগ নিয়ে আসেন, যাঁরা spade-কে spade বলতে সক্ষম, ছোটকে [illegible] যাদের মন ভরে না তাঁদের প্রাপ্য—আমাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, প্রীতির তর্পণ, কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য—

সে কবি বলতে সক্ষম যে,

"আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিৎ দংশন
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা!
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সবে ক্ষণে ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে, ব্যথায় লজ্জায়
ভুলিয়া থাকিতে চাই;—ক্ষণতরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে লাবণ্য উচ্ছ্বাসে
তবু হায় পারিনে ভুলিতে।"

(বন্দীর বন্দনা, ২০ পৃষ্ঠা)

ইতি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

শুদ্ধিপত্র

(গত সংখ্যায় কতকগুলি ভুল থাকিয়া গিয়াছিল, সে গুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইল)

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	কণ্ঠা	কণ্ঠ
২০	অসাদি	অসঙ্গ
২১	বুদ্ধঘোষ	অশ্বঘোষ
২৩	উদ্মাড়ি	উদ্ঘাড়ি
৪৪	(১৮৭৬-১৮৭৮)	(১৮৭৭-১৮৭৮)
৪৫	(১৮৫৪-১৮৮১)	(১৮৫৫-১৮৮১)
৪৮	প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠা
৪৯	First International	First Congress
৫৩	পাইয়া	লইয়া
৫৭	নিরানব্বই	বিরানব্বই
৯৬	আজ	আন
১১৬	দলাদলিই	দালালিই
১৪২	অস্বীকার	অঙ্গীকার

প্রকাশক—শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

নিয়মাবলী

"পরিচয়ের" আদর্শ প্রথম সংখ্যার মুখপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

শ্রাবণ হইতে সুরু করিয়া প্রত্যেক তৃতীয় মাসের—অর্থাৎ শ্রাবণ, কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখের—১লা তারিখে "পরিচয়" বাহির হইবে। মূল্য বার্ষিক সডাক ৪৷০, প্রতি সংখ্যা ১৵, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"পরিচয়ে" প্রকাশের জন্য রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠান দরকার।

প্রাপ্ত রচনা প্রকাশের, বা মনোনীত হইলেও কোন বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশ করিবার কোন বাধ্যতা থাকিবে না।

ঠিকানা ও ডাকটিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হইবে।

পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্ব্বে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি ও ব্লক আমাদের হস্তগত হওয়া আবশ্যক।

প্রবন্ধাদি ও বিজ্ঞাপন পাঠাইবার ঠিকানা—

ম্যানেজার "পরিচয়",
রুম নং ১৭, ষ্টিফেন হাউস,
ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা।

১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
মাঘ ১৩৩৮

পরিচয়

ছন্দের হসন্ত হলন্ত

দিলীপকুমার আশ্বিনের উত্তরায় ছন্দ সম্বন্ধে আমার দুই একটি চিঠির খণ্ড ছাপিয়েচেন। সর্ব্বশেষে যে নোটটুকু দিয়েচেন তার থেকে বোঝা গেল আমি যে কথা বলতে চেয়েচি এখনো সেটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়নি।

তিনি আমারই লেখার নজির তুলে দেখিয়েচেন যে নিম্নলিখিত কবিতায় আমি "একেকটি" শব্দটাকে চারমাত্রার ওজন দিয়েচি—

ইচ্ছা করে অবিরত   আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।

এদিকে নীরেনবাবুর রচনায় "এক্‌টি কথা এতবার হয় কলুষিত" পদটিতে "এক্‌টি" শব্দটাকে দুই মাত্রায় গণ্য করতে আপত্তি করিনি ব'লে তিনি দ্বিধা বোধ করচেন। তর্ক না ক'রে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্।

একটি কথার লাগি   তিনটি রজনী জাগি
একটুও নাহি মেলে সাড়া।
সখীরা যখন জোটে,   কথা যেন বন্যা ছোটে.
গোলমালে তোলপাড় পাড়া॥

"এক্‌টি" "তিন্‌টি" "এক্‌টু" শব্দগুলি হসন্তমধ্য, "গোলমাল" "তোলপাড়"-ও সেই জাতের। অথচ হসন্তে ধ্বনি-লাঘবতার অভিযোগে ওদের মাত্রা জরিমানা দিতে হয় নি। তিনমাত্রা চারমাত্রার গৌরবেই রয়ে গেল। কেউ কেউ বলেন কেবলমাত্র অক্ষর গণনার দোহাই দিয়েই এরা মান বাঁচিয়েচে, অর্থাৎ যদি যুক্ত অক্ষরের ছাঁদে লেখা যেত তা হ'লেই